

প্রথম সংস্করণ— শ্রাবণ, ১৩৫৯

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স

১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে ষ্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা

মুদ্রণী

৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাবা-কে

মা-কে

'আজব জীবিকা' (দি ক্লাব অব ক্যুইয়ার ট্রেড্‌স্) একখানি উপন্যাস। তবে, প্রথমেই বলে নেয়া ভালো, উপন্যাসের সর্বজনসম্মত আঙ্গিকের সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। ছ'টি সমবস সরস পর্বকে এখানে একত্রিত করেছেন চেস্টারটন, প্রত্যেকটিই স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটি অন্তঃপ্রবাহী যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে। সর্বশেষ পর্বে তা এক উচ্চচূড় অবস্থায় গিয়ে উপনীত হয়েছে। জীবন সম্পর্কে প্রগাঢ় নিষ্ঠার অধিকারী হয়েও লেখক হিসেবে চেস্টারটন উদ্ভটরসের রসিক। 'আজব জীবিকা'ও সেই একই লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত। বর্তমান অনুবাদ ইতিপূর্বে ধারাবাহিকভাবে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; পাঠক-সাধারণের আগ্রহাতিশয্যে এবারে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হ'ল।

গিলবার্ট কীথ চেস্টারটন

মানুষকে বরং কাঁদানোই সহজ, হাসানো নয়। সহজ তো নয়ই, অত্যন্ত কঠিন। পাঠককে হাসানো আরও কঠিন, বিশেষ তিনি যদি আবার রুচিশীল হন। লেখককেই তখন চোখের জলে ভাসতে হয়।

এ বড় অদ্ভুত ব্যাপার। যে পথ সহজায়ত—কাঁদানোর পথ—সেই পথেই মোক্ষলাভ। অন্তত সাহিত্যের মোক্ষ। সময়ের নিদারুণ প্রহার সহ্য করেও যে-কখানা গ্রন্থ এখনো টিঁকে আছে, টিঁকে থেকে ধ্রুপদী সাহিত্যের মর্যাদালাভ করেছে, মনে মনে তার একটা তালিকা প্রস্তুত করা যাক। দেখা যাবে, তার সব কখানাই ট্র্যাজেডী। প্রায় সর্বত্রই তার কাহিনীগত পরিণতি শোকাবহ। সে-শোকের ওপর কখনো বা একটা মহত্বের প্রলেপ পড়েছে, এই পর্যন্ত।

ট্র্যাজেডী টিঁকে থাকে, সরসসাহিত্য থাকে না। অন্তত তার নজির নেই। তবে কি আমরা তাকে ভালবাসিনা? বাসি, কিন্তু তাকে মনে রাখি না। কী এর কারণ, আপাতত সে-প্রসঙ্গে প্রবেশ করবার প্রয়োজন নেই,—এখানে শুধু এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সরসসাহিত্যের যাঁরা কারবারী, পাঠকের সেই অনিবার্য বিস্মরণের ঝুঁকিকে স্বীকার করে নিয়েই তাঁদের সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়। পাঠককে তাঁরা ভালবাসেন, তার মুখে তাঁরা হাসি ফুটিয়ে তুলতে চান। পাঠক তাঁদের মনে রাখবে না, এ-কথা জেনেও।

এ-কথা জানবার পর আর সরসসাহিত্য-রচনার আগ্রহ না জন্মানই স্বাভাবিক ; এ-পথে যাঁরা অগ্রসর হন স্বভাবতই সংখ্যায় তাঁরা মুষ্টিমেয়। এ-যুগের ইংল্যাণ্ডে যাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন, চেস্টরটন তাঁদের সর্বাগ্রগণ্য।

চেস্টরটনের পুরো নাম গিলবার্ট কীথ চেস্টরটন ; সংক্ষেপে জি-কে-সি। এই সংক্ষিপ্ত নামটিকেই আমরা চিনি, জানি, ভালবাসি। প্রস্তাবনায় এঁর জীবনবৃত্তান্তটুকু সেরে নেওয়া যাক।

এঁর জন্ম লণ্ডনে, ১৮৭৪ সালে! ইংরিজী সাহিত্যের ইতিহাসে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। আরো দুজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক—সমরসেট মম্ এবং মরিস ব্যেরিং—এই একই বছরে জন্মগ্রহণ করেন। চেস্টরটনের বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে সেণ্ট পল্স্ স্কুলে। পড়াশুনোয় তেমন মন ছিল না, খারাপ ছেলে বলে দুর্নাম অর্জনের জন্যে বরং অসাধারণ উৎসাহ ছিল। কিন্তু, নেহাৎই দুর্ভাগ্য তাঁর,—দুদিন বাদেই মাস্টার মশায়রা সব রায় দিয়ে বসলেন, 'না, তেমন তো বদ্ ছেলে নও, লেখাটেখায় হাত রয়েছে দেখছি। চেষ্টা করো বাপু, চেষ্টা করো ; কিছুই বলা যায় না, সত্যিই হয়তো একদিন লিখতে পারবে।' উৎসাহ পেলেন চেস্টরটন, বলাই বাহুল্য। এর পরে আর তিনি সেণ্ট পল্স্ স্কুলে টিঁকে থাকেন নি। তখন তিনি মনস্থির করে ফেলেছেন, সাহিত্যকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করবেন। গেলেন স্লেড্ স্কুলে—নাঃ, ভাল করে পড়াশুনো করতে হবে। ঐ সঙ্কল্পই সার, সেখানেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। পড়াশুনো করা দরকার ; দরকারই তো,—কে তা অস্বীকার করছে। কিন্তু আড্ডা ছেড়ে পড়াশুনো! নৈব নৈব চ। কিছুই বলা যায় না, এমনি আড্ডাবাজ মানুষ চেস্টরটন—শুধু আড্ডা দিয়েই হয়তো জীবন কাটিয়ে দিতেন। কপাল ভাল ইংরিজী সাহিত্যের, আর্নেস্ট হডার উইলিয়ম্স্-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। উইলিয়ম্স্ খাঁটি জহুরী ; বুঝলেন, এ ছেলের মধ্যে বিরাট প্রতিভা লুকিয়ে আছে। আপাতত তা গুপ্ত, সুপ্ত। একদিন তা নির্মোকমুক্ত হতে পারে, জেগে উঠতে পারে। শুধু উৎসাহ দিয়েই তিনি ক্ষান্ত হলেন না, তাড়া দিয়ে তাঁকে লেখাতে শুরু করলেন। তাঁরই অনুরোধে সমালোচনা-সাহিত্যে হাত লাগালেন চেস্টরটন, সাময়িক

পত্রপত্রিকায় পুস্তক-সমালোচনার ভার নিলেন। সাহিত্যজীবনের এইখানেই তাঁর শুরু।

অতঃপর, যতদিন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, প্রচুর গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ-কাব্য তিনি রচনা করেছেন, এবং পুস্তক-সমালোচনায় তাঁর যে সাহিত্যজীবনের উপক্রমণিকা, অবিলম্বে তাকে প্রসিদ্ধির সিংহদ্বারে পৌঁছে দিতেও তাঁকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়নি। বরঞ্চ বলা যায়, প্রসিদ্ধ হবার জন্যে তাঁর আদৌ মাথাব্যথা ছিল না। হেসেখেলে, গালগল্প করে, আর আড্ডা দিয়েই তিনি জীবন কাটাতে চেয়েছিলেন,—খ্যাতির দেবতার যে স্নেহ-সুকোমল কটাক্ষ তাঁর ওপর বর্ষিত হল—সম্পূর্ণই তা অযাচিত।

জি-কে-সির সাহিত্য-প্রতিভা প্রারম্ভে অগ্রসর হয়েছিল সমালোচনার ক্ষেত্রে, সে কথা বলেছি। সে প্রতিভা সর্বপ্রথম স্বীকৃতি পেল ১৯০৪ সালে, তাঁর 'নেপোলিয়ন অব নটিং হিল' বেরোবার পর। তাঁর বয়েস তখন তিরিশ। 'নেপোলিয়ন অব নটিং হিল' তাঁর উপন্যাস, উপন্যাসই যদি বলতে হয়। কেননা, প্রচলিত সংজ্ঞা অনুযায়ী উপন্যাস বলতে যা বুঝি আমরা, তার সঙ্গে এর আশমানজমিন ফারাক। এ একেবারে আনকোরা নতুন জিনিস। প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল সবাই, তারপর একটু একটু করে চেখে দেখল। বিস্ময়ের জের কাটতে-না-কাটতেই বেরোল 'দি ক্লাব অব ক্যুইয়ার ট্রেডস্।' অনতিদীর্ঘ ছ'টি কাহিনীর একত্রিত উপন্যাসরূপ। এর প্লটগুলি সব অদ্ভুত, উদ্ভট। পরিবেশ-সৃষ্টিতে অনন্যসাধারণ। ভাল কি মন্দ, উৎকৃষ্ট কি নিকৃষ্ট, সে-সব বিচারের তখন সময় নেই পাঠকদের; তারা শুধু বুঝল, এমন জিনিস আর আগে তাদের পাতে পড়েনি। সুতরাং, সব দেশেই পাঠকদের যা রেওয়াজ, চিৎকার ওঠাল তারা—এই জিনিসই চাই এবং আরো চাই, আরো।

আরো চাই? বেশতো, খুব ভাল কথা; কিন্তু দেবে কে? চেস্টরটন? তিনি তখন তাঁর আড্ডায় মশগুল। আড্ডার কাছে সাহিত্য! সুখের কথা এই যে, খ্যাতির সম্পর্কে লেখকরা যতোই না কেন উদাসীন হোন, খদ্দেরের সম্পর্কে প্রকাশকেরা তার অর্ধেক পরিমাণও নন। তাঁরা

বুঝলেন, চেস্টরটনকে দিয়ে বই লিখিয়ে নেওয়া দরকার, তাঁদের নিজেদেরই স্বার্থে; এবং 'নেপোলিয়ন অব নটিং হিল'-এর পরে যতো বই লিখেছেন চেস্টরটন—প্রায় সর্বত্রই তার মূলে প্রকাশকদের এই নিরন্তর তাগিদ বর্তমান। চেস্টরটনের কাছে সুবিধে হতো না, তাই চেস্টরটন-গৃহিনীর কাছে তাঁরা বারংবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন,—স্বামীকে যেন তিনি আড্ডায় ভিড়তে না দেন, তাঁকে যেন তিনি তালাবন্ধ করে রাখেন। তা তিনি রাখতেনও; আর সেই নিরুপায় বন্দীদশাতেই চেস্টরটন তাঁর শ্রেষ্ঠ কয়েকখানা পুস্তক রচনা করেছেন। একের পর এক তাঁর বই বেরোতে লাগল; কখন খুবই দ্রুত—প্রায় পিঠোপিঠি, কখনোবা অনতিদীর্ঘকালের ব্যবধানে। সে বই, আগেই বলেছি, নানান ধরণের; —উপন্যাস-গল্প-নাটক-কবিতা-জীবনী-সমালোচনা। প্রকাশকালের পারম্পর্য অনুসারে তাঁর বিখ্যাত কয়েকখানি বই-এর নাম করছি,—চার্লস্ ডিকেন্স (জীবনী, ১৯০৬), দি ম্যান হু ওয়জ থার্সডে (উপন্যাস, ১৯০৮), ম্যাজিক (নাটক, ১৯১৩), দি ফ্লাইং ইন্ (উপন্যাস, ১৯১৪), সেন্ট ফ্রান্সিস্ অব অ্যাসিসি (জীবনী, ১৯২৩), ফাদার ব্রাউন স্টোরিজ (ছোটগল্প, ১৯২৯)। এর মধ্যে তাঁর শেষোক্ত গ্রন্থ 'ফাদার ব্রাউন স্টোরিজ' অসাধারণ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

ইংল্যাণ্ডের পাঠক-সমাজকে উদ্ভট, উচ্ছৃঙ্খল, বেপরোয়া হাসির তুফানে ভাসিয়েছেন চেস্টরটন, কিন্তু তাঁর এই নিবারিত রসসৃষ্টিপ্রবণতা নেহাৎই অকারণ নয়। তাঁর সাহিত্য তাঁর জীবনবোধেরই শিল্পায়ন, সাহিত্য পরিবেষণের অন্তরালে তাঁর সেই জীবনবোধকেই সর্বত্র তিনি সঞ্চারিত করে দিতে চেয়েছেন।

কথাটা একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। চেস্টরটনের সাহিত্য-সাধনার যখন প্রাথমিক পর্যায়, ইংল্যাণ্ডের ভাবনা-মানসের ক্ষেত্রে তখন এক তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরই সমসাময়িক তিনজন মহারথী—শ', গল্স্‌ওআর্দী এবং ওয়েলস্—তার হোতা। তিনজনেই তাঁদের সাহিত্যের মাধ্যমে প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ওপর আক্রমণ চালিয়েছেন; প্রত্যেকেই তাঁর নিজস্ব

ভঙ্গীতে, বলাই বাহুল্য। শ' তাঁর নাটকে পর্যুষিত বিধি-বিন্যাসের প্রতি নির্মম ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করছেন, গলস্‌ওআর্দীর রচনায় শোনা যাচ্ছে তার অন্তিম নাভিশ্বাস। জাতীয় জীবনের আচার-অন্ধত্বের এঁরা দুজনেই বড় তীব্র সমালোচক, কোনও অবস্থাতেই তাকে এঁরা ক্ষমা করেননি। সর্বপ্রকার গোঁড়ামীকে বিসর্জন দিয়ে এঁরা নিজেদের দেশ, দেশের বিধিব্যবস্থা, তার মূল্যবোধকে বিচার করে দেখেছেন; তীব্র কশাঘাতে জর্জর করেছেন তাকে। আর, তারই একপাশে দাঁড়িয়ে এইচ জি ওয়েলস্ তখন স্বপ্ন দেখছেন—বিজ্ঞান-সাধনার কল্যাণস্পর্শেই সমস্ত সমস্যার সমাধান করা যাবে।

বিচারবুদ্ধির এই পরিবর্তনের মুহূর্তেই চেস্টরটনের আবির্ভাব। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বিরুদ্ধে তিনি সামাজিক ঐতিহ্যপরায়ণতার স্বপক্ষে অবতীর্ণ হলেন। এ-কাজে তিনি একজন সহকর্মীও খুঁজে পেলেন অবিলম্বে, হিলায়ার বেলক্! দুজনেরই ধর্মবিশ্বাস একই খাতে প্রবাহিত, দুজনেই বিশ্বাস করতেন—সন্তভূমিষ্ঠ যন্ত্রযুগই সমস্ত অনিষ্টের মূল, ঐতিহ্য এবং মানবিক শুভবুদ্ধির ওপর আস্থাস্থাপন করলেই এ দুর্যোগের অবসান হবে।

চেস্টরটন এবং বেলক্—একমত হয়েও এঁরা একপথ নন। প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে এঁরা এক, পন্থার ক্ষেত্রে পৃথক। তাই এঁদের সাহিত্যকর্মে সর্বত্র একই সুর ধ্বনিত হওয়া সত্ত্বেও তার চরিত্র আলাদা। আঘাতের উপরে শুধু উলঙ্গ আঘাতই হেনেছেন বেলক্, চেস্টরটন তাকে সরসতার ছদ্মবেশ পরিয়ে দিয়েছেন। গভীর সুরে তিনি গভীর কথা বলেননি বটে, কিন্তু সুরটা হালকা বলেই যে তাঁর কথাটাও অগভীর—একথা মনে করাও সম্পূর্ণ ভুল। বিজ্ঞানের বিকলাঙ্গ সাধনাকে তিনি বিদ্রূপ করেছেন, জীবনের সহজ উন্মেষে তিনি আনন্দপ্রকাশ করেছেন, ক্যাথলিক ধর্মবন্ধনে তিনি প্রত্যয়জ্ঞাপন করেছেন, বারংবার তিনি ঘোষণা করেছেন—অভিজ্ঞতাই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। আর এই বিদ্রূপ, এই আনন্দ, এই প্রত্যয়, এই সত্যঘোষণা—এর সবকিছুর মধ্য দিয়েই তাঁর সরস পরিহাসচ্ছটা বিস্ফুরিত হয়েছে।

কিঞ্চিদধিক একযুগমাত্র অতিবাহিত হয়েছে চেস্টরটনের মৃত্যুর পর,

ইতিমধ্যেই তাঁকে আমরা ভুলতে বসেছি। তাঁর প্রতিভার সম্যক ও যথার্থ সমাদর, এ দেশে অন্তত, এখনো হয়নি। অথচ তা হওয়া দরকার। পরিচিত হওয়া প্রয়োজন, তাঁর শিল্পীমানসের সঙ্গে। আর কিছুর জন্যে না হোক—অন্তত এইজন্যে যে, একালের ইংল্যাণ্ডে তিনিই বোধ হয় একমাত্র সার্থক শিল্পী—শ' এবং গলস্‌ওয়ার্দীর সমসাময়িক হয়েও যিনি তাঁর চিন্তা এবং জীবনবোধের স্বাতন্ত্র্যকে সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখতে পেরেছিলেন।

প্রথম পর্ব : মেজর ব্রাউন-এর অ্যাডভেঞ্চার

বিচিত্র চিজ এই ফ্ল্যাট বাড়ি। কার মাথায় যে এর আইডিয়া ঢুকেছিল ইংল্যাণ্ড আর অ্যামেরিকায়, ঈশ্বর জানেন। জায়গা বাঁচানোর জন্যে যে-কায়দায় এখানে বাড়ির ওপর বাড়ি, দরজার ওপর দরজা চাপানো হয় সে-এক এলাহী ব্যাপার। ইটকাঠের এই জটিল দুর্ভেদ্য আরণ্যক প্রহেলিকা, যে-কোনও অভাবিত জন্তু এখানে বাস করতে পারে, যে-কোনও অকল্পনীয় ঘটনা ঘটতে পারে। আর এরই কোনও একটার ভেতর, বন্ধুর আমার ধারণা, 'আজব জীবিকা সঙ্ঘ'-এর হদিশ পাওয়া যাবে। নামটা একটু বিচিত্র সন্দেহ নেই। মনে হতে পারে, নেমপ্লেট দেখে পথচারীরা নিশ্চয়ই থমকে দাঁড়ায় খানিকক্ষণ। সে ধারণা সম্পূর্ণই ভিত্তিহীন। এমনই জায়গা এ সব, কোনও কিছুতে কখনো কেউ বিস্মিত হয় না। তারা তাদের নিজেদের ভাবনা-চিন্তাতেই মুহ্যমান। কেউ হয়তো মন্টিনেগ্রো শিপিং এজেন্সীতে যাবে, কেউ হয়তো রাট্‌ল্যাণ্ড সেন্টিনেল্-এর লণ্ডন অফিসে। ভাবলেশহীন তন্দ্রাচ্ছন্ন মুখ তাদের; দেখে মনে হয়, বিষণ্ণ স্বপ্নের প্রায়ান্ধকার গলি-ঘুঁজিতে সব ঘুরে মরছে। কোনও কিছুতেই উদ্বেগ নেই, কৌতূহল নেই। ধরুন, বিদেশী মানুষদের সব ধরে ধরে খুন করবার জন্যে যদি একটা প্রতিষ্ঠান খাড়া করা হতো, আর নরফোক স্ট্রীটে একটা অফিস বসাতো তারা, আর সে অফিসে যদি কৌতূহলী মানুষদের প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে নিরীহ গোবেচারা গোছের কর্মচারী নিযুক্ত করা হতো একজন—তবে, এমন একটা তাজ্জব ব্যাপারের গন্ধ পেয়েও, বিশ্বাস করুন, কেউই কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতো না সেখানে, কারুর মনেই কৌতূহল জাগতো না এতটুকু। 'আজব জীবিকা সঙ্ঘ'-এর কথা হচ্ছিল, এইখানেই তার আস্তানা।

সঙ্ঘের কার্যকলাপ কী, তা আমরা পরে জানতে পেরেছিলাম। দু-চার কথায় পাঠকদের সেটা জানিয়ে দিচ্ছি। এটা একটা আধা-পাগলাটে ছন্নছাড়া ক্লাব। সদস্য হবার ব্যাপারে একটা অবশ্যপালনীয় শর্ত বর্তমান। সদস্যের যেটা পেশা—যার ওপর তাঁর ভরণপোষণ চলে—সে-পেশা তাঁর স্ব-উদ্ভাবিত হওয়া চাই। কথাটা একটু গোলমেলে ঠেকছে বোধ হয়,—তা ঠেকতেই পারে। সঙ্ঘের নিয়মাবলীতে এই আবশ্যিক শর্তের একটা যথাযথ সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। তাতে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে, প্রথমত সে পেশা আনকোরা নতুন হওয়া চাই ; চলতি কোনও পেশার রকমফের হওয়া চলবে না। যেমন ধরুন, কোনও বীমার দালাল যদি জীবন অথবা ধনসম্পত্তি বীমা করবার সাবেকী পথ ছেড়ে দিয়ে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে যে, এখন থেকে সে তার খদ্দেরদের ট্রাউজার বীমা করে বেড়াবে, আর কুকুরের আঁচড়ে সেই ট্রাউজার ছিঁড়লে কোম্পানীর থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে দেবে তার—তাহলে, ব্যাপারটা যদিও বেশ নতুন ধরণেরই হলো, সেইজন্যেই যে তাকে 'আজব জীবিকা সঙ্ঘ'-এর সদস্য করে নেয়া হবে তা নয়। কেননা, এটা হলো গিয়ে চলতি বীমা-ব্যবস্থারই একটা রকমফের মাত্র, নতুন কিছু নয়। এই হল গিয়ে শর্তের প্রথম অংশ। স্টর্মবি-স্মিথের ব্যাপার নিয়ে যখন ক্লাবে একটা আপত্তি উঠেছিল, স্যার ব্র্যাডক বার্নাবি-ব্র্যাডক তখন তাঁর চিত্তহারী সরস বক্তৃতায় বেশ ভালভাবেই এ-অংশটুকু বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত, আবিষ্কৃত পেশাটি অর্থকরী হওয়া চাই, তাতেই যেন সদস্যের ভরণপোষণ চলে। কেউ যদি আজ রাস্তাঘাটে শুধু সার্ডিন মাছের খালিকৌটো কুড়িয়ে বেড়ায়, তাতেই তার কিছু এ সঙ্ঘের সদস্য হবার অধিকার জন্মাবে না। তবে সেই খালিকৌটোরই যদি সে একটা ব্যবসা খুলে বসে, প্রচুর মুনাফা লুটতে থাকে তার থেকে, তো সে-অবিশ্যি আলাদা কথা। প্রফেসর চিক তাঁর বক্তৃতায় সে কথা খুলে বলেছিলেন। প্রফেসরের নিজের পেশাটা যে কী তা যদি খুলে বলি তো আপনারা হাসবেন-না-কাঁদবেন তা-ই ঠিক করে উঠতে পারবেন না।

অদ্ভুত এই প্রতিষ্ঠানটিকে আবিষ্কার করে আমরা বেশ একটু খুশীই হয়েছিলাম। এখনো গোটাকতক নতুন পেশা আছে এ-সত্যের সন্ধান পাওয়াও যা, পৃথিবীর

প্রথম জাহাজ অথবা প্রথম লাঙলের সন্ধান পাওয়াও তাই। দুটো জিনিসই সমান বিস্ময়কর, সমান অবিশ্বাস্য। কেমন যেন মনে হয়—কী আর মনে হবে, যা মনে হওয়া উচিত তা-ই মনে হয়; মনে হয় যেন সৃষ্টির সেই প্রথম শৈশবে ফিরে গিয়েছি। আমার কথা অবিশ্যি আলাদা। আমি যে শেষতক এই 'আজব জীবিকা সঙ্ঘ'-এর সন্ধান পেলাম, কিছুই তাতে অবাক হওয়ার নেই। কেননা এ-ই হল আমার নেশা, যতগুলো ক্লাবের সদস্য হওয়া সম্ভব অবিলম্বে তাদের সদস্য হয়ে যাওয়া। ক্লাব কুড়োনই আমার এই মরজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বলতে পারেন। সেই যে যৌবনে আমি 'এথেনিয়াম'-এর সন্ধান পেয়েছিলাম—ব্যস, তারপর থেকে কতো নতুন ধরনের ক্লাবের যে আমি সদস্য হয়েছি তার আর কোনও লেখাজোখা নেই। ভবিষ্যতে কাউকে যদি বলবার দিন আসে, সে সব কাহিনী খুলে বলব। সেই 'মড়া মানুষের পাদুকা সংগ্রহ ক্লাব'-এর কথাও বলব। (নাম শুনে যতো খারাপ লাগছে, আসলে কিন্তু ক্লাবটি ততো খারাপ নয়)। 'বেড়াল-ক্রীশ্চান ক্লাব'—এত দুর্নাম যাদের নামে—তারও উৎপত্তির কাহিনী বলব সকলকে। সারা পৃথিবী সেদিন জানবে কী সেই নিগূঢ় কারণ 'টাইপরাইটিং সঙ্ঘ' যার জন্যে 'লাল টিউলিপ লীগ'-এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। কিন্তু হ্যাঁ, 'দশ পেয়ালা ক্লাব'-এর সম্পর্কে কিন্তু একটি কথাও বলব না, তা-সে যিনিই যতো অনুরোধ করুন না কেন। বলবার উপায় নেই কিনা, তাই। আপাতত আমি 'আজব জীবিকা সঙ্ঘ'-এর কথা বলতে বসেছি। এটাও সেই বিচিত্র ক্লাবগুলিরই অন্যতম। আর আমার নেশার কথাও তো শুনলেন,—আজ হোক কাল হোক, এ ক্লাবের সঙ্গে যে আমার পরিচয় ঘটবে সে-তো অনিবার্য। শহরের ফাজিল ছোকরারা আমার নাম দিয়েছে 'ক্লাব-সম্রাট।' কেউ কেউ আমাকে 'শয়তানের সাকরেদ' বলেও ডাকে। বুড়ো বয়েসেও আমার চেহারা টসকায়নি, এখনো আমার অদম্য ফূর্তি,—সেইজন্যেই হয়তো। তা ডাকুক। ইহলোকে আমার প্রচুর খানাপিনা জুটছে। পরলোকে যেন তার ঘাটতি না ঘটে—এই শুধু আমার একমাত্র প্রার্থনা। কী বলছিলাম যেন? 'আজব জীবিকা সঙ্ঘ' আবিষ্কারের কথা। এখন মজাটা কি জানেন, আসলে আমি কিন্তু এটাকে

আবিষ্কার করিনি, করেছে আমার বন্ধু বেসিল গ্র্যান্ট। হ্যাঁ সেই বেসিল গ্র্যান্ট, —সেই পরম দার্শনিক, সেই মরমী মহাপুরুষ—জীবনে যে কখনো তার আস্তানার চৌহদ্দী ছেড়ে বাইরে বেরোয়নি। অর্থাৎ বেরিয়েছে, তবে খুব কম।

এবং খুব কম লোকই তাই বেসিলকে চেনে। তার মানে এই নয় যে, বেসিল অমিশুক। আসলে কিন্তু খুবই মিশুক সে। কোনও অচেনা লোকও যদি তার ঘরে ঢোকে একবার, সারা রাত্তির বেসিল তাকে গালগল্পে আটকে রাখবে। তা সত্ত্বেও খুব কম লোকের সঙ্গেই তার আলাপ। কবি-প্রকৃতির লোক কিনা, আলাপ না করলেও তার চলে। কোনও আগন্তুককে যখন সে অভ্যর্থনা জানায়, দেখে মনে হয় কেমন যেন একটা নির্লিপ্ত ভঙ্গী ফুটে উঠেছে তার মধ্যে। সূর্যাস্তের রঙ্‌বদল দেখে যেমন নৈর্ব্যক্তিক আনন্দ পাই আমরা। এবং সেই রঙ্‌বদলের ব্যাপারে যেমন আমাদের হাত নেই, হাত লাগাবার প্রয়োজনও আমরা বোধ করি না, বেসিলের বেলাতেও ঠিক তেমনি। কেউ এলে সে খুশী হয়, এই পর্যন্ত ; তাই বলে উদ্যোগ আয়োজন করে এর-ওর-তার কাছে গিয়ে আড্ডা জমাতেও সে আগ্রহ বোধ করে না। নিজের থেকে কেউ যদি আসে, ভালই ; না যদি আসে, তাতেই বা কী। ল্যাম্বেথ-এর ওদিকে ছোট্টমতন একটি কুঠরি ঘরে তার আস্তানা। জিনিসপত্র বিশৃঙ্খল। আর সে জিনিসগুলোও সব এমনি, আশপাশের বস্তিগুলোর সঙ্গে তাদের এতটুকু সামঞ্জস্য নেই। যেমন ধরুন পুরোনো সব ধুলোট কেতাব, তরোয়াল, কিম্ভূত সব অস্ত্রশস্ত্র এই সব। বেশ একটা মধ্যযুগীয় রোমান্টিক আবহাওয়া। এবং এই পরিবেশের মধ্যে সবচাইতে বেমানান সে নিজে। একেবারে আধুনিক তার চেহারা, তার মুখ। সেই সঙ্গে একটু কঠিন। অনেক আইন-ঘাঁটাঘাঁটির ছাপ পড়েছে তাতে। আসলে কী তার পরিচয়, একমাত্র আমিই তা জানি।

আশা করি সেই বীভৎস ব্যাপারটার কথা আপনাদের মনে আছে, সেই যে ইংল্যাণ্ডের একজন নামজাদা জজ যখন আদালতের মধ্যেই পাগল হয়ে গেলেন ? ভিতরকার ব্যাপার যা-ই হোক না কেন, ঘটনাটাকে তো আর অস্বীকার করা চলে না। মাস কয়েক ধরেই, না না—বছর কয়েক ধরেই. সকলে তাঁর আচার

আচরণে একটা ব্যাপারে তার লক্ষ্য করে আসছিল। আইনে তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি, তা সত্ত্বেও তাতে তিনি উৎসাহ হারিয়েছিলেন। তার বদলে সকলকে তিনি নৈতিক উপদেশ দিতে সুরু করেছিলেন ইদানীং। এবং সে উপদেশও তিনি বেশ পষ্টাপষ্টিই দিতেন। কথাবার্তায় একটা ইস্টগুরুসুলভ মেজাজ ফুটে উঠছিল; না কি তাকে ডাক্তারী মেজাজ বলব? তাতেও সকলে খুব অবাক হয়নি। অবাক হলো যখন একটা ফৌজদারী মামলার রায় দিতে গিয়ে আসামীর উদ্দেশে তিনি বললেন, "তিন মাসকাল তোমার পক্ষে সমুদ্রতীরে হাওয়া পরিবর্তন করিতে যাওয়া উচিত,—এই দৃঢ় সঙ্গত ও ঈশ্বরাভিপ্রেত প্রত্যয়ের বশবর্তী হইয়া তোমাকে আমি তিন বৎসরকালের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিলাম।" আসামীদের তিনি শাস্তি দিতে সুরু করলেন তাদের আইনঘটিত অপরাধের জন্যে নয়, তাদের আত্মম্ভরিতা, রসবোধের অভাব, আর নয়তো তাদের সযত্ন-লালিত চিত্তবৈকল্যের জন্যে। বাপের বয়েসেও কেউ এমন অদ্ভুত ব্যাপার দেখেনি। সেই হীরে-চুরির মামলাটার কথা আপনাদের মনে আছে তো? সেই যে সেই মামলা, প্রধানমন্ত্রীকেও যাতে নিতান্তই অনিচ্ছুকভাবে তাঁর ভৃত্যের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে হয়েছিল? মনে পড়েছে, কেমন? তাতেই গিয়ে ব্যাপারটা চরমে দাঁড়াল। বেশ সওয়াল জবাব চলছিল, জজ হঠাৎ খেপে গেলেন। তারপর চিৎকার করে উঠলেন প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে, "আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করুন। আত্মার যা পরিচয় পেলাম আপনার, ও-আত্মা একটা নেড়ীকুত্তারও যোগ্য নয়। যান, আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করুন।" যে-মামলায় সত্যিই তিনি পাগল হয়ে গেলেন শেষ পর্যন্ত, বুদ্ধিমানদের ধারণা এসব তার পূর্বাভাষ মাত্র। সেই কথাতেই আসছি। মানহানির মামলা সেটা, রীতিমত প্রতিপত্তিশালী দুই বিত্তবানের মধ্যে। দুজনেই দুজনের নামে পাল্টা অভিযোগ এনেছেন। দীর্ঘ জটিল মামলা। কৌঁসুলীরা তাঁদের থলি ঝেড়েঝুড়ে বক্তৃতা করেছেন দিনের পর দিন। তারপর তাঁদের সেই একটানা বাকজাল বিস্তারের পর অবশেষে রায় দেবার মুহূর্ত সমাগত হলো। সকলেই আশা করেছিল, জজ এবার একটা ঐতিহাসিক রায় দেবেন; আইন আদালতের ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ নজীর হয়ে থাকবে সেটা। মামলা যতদিন

চলেছিল, জজ সাহেব তাঁর মুখ খোলেননি, বিষণ্ণভাবে শুধু শুনে যাচ্ছিলেন সবকিছু। এবারে তিনি রায় দেবেন। মুহূর্ত কয়েক তিনি গুম মেরে বসে রইলেন, তারপর ছড়াকাটার সুরে বিচিত্র একটা গান গেয়ে উঠলেন অকস্মাৎ; নীচে সেটা তুলে দিচ্ছি :—

'ও রাউটি-আউটি টিডলি-আউটি
টিড্‌লি-আউটি টিড্‌লি-আউটি
হাইটি-আইটি টিড্‌লি-আইটি
টিড্‌লি-আইটি আও।'

অতঃপর তিনি তাঁর চাকরী ছেড়ে দিলেন, ল্যাম্বেথ অঞ্চলে গিয়ে কুঠরি ভাড়া করলেন একটা।

একদিন সন্ধ্যাবেলায় সেখানে বসে আছি,—আমি এবং বেসিল গ্র্যান্ট। সামনে আমার একগ্লাস বার্গাণ্ডি। বেসিল তার চিঠিপত্তরের জঞ্জালের পেছন থেকে বার্গাণ্ডির বোতল বার করে এনেছে। আনমনে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, কখনো বা একটা তরোয়াল তুলে নিয়ে তার ধার পরীক্ষা করে দেখছে। এটা তার একটা মুদ্রাদোষ। চুল্লীর ভেতর আগুন জ্বলছে। তার আভা এসে পড়েছে বেসিলের মুখের ওপর, তার ধূসর চুলে। দু-চোখ তার স্বপ্নাচ্ছন্ন। সেই স্বপ্নসমাহিতভাবেই কী যেন বলবে বলে সবেমাত্র মুখ খুলতে যাচ্ছিল বেচারা, দরজাটা হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল। আর একটি শীর্ণ যুবক এসে ঘরে ঢুকল আমাদের। বেশ উত্তেজিত। লালচে চুল, গায়ে একটা বিরাট ফারকোট।

"এই যে বেসিল," হাঁফাতে হাঁফাতেই সে বলল, "তোমাকে একটু বিরক্ত করতে হচ্ছে। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে এখানেই একটু কথাবার্তা বলে নিতে চাই। আমারই এক মক্কেল। মানে, আগের থেকেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। আপনি কিছু মনে করবেন না মশাই।" বলে সে ক্ষমা-চাওয়ার ভঙ্গীতে আমার দিকে ফিরে দাঁড়াল।

বেসিলও তাকাল আমার দিকে; হেসে বলল, "ওহো, তুমিতো আবার একে চেনো না, তোমাকে বলা হয়নি। এটি আমার ভাই, শ্রীমান রুপার্ট গ্র্যান্ট।

কাজের ছেলে। এমন কোন কাজ নেই যা ওর সাধ্যাতীত। আমাকে তো জানো, কর্মক্ষেত্রে কেমন নাকানি-চোবানি খেয়েছি। রুপার্ট তার উল্টো, সব কাজেই সমান ওস্তাদ। কত চেহারাই যে ওর দেখলাম! সাংবাদিক, বাড়ির দালাল, প্রকৃতিতত্ত্ববিদ, বৈজ্ঞানিক, প্রকাশক, স্কুল-মাস্টার,—হ্যাঁ, ভালো কথা রুপার্ট, এখন যেন তুমি কী করছো?"

গম্ভীর মুখে রুপার্ট জবাব দিল, "আমি এখন প্রাইভেট গোয়েন্দা, বেশ কিছুদিন যাবৎ এ-লাইনে আছি। আরে, আমার মক্কেল এসে গেছে দেখছি।"

দরজায় ঘা পড়ল সজোরে। অনুমতি দিতেই, দরজাটা খুলে গেল এবং বলিষ্ঠ একজন ভদ্রলোক দ্রুতপায়ে ভিতরে এসে ঢুকলেন। টেবিলের ওপর তিনি তাঁর রেশমী টুপি নামিয়ে রাখলেন। তারপর বললেন, "শুভসন্ধ্যা।" শব্দের শেষার্ধ এমনই সজোরে উচ্চারণ করলেন তিনি যে তার থেকেই তাঁর চরিত্রগত দার্ঢ্যের খানিকটা আভাষ পাওয়া গেল। ভদ্রলোকের মাথাটা শরীরের তুলনায় বড়ো, চুল কাঁচাপাকা। সেই সঙ্গে একখানা বেঁটে কালো গোঁফ। তার থেকে তাঁকে বদরাগী বলে মনে হতে পারত; কিন্তু না, দুচোখ তাঁর সমুদ্র-সুনীল, অগাধ বিষণ্ণতা সেখানে।

ভদ্রলোক এসে ঘরে ঢুকতেই বেসিল উঠে দাঁড়াল, আমার দিকে তাকিয়ে বলল, "চলো হে বন্ধু, পাশের ঘরে যাওয়া যাক।"

"দরকার নেই। থাকুন। সাহায্যে আসবেন।"

প্রথম থেকেই কেমন যেন চেনাচেনা ঠেকছিল, এবারে এই কাটাকাটা বাচনভঙ্গী শুনে আর সন্দেহ রইল না। যতদূর মনে পড়ছে, নাম মেজর ব্রাউন। বেসিলেরই সংস্পর্শে একদিন আলাপ হয়েছিল। ভদ্রলোকের এই তামাটে, রোদেপোড়া অথচ ছিমছাম, চেহারা এবং বৃহৎ মস্তক এখন বিস্মৃতিধূসর হয়ে এসেছে আমার মনে; তবে তাঁর বিচিত্র বাচনভঙ্গী এখনো ভুলতে পারিনি। বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ ইত্যাদিসহ পুরো একটি বাক্য কখনও তিনি বলেন না, বাক্যের একচতুর্থাংশ বলেই তিনি ক্ষান্ত হন। তবে বেশ সজোরে বলেন; এতই জোরে যে, মনে হয় কামান দাগছেন। সৈন্যবাহিনীকে অর্ডার দিয়ে দিয়েই বোধ হয় শেষ পর্যন্ত সেটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

মেজর ব্রাউন একজন ভাইসরয়েস্ কমিশনড্ অফিসার, যোদ্ধা হিসেবে বেশ সুনামও অর্জন করেছিলেন। তবে আচারে ব্যবহারে সেই যোদ্ধৃভাব নেই। ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের ধারা ভিত্তিস্থাপন করেছিলেন সেই অসংখ্য চোয়ারে-চরিত্র ব্যক্তির মতোই তাঁর মানসিক গঠন, বৃদ্ধা পরিচারিকার মতোই সহজাত সংস্কার এবং পুরনো আমলের রুচিতেই তা সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত। বেশভূষা ছিমছাম, আচারে-ব্যবহারেও শৈথিল্যের প্রশ্রয় নেই। একটিইমাত্র জিনিসে ইদানীং তাঁর সমস্ত উৎসাহ এসে বাসা বেঁধেছে—সে হলো প্যানসি ফুল। তারই চাষ করে সময় কাটাচ্ছেন এখন। এ জিনিসটির ওপর তাঁর বড়োই মমতা, সে-মমতা এতই নিবিড় যে প্যানসির কথা বলতে গিয়ে দুচোখ তাঁর খুশীতে টল্‌মল্ করে উঠল। সেই সমুদ্রনীল চোখ, কান্দাহারের বিজয়বার্তাতেও যা এতটুকু বিচলিত হয়নি।

"তারপর, মেজর—" চেয়ারের মধ্যে বেশ জাঁকিয়ে বসে রুপার্ট গ্র্যান্ট বলল, "এবার আপনার সমস্যাটা কী বলুন।"

রুদ্ধকণ্ঠে মেজর বললেন, "হলদে প্যানসি। কয়লা কুঠরি। পি জি নর্টহোভার।"

আমরা শুধু মুখ চাওয়াচাওয়ি করলাম, কিছুই আমাদের বোধগম্য হল না। সেই তন্দ্রাচ্ছন্নের মতোই চোখ বুঁজে বসেছিল বেসিল, সে শুধু বলল;

"কী বললেন?"

"এই তো ব্যাপার। রাস্তা, বুঝতেই তো পারছেন। একটা মানুষ, প্যানসি। দেয়ালের ওপর। আমাকে খুন করবে। ব্যাপার গুরুতর। সর্বনাশা কাণ্ড।"

বোকার মতোই আবার মাথা নাড়লাম আমরা। তারপর একটু একটু করে, প্রধানত বেসিলেরই সাহায্যে, উত্তেজিত মেজরের সেই টুকরো টুকরো কথাগুলির অর্থ আমরা বুঝতে পারলাম। সে এক আশ্চর্য গল্প। তবে তার মর্মোদ্ধার করতে আমাদের যে নিদারুণ বেগ পেতে হয়েছিল, পাঠকদের ওপর আর সে-যন্ত্রণা চাপিয়ে দিতে চাই না; আমার নিজের জবানীতেই বরং গল্পটা বলা যাক। পাঠকরা শুধু একবার আমাদের অবস্থাটা কল্পনা করুন। বেসিল সেই তন্দ্রাচ্ছন্নভাবেই বসে আছে, মুদ্রিতনয়ন। এদিকে রুপার্ট আর আমার চক্ষু ক্রমশই গোলাকার হয়ে উঠছে।

সামনে বসে আছেন মেজর ব্রাউন ;—কালো পোষাক পরা ছোটখাটো মানুষটি, টেলিগ্রামের সংক্ষিপ্ত টুকরো-টুকরো ভাষায় অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। সেদিন তাঁর মুখ থেকে যে অদ্ভুত কাহিনী আমরা শুনলাম, পৃথিবীর সবচাইতে উদ্ভট গল্পকেও তা অক্লেশে হার মানায়।

ফৌজী জীবনে মেজর ব্রাউন বেশ উন্নতি করেছিলেন, সে কথা আগেই বলেছি। তবে, সত্যি বলতে কি, চাকরির ওপর তাঁর আদৌ আকর্ষণ ছিল না। তাই অর্ধেক বেতনে যখন তাঁকে রিটায়ার করতে হলো, মোটেই অখুশী হলেন না তিনি। রিটায়ার করে ছোট্ট একখানা বাড়িতে এসে উঠলেন। ফুলের মধ্যে প্যান্‌সি আর পানায়ের মধ্যে পাতলা চা—এ-ই এখন তাঁর একমাত্র নেশা। ফৌজী জীবনের তরোয়ালখানা এখন তাঁর গৃহসজ্জার সামগ্রীমাত্র, দুটি স্টু-পট আর একখানা সস্তা জলরঙা ছবির পাশে সেই তরোয়াল এখন তাঁর দেয়ালে ঝুলছে। যুদ্ধবিগ্রহের ঝামেলা মিটিয়ে দিয়ে এই যে তিনি তাঁর ছোট্ট বাড়িটির রৌদ্রোজ্জ্বল বাগানে এসে আশ্রয় নিতে পেরেছেন, এতেই সারা মন তাঁর আনন্দে ভরপুর। বিগতদিনের তুলনায় এ-জীবনকে তাঁর স্বর্গ বলে মনে হয়। আর বাগান করার রুচিও তাঁর নিখুঁত। সাজানো-গোছানো প্রকৃতির মানুষ, অসঙ্গতি তাঁর সহ্য হয় না। পারেন তো ফুলগুলিকেও তিনি শ্রেণীবদ্ধভাবে কুচকাওয়াজ করিয়ে নেন। কোথাও এতটুকু এদিক-ওদিক হবার যো নেই। একদল লোকই থাকে এমনিতরো। ছাতা রাখবার স্ট্যাণ্ডে যদি তিনটি ছাতা রাখতে দেওয়া হয় তো তারা রীতিমত অস্বস্তি বোধ করবে। চারটে ছাতা পেলে তবেই তারা খুশী। স্ট্যাণ্ডের এধারে যদি দুটো ছাতা রাখে তো ওধারেও রাখবে দুটো। নইলে যে সঙ্গতি রইলো না! মেজর ব্রাউনও এমনি ধাঁচের মানুষ। জীবনকে তাঁর একটা মাপাজোকা ছক্‌কাটা নক্সার মত মনে হয়। এ-হেন মানুষকে যদি কেউ এসে বলত যে, বাড়ির থেকে দু-পা এগিয়েই তিনি এক রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের জালে জড়িয়ে পড়বেন তো তিনি সেকথা বিশ্বাস করতেন না, বলাই বাহুল্য। হয়তো তার অর্থই তিনি বুঝে উঠতে পারতেন না। আর সেই অ্যাডভেঞ্চারও কি যেমন-তেমন? গহন অরণ্যেও তা কল্পনা করা

যায় না, বৃদ্ধক্ষেত্রের অ্যাফ্রোক্ষোরকেও তার পাশে নিতান্তই জোলো বলে মনে হয়।

ঘটনার দিন মেজর ব্রাউন কটিনমাফিক হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। ঝলমলে উজ্জ্বল বিকেল, ফুরফুরে হাওয়া বইছে। একটা সরুমতন গলিরাস্তার মধ্যে দিয়ে চলেছেন তিনি। সকলেই এ-ধরণের রাস্তার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। বড় বড় অট্টালিকার পেছনদিককার দেওয়াল-ঘেঁষা নির্জন রাস্তা, দেখলেই কেমন যেন মনে হয়—একটা থিয়েটার-হলের পেছন দিয়ে হাঁটছি। আর কেমন অস্বস্তি লাগে। মেজর ব্রাউনের কিন্তু খারাপ লাগছিল না। উল্টো দিক থেকে আর-একজন পথচারী এগিয়ে আসছিল; হাতে তার একটা ফুলবোঝাই ঝাঁকা। দশাসই পুরুষ, চোখদুটি মাছের চোখের মত ভাবলেশহীন। মেজর ব্রাউনের সামনাসামনি এসে সে তার ফুলের ঝাঁকা এগিয়ে ধরল। সে কী ফুল! তার তুলনা হয় না। সবরকমেরই ফুল রয়েছে তাতে, তার মধ্যে প্যানসিগুলোই আবার সব থেকে সুন্দর। মেজরের আর আনন্দ ধরে না। দু-চার কথার পর ফুলওয়ালার সঙ্গে তিনি দরদস্তুর শুরু করলেন। প্রথমটায় একটু হিসেবী হবার চেষ্টা করেছিলেন; এটাকে ভালো বলেন তো ওটাকে ঠেলে রাখেন। তবু সে আর কতক্ষণ। দু-একবার বাছাই করবার ব্যর্থ চেষ্টা করে হাল ছেড়ে দিলেন তিনি, তারপর সবগুলোই কিনে নিলেন। দাম নিয়ে চলে যাচ্ছিল ফুলওয়ালা, কী ভেবে সে ফিরে এল আবার। এসে বলল, "একটা কথা বলি শুনুন। আপনার তো খুব ফুলের শখ্, যান—ওই দেয়ালটার ওপর উঠুন গিয়ে।"

"দেয়ালে উঠ্‌বো! সে কি কথা!" স্তম্ভিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন মেজর। ফুলওয়ালা বলে কী। পরের দেয়ালে উঠ্‌তে হবে! কী বিদ্‌ঘুটে প্রস্তাব। কল্পনা করতেই তাঁর পরিশীলিত মার্জিতরুচি হৃদয় যেন একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল।

"উঠুন না গিয়ে, উঠে তারপর ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখুন। দেখবেন একটা ফুলের বাগান। আর তাতে চমৎকার সব হল্‌দে প্যান্‌সি ফুটে রয়েছে। এত ভালো প্যান্‌সি ইংল্যাণ্ডের আর অন্য কোনও বাগানে নেই।"

সমস্ত দ্বিধাসঙ্কোচ ভেসে গেল মেজরের। প্যান্‌সি-বাগান! শূন্যে পা ছুঁড়ে

দিয়ে প্রায় অবলীলাক্রমেই তিনি বাগানের প্রান্তে সেই প্রাচীরের ওপর উঠে দাঁড়ালেন। তারপরেই তাঁর সম্বিৎ ফিরে এল। এ কী করেছেন তিনি। বাতাসে ফ্রককোট উড়ছে, নিজেকে তাঁর একটা নিরেট মূর্খ বলে মনে হলো। কিন্তু সে-মনোভাবও বেশীক্ষণ টিঁকলনা। কেননা, পরক্ষণেই এক বীভৎস-সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ল তাঁর। সুন্দর, সেইসঙ্গে ভয়ঙ্কর। কী দেখলেন মেজর ব্রাউন? দেখলেন, বাগানের প্রায় মাঝখানে অজস্র প্যান্‌সিফুলের সমারোহ। অপূর্ব, অপরূপ। আর সেই অপরূপ সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে আর একটি জিনিস তাঁর চোখে পড়ল। তিনি দেখলেন, প্যান্‌সি গাছগুলো সব বিরাট বিরাট অক্ষরের আকারে সাজানো রয়েছে, সব মিলিয়ে তৈরী হয়েছে একটা গোটা লাইন। লাইনটা হলো:

"মেজর ব্রাউনকে হত্যা কর"

বুড়ো একজন মালী ঝাঁঝরিতে করে' সেই প্যান্‌সি-গাছে জল ঢালছে। ভালমানুষ-গোছের চেহারা, সাদা গোঁফ।

দেয়ালের উপর দাঁড়িয়ে থেকেই বিদ্যুৎবেগে মেজর ব্রাউন রাস্তার দিকে ফিরে তাকালেন। নির্জন গলি, ফুলওয়ালা উধাও হয়ে গিয়েছে। বাগানের দিকেই আবার ফিরে তাকালেন তিনি। সেই সুন্দর প্যান্‌সিফুল, সেই অবিশ্বাস্য মৃত্যু-দণ্ডাদেশ। অন্য যে-কোনও লোকের মনে হতে পারত যে তার নিজেরই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। মেজরের কিন্তু তা মনে হলো না। মিলিটারী ইউনিফর্ম পরে তিনি বার হয়েছিলেন, ব্যাজের ওপর তিনি হাত বুলিয়ে নিলেন বারকয়েক। অতীতে, ফৌজী জীবনে, সুন্দরী সব মেয়েরা যখন সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাঁর ব্যাজের ওপর ঝুঁকে পড়ত, নিজেকে তখন মেজরের অত্যন্তই নীরস এবং চোয়াড়ে-গোছের লোক বলে মনে হয়েছে। আজ সেই ব্যাজেই হাত বুলিয়ে তিনি বুঝলেন, না—তিনি পাগল হয়ে যাননি। অন্য যে-কোনও লোকের একথাও মনে হতে পারত যে, কেউ তার সঙ্গে একটা মর্মান্তিক রসিকতা করেছে। তা-ও মেজরের মনে হলনা। কেননা, বর্তমানক্ষেত্রে এই প্যান্‌সি ফুলের নক্সার ওপর যে বিপুল-পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে অত টাকা খরচ করে' কেউ রসিকতা করতে যায়

না। কী তাহলে এর অর্থ! হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন মেজর ব্রাউন। পথ চলতে চলতে একটা ছ'পা-ওয়ালা মানুষ দেখলে যতখানি অবাক্ হয়ে যাবো আমরা, ততখানিই তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

হঠাৎ তাঁর দিকে চোখ পড়ল সেই বুড়ো মালীর। মেজরকে দেখে সে-ও কিছু কম অবাক হল না। হাত থেকে তার জলের ঝাঁঝরিটা মাটিতে পড়ে গেল, জল ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে।

"কে আপনি?" কাঁপতে কাঁপতে চেঁচিয়ে উঠল সে।

"আমি মেজর ব্রাউন।" ঠাণ্ডাগলায় মেজর জবাব দিলেন। বিপদের মুহূর্তে তিনি বিচলিত হন না।

জবাব শুনে সে আরও অবাক হয়ে গেল। হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে ডাঙায়-তোলা মাছের মতো খাবি খেতে লাগল যেন। তারপর সে চেঁচিয়ে উঠল আবার, "নেমে আসুন, শীগগীর নেমে আসুন।"

"বেশ, ভালো কথা।" বলে একলাফে মেজর সেই বাগানের মধ্যে নেমে পড়লেন। তবে, এতই টিপ্‌টপ্ মানুষ তিনি, এই বিরাট লম্ফেও তাঁর রেশমী টুপিটি স্থানচ্যুত হলো না।

বুড়ো মালী ফিরে দাঁড়াল। বাগানের ঠিক সামনেই একটা বাড়ি, সেইদিকে ছুটতে লাগল সে; মেজর তাকে অনুসরণ করলেন। খিড়কীর দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকলেন তাঁরা; চলতে চলতেই মেজর বুঝতে পারলেন, বাড়িটি প্রায় প্রাসাদোপম। অবশেষে তাঁরা বৈঠকখানার দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন। বন্ধ দরজা। মালীটি হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল। সায়াহ্নের সেই ম্লানালোকেও মেজর স্পষ্ট দেখলেন, সারা মুখ তার অসহ্য ভয়ে শাদা হয়ে গিয়েছে।

মালী বলল, "একটি নিবেদন আছে হুজুর; দয়া করে এখানে খেঁকশিয়ালের নাম করবেন না। ঈশ্বরের দোহাই।" বলেই সে দরজা খুলে দিল। ভিতরের থেকে লাল আলোর রশ্মি এসে ছড়িয়ে পড়ল বাইরে। মালী আর একমুহূর্তও দাঁড়াল না, সিঁড়ি বেয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে নীচে নেমে গেল।

মেজর ব্রাউন গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। মাথার থেকে টুপি নামিয়ে সেটাকে এখন

তিনি হাতে নিয়েছেন। ঢুকেই তিনি বিস্মিত হলেন। সুসজ্জিত ঘর, আর তারই একেকোণে জানালার পাশে বসে আছেন একটি ভদ্রমহিলা। জানালা দিয়ে তিনি বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন। ধারেকাছে আর দ্বিতীয় প্রাণী নেই। মেজর বিস্মিত হলেন বটে, তবে অপ্রতিভ হলেন না। ভব্যতায় তিনি অদ্বিতীয়; মহিলাদের সামনে এসে যারা ঘাবড়ে যায় সে-দলের লোক নন।

মাথা নুইয়ে মৃদুস্বরে তিনি বললেন, "আমার নাম মেজর ব্রাউন।"

বাইরের দিকেই চেয়ে রইলেন ভদ্রমহিলা, ফিরে তাকালেন না। সেই অবস্থাতেই শুধু বললেন, "বসুন"।

ভদ্রমহিলা সুন্দরী, লাবণ্যময়ী। সবুজ পোষাকে চমৎকার মানিয়েছে। মাথায় একরাশ সোনালী চুল। গা থেকে মৃদু সৌরভ বেরুচ্ছে। বিষণ্ণকণ্ঠে তিনি বললেন, "বুঝতে পেরেছি, সেই দলিলপত্র নিয়েই আবার আমাকে জ্বালাতে এসেছেন।"

মেজর ব্রাউন বললেন, "আজ্ঞে না। আমি শুধু জানতে এসেছি ব্যাপারটা কী। কেন আপনার বাগানে আমার নামে লেখা রয়েছে? অমন সাংঘাতিক-ভাবেই বা লেখা রয়েছে কেন?"

মেজরের কণ্ঠস্বর গম্ভীর, বিক্ষুব্ধ। বাগানের ভয়ঙ্কর দৃশ্যে তাঁর শান্তিপ্রিয় মনের ওপর এই প্রসন্ন বিকেলেও যে মর্মান্তিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে ভাষায় তা বর্ণনা করা যায় না। এই মধুর পটভূমিকায় কী সাংঘাতিক দৃশ্য। প্যান্‌সি-ফুলের সজ্জিত হরফে তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ লেখা রয়েছে!

"আপনি তো জানেন," ভদ্রমহিলা বললেন, "আমার এখন ফিরে তাকাবার উপায় নেই। প্রতি সন্ধ্যায় ছ'টা না বাজা পর্যন্ত আমাকে রাস্তার দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয়।"

সমস্ত ব্যাপারটাই মেজর ব্রাউনের কাছে একটা প্রচণ্ড প্রহেলিকার মত ঠেকছিল। অথচ বিস্মিত হবার শক্তিটুকুও যেন এখন তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি আর তাই কথা বাড়ালেন না। বিনা প্রতিবাদে বললেন, "তা ছ'টা তো প্রায় বাজতে চলল—"। বলতে না বলতেই দেয়ালঘড়িতে ছ'টা বাজার ঘণ্টা

পড়তে শুরু হল। ঘণ্টা বাজা শেষ হবামাত্রই ফিরে দাঁড়ালেন মহিলা। এতক্ষণ যাঁকে শুধু সুন্দরী বলে মনে হচ্ছিল, মুখ দেখে বোঝা গেল—তিনি অপরূপ সুন্দরী। মেজর ব্রাউন অন্তত এত সৌন্দর্য আর অন্য কোথাও দেখেননি।

চেঁচিয়ে উঠলেন মহিলা, "প্রতীক্ষার তৃতীয় বছর আজ আমার পূর্ণ হলো। আর আমি পারি না, আর আমার প্রতীক্ষা করে বসে থাকবার ক্ষমতা নেই। এর চাইতে যদি সেই সাংঘাতিক ব্যাপারটা ঘটে যায় তো সেও অনেক ভালো।"

মহিলার কথা শেষ হতে-না-হতেই তীব্র একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল নীচের থেকে। সন্ধ্যার অন্ধকার রাস্তায় দাঁড়িয়ে কে যেন চিৎকার করে বলছে, "মেজর ব্রাউন, মেজর ব্রাউন, খেঁকশিয়ালের বাসা কোথায়?"

মেজর ব্রাউন নীরবকর্মী। নিঃশব্দ দ্রুতপায়ে তিনি সামনের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন, চেয়ে দেখলেন চতুর্দিকে। জনপ্রাণীর চিহ্নও নেই কোথাও, দু-একটা ল্যাম্পপোস্ট থেকে শুধু রাস্তার ওপর ম্লান আলো ছড়িয়ে পড়ছে। ঘরে ফিরে এলেন মেজর ব্রাউন, এসে দেখলেন প্রবল আতঙ্কে সেই ভদ্রমহিলা থরথর করে কাঁপছেন। কাঁপতে কাঁপতেই তিনি বললেন, "আর রক্ষে নেই। হয়তো আমাদের দুজনকেই এবার মরতে হবে। যখনই—"

এবারেও তাঁর কথা শেষ হলো না। সেই তীব্র চিৎকার ভেসে এল রাস্তার থেকে:

"মেজর ব্রাউন, মেজর ব্রাউন, খেঁকশিয়ালটা মরলো কিসে?"

আবার ছুটে বেরিয়ে এলেন মেজর, আবারো তিনি হতাশ হলেন। কাউকেই দেখা গেল না। সেই নির্জন রাস্তায় যেন সে হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে। মেজর ব্রাউন, বলতে কি, খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে এলেন তিনি। ঘরে ঢুকতেই আবার সেই চিৎকার:

"মেজর ব্রাউন, মেজর ব্রাউন, খেঁক—"

চিৎকার আর এবার শেষ হলনা। বিদ্যুৎবেগে মেজর ব্রাউন ঘর ছেড়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। এবং যে দৃশ্য দেখলেন তিনি, তাতে রক্ত জমে' তাঁর বরফ হয়ে গেল। ফুটপাতের ওপর একটা কাটা মুণ্ডু।

পরক্ষণেই তিনি বুঝলেন ব্যাপারটা। কয়লার ধোঁয়া বেরুবার জন্যে রাস্তার ওপর যে গর্ত থাকে তারই মধ্যে কে যেন শরীর ঢুকিয়ে দিয়েছে। শুধু তার মুণ্ডুটা রয়েছে বেরিয়ে। নিমেষের মধ্যেই মুণ্ডুটা গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মেজর ব্রাউন তখন তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন। মহিলাটির দিকে তিনি ফিরে তাকালেন। বললেন, "মাটির নীচে আপনার কয়লাকুঠ্রির সঙ্গে রাস্তার ঐ গর্তটার নিশ্চয়ই একটা যোগাযোগ আছে। দয়া করে কুঠ্রিটা আমাকে দেখিয়ে দিন।"

ভদ্রমহিলা অবাক বিস্ময়ে মেজরের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, "কুঠ্রি দিয়ে আপনি কি ঐ অন্ধকার গর্তটার দিকে যেতে চান নাকি? ঐ শয়তানটা যে ওখানে রয়েছে?"

"এইটেই কি কয়লাকুঠ্রির পথ?" কথা না বাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন মেজর। তারপর রান্নাঘরের সিঁড়ি দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তিনি নীচে নামতে শুরু করলেন। কয়লাকুঠ্রির সামনে গিয়ে একটু থেমে দাঁড়ালেন তিনি, তারপর তার দরজা খুলে ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। ঘুটঘুটে অন্ধকার। পকেটে হাত ঢোকালেন মেজর, দেশলাইটা বার করবেন। হঠাৎ সেই অন্ধকারের ভেতর থেকে অতিকায় একজন মানুষের রোমশ দুটি হাত বেরিয়ে এসে মেজর ব্রাউনকে জাপটে ধরল। ঘাড় ধরে মেজরকে সে নীচে টেনে নামাতে লাগল,—নীচে, নীচে, আরও নীচে। চারদিকে দমবন্ধ অন্ধকার। এই চরম সঙ্কটেও বুদ্ধি হারালেন না মেজর, সেই অদৃশ্য শত্রুকে প্রথমটায় তিনি বাধাও দিলেন না একটুকু। তারপর তাঁর ঘাড় বেঁকে যখন প্রায় হাঁটুতে এসে ঠেকবার উপক্রম, হঠাৎ তিনি তাঁর বজ্রদৃঢ় হাত বাড়িয়ে শত্রুর একখানা পা জাপটে ধরলেন। তারপরেই সজোরে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন সামনের দিকে। সশব্দে সে মেঝের ওপর গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে, কিন্তু মেজর তখন তার টুঁটি টিপে ধরেছেন। সেই অবস্থাতেই জাপটাজাপটি চলল কিছুক্ষণ। শত্রু তখন কাবু হয়ে এসেছে, সে তখন পালাতে পারলেই বাঁচে। পাগলের মত সে দরজা খুঁজতে লাগল। কিন্তু মেজরও সহজ পাত্র নন। এক হাতে তিনি কুঠরির একটা

কড়ি আঁকড়ে ধরেছেন, আরেক হাতে পাকড়ে ধরেছেন শত্রুকে। মেজরের হাতের মুঠোয় তার কোটের কলার। কিন্তু কতক্ষণ আর এইভাবে এই ষণ্ডাটাকে পাকড়ে রাখা যায়, অনবরত সে ঝাঁকুনী দিয়ে ছিটকে যেতে চাইছে। মেজরের মনে হলো, ঝাঁকুনীর চোটে কাঁধ থেকে হাতখানা তাঁর ছিঁড়ে বেরিয়ে যাবে। ছিঁড়লও শেষপর্যন্ত। তবে মেজরের হাতখানা নয়, শত্রুর কোট। দৌড়ে সে পালিয়ে গেল, ছেঁড়া কোটটা পড়ে রইল মেজরের হাতে। সংগ্রামের একমাত্র স্মৃতিচিহ্ন ছেঁড়া সেই কোটের টুকরো হাতে নিয়ে মেজর ব্রাউন ওপরে এলেন। এসে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন তিনি। ভদ্রমহিলা উধাও। ঘরের বহুমূল্য আসবাবপত্র, এমন কি সেই দেয়াল-ঘড়িটা পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেছে। কোনও কিছুরই আর চিহ্নমাত্রও নেই। সদ্য-চুনকাম করা শাদা দেয়ালগুলো শুধু দাঁত বার করে হাসছে।

গল্প যখন এতদূর পর্যন্ত এগিয়েছে, রুপার্ট গ্র্যাণ্ট হঠাৎ মন্তব্য করল, "বুঝতেই পারা যাচ্ছে, ভদ্রমহিলাও এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে লিপ্ত রয়েছেন।" এ কথায় লাল হয়ে উঠল মেজরের মুখ। তিনি শুধু বললেন, "আজ্ঞে না। আমার তা মনে হয় না।"

রুপার্ট ভুরু কোঁচকাল একবার; মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল মেজরের দিকে, তবে কথা বলল না। খানিক বাদে বলল, "ছেঁড়া কোটটা তো আপনার কাছেই রয়েছে, তার পকেটের মধ্যে কিছু পেলেন?"

"পেয়েছি। কিছু খুচরো পয়সা, সবশুদ্ধ সাড়ে দশ পেনি। তা ছাড়া একটা সিগারেট-হোল্ডার, এক টুকরো দড়ি, আর এই চিঠিখানা।" বলে তিনি চিঠিখানাকে টেবিলের ওপর রাখলেন। চিঠিটা এখানে তুলে দিচ্ছি:

"প্রিয় মিঃ গ্রোভার,

মেজর ব্রাউনের সম্পর্কে যে-ব্যবস্থা আপনাকে করতে বলা হয়েছিল, তাতে বিলম্ব ঘটায় আমি উদ্বেগ বোধ করছি। পূর্বব্যবস্থা অনুযায়ী আগামীকালই তাঁকে আক্রমণ করবেন। হ্যাঁ, কয়লাকুঠুরির মধ্যেই।

আপনার বিশ্বস্ত

পি জি নর্থহোভার"

চিঠিখানা মেজর ব্রাউন আমাদের নিজেই পড়ে শোনালেন। রুপার্ট গ্র্যান্টের চোখদুটি যেন শিকারে বাঘের চোখের মতো তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছিল আস্তে আস্তে। পত্রপাঠ শেষ হলে সে জিজ্ঞেস করল :

"চিঠিখানার ওপরে কি কোনও ঠিকানা দেওয়া আছে ?"

"কই, না-তো। ওহো, এই যে দেখছি ঠিকানা রয়েছে।" ঠিকানাটা পড়ে শোনালেন মেজর ব্রাউন, "১৪নং ট্যানার্স কোর্ট, উত্তর—"

উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল রুপার্ট, "তবে আর এখানে সময় নষ্ট করছি কেন ? চলুন, যাওয়া যাক্। বেসিল, তোমার রিভলবারটা আমাকে দাও তো—।"

আগুনের চুল্লীর দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে বেসিল, যেন মন্ত্রমুগ্ধ। কিছুক্ষণ পরে সে মৃদুকণ্ঠে বলল, "রিভলবারের দরকার হবে না তোমার।"

"হয়তো হবেনা, হয়তো হবে।" ফারকোটটা গায়ে চাপাতে চাপাতে রুপার্ট বলল, "কিছুতো বলা যায় না। গুণ্ডাদের আস্তানায় যাচ্ছি যখন, সঙ্গে একটা—"

"তোমার কি ধারণা এরা গুণ্ডা ?"

হা হা করে রুপার্ট হেসে উঠল, "গুণ্ডা নয়তো কি সাধুপুরুষ ? নির্দোষ একজন ভদ্রলোককে যারা কয়লাকুঠুরির মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতে চায় তুমি হয়তো তাদের সাধুপ্রকৃতির লোক বলে মনে করতে পার, কিন্তু—"

"তোমার কি মনে হয় মেজরকে তারা হত্যা করতে চেয়েছিল ?" আগের মতোই নির্লিপ্ত বেসিলের কণ্ঠস্বর।

"তুমি তা হলে কিছুই শোননি দেখছি ? ঘুমিয়ে পড়েছিলে বুঝি ? নাও, এই চিঠিটা দেখ।"

পাগলা জজ্ বেসিল গ্র্যান্ট শান্তস্বরেই বললো, "না, ঘুমোইনি। চিঠিটাকেও তো আমি দেখতেই পাচ্ছি—।" আসলে কিন্তু বেসিল সেই চুল্লীটাকেই দেখছিল। সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই সে বলল, "গুণ্ডারা কখনো এ-ধরণের চিঠি লেখে না।"

ফিরে দাঁড়াল রুপার্ট গ্র্যান্ট, দু চোখে তার ঠাট্টা উপচে পড়ছে। বাঘের

গলায় সে বলল, "বেসিল, তুমি অবাক করলে! এ-ই সেই চিঠি। কেউ না কেউ এ-চিঠি লিখেওছে, এবং এতে আক্রমণেরও নির্দেশ দেওয়া রয়েছে। তবু তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? লণ্ডন শহরটা যে ইংল্যাণ্ডেরই মধ্যে—তাতেও কি তোমার অবিশ্বাস?"

বেসিলকে দেখে বুঝলাম, নিঃশব্দ হাসির অদম্য বেগে সারা শরীর তার কেঁপে কেঁপে উঠছে। তবে, মুখে তার প্রকাশ নেই। সে শুধু বলল, "রুপার্ট, ব্যাপারটা ঠিক ওভাবে দেখলে চলবে না। ওধরণের যুক্তি দিয়ে বিচার করবে না এর। চিঠিটার মেজাজটা কি তুমি ঠিক বুঝতে পেরেছ? এ কখনোই খুনীর চিঠি নয়।"

"আলবৎ খুনীর চিঠি।" রুপার্ট তার সেই অকাট্য যুক্তির জের টেনে বলল, "একবার নয়, একশোবার। এবং চিঠির ভাষার মধ্যেই তার প্রমাণ রয়েছে।"

"প্রমাণ!" মন্ত্রোচ্চারণের মতো বিড়বিড় করে কথা বলতে লাগল বেসিল, "এই প্রমাণ জিনিসটাই যে কতো সময় প্রকৃত সত্যকে আড়াল করে ফেলে কে তার খবর রাখে! কে জানে, আমারই হয়তো ভুল; আমিই হয়তো পাগল হয়ে গেছি। কিন্তু হুঁ, সেই লোকটারও তো প্রমাণেরই ওপর সবকিছু ছেড়ে দেবার অভ্যাস; তা সত্ত্বেও জেনে রাখো, তার বিচারবুদ্ধির ওপর আমার এতটুকু আস্থা নেই। কি যেন তার নাম, ওই যে সেই দারুণ দারুণ সব গল্পের নায়ক? হ্যাঁ, মনে পড়েছে,—শার্লক হোম্‌স্‌। যা বলছিলাম; খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাই আমাদের এক একটা সিদ্ধান্তে নিয়ে গিয়ে হাজির করে সত্যি, তবে প্রায়ই দেখা যায়—সেগুলি ভুল সিদ্ধান্ত। প্রমাণতো আর নির্দিষ্টপথ নয়, ডালপালার মতো নানান দিকে তার বিস্তার। তথ্য বহুমুখী, কিন্তু সত্য এক। সত্য হলো গাছের প্রাণশক্তির মতো, সবসময়েই সে উর্ধ্বমুখে সূর্যপ্রয়াসী।"

"ওসব বড়ো বড়ো কথা ছেড়ে দাও, কাজের কথায় এসো। এ চিঠিতেও যদি অপরাধের ইঙ্গিত না থাকে তো কী আছে এর মধ্যে বুঝিয়ে দাও।"

বেসিল বলল, "অনেক কিছুই থাকতে পারে, আমি নিজেই কি তা বুঝতে

পেয়েছি? আমি শুধু এই চিঠিটাকেই এখানে দেখছি মাত্র। তাতে আপাতত এই কথাই মনে হচ্ছে যে, এর মধ্যে কোনও অপরাধের ইঙ্গিত নেই।"

"এ চিঠি লিখবার অর্থ?"

"জানি না। কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না!"

"না-ই যদি বোঝো, আমাদের ব্যাখ্যাটাকেই কেন মেনে নিচ্ছ না?"

বেসিল সেই আত্মসমাহিতভাবেই আগুনের চুল্লীর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ; মনে হলো ধীরে ধীরে সে তার চিন্তাকে সুশৃঙ্খল করে নিচ্ছে। তারপর সে বলল, "মনে করো, এক জ্যোৎস্নাভরা রাত। সেই রাতে তুমি বেড়াতে বেরিয়েছ। মনে করো, জ্যোৎস্নার সেই নির্জন আলোতে তুমি পথ হাঁটছ। হাঁটতে হাঁটতে অনেক রাস্তা, অনেক গলিঘুঁজি পার হয়ে শেষে এক ফাঁকা ময়দানের মধ্যে এসে পৌঁছুলে। চারিদিকে তার গোটাকতক স্তম্ভ শুধু। আর ঝলমলে পোষাক-পরা এক নর্তকী সেই ম্লান জ্যোৎস্নায় নেচে চলেছে। তুমি তাকে দেখলে। দেখার পর মনে হলো, আরে এ-তো মেয়ে নয়—ছদ্মবেশী পুরুষ। আবার তাকে দেখলে তুমি, আবার। তারপর বুঝলে যে, এই ছদ্মবেশী পুরুষ আর অন্য কেউই নয়, স্বয়ং লর্ড কীচেনার। কী তখন তোমার মনে হবে?"

একমুহূর্ত থেমে রইল বেসিল, তারপর আবার বলল, "এ-যা বললাম এরও একটা সহজ ব্যাখ্যা আছে বটে, তবে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। ঝলমলে পোষাক পরার সহজ ব্যাখ্যা হলো এই যে, মানুষকে তাতে সুন্দর দেখায়। তবে কি সুন্দর দেখাবার জন্যেই লর্ড কীচেনার ওই নর্তকীর ঝলমলে পোষাক পরে নেচে বেড়াচ্ছেন? পাগলেও তা ভাববে না। তার চাইতে বরং একথা ভাবা যায় যে, তাঁর প্রপিতামহীর হয়তো নাচের ঝোঁক ছিল, বংশানুক্রমে লর্ড কীচেনার এখন সেই নৃত্যোন্মাদনার অধিকারী হয়েছেন। কিংবা হয়তো হিপ্‌নোটাইজ করে তাঁকে নাচিয়ে নিচ্ছে কেউ; কিংবা কোনও গুপ্তসমিতি হয়তো তাঁকে শাসিয়েছে, না-নাচলে তাঁকে খুন করা হবে। এ-নাচ তাহলে স্বাভাবিক নয়। স্বাভাবিক বলেই অবশ্য মনে করা যায়, লর্ড কীচেনার না-হয়ে ব্যক্তিটি যদি লর্ড ব্যাডনপাওয়েল হন। জজ্-এর চাকরি করার সময় তাঁকে আমি বেশ ভালভাবেই জানতাম কিনা, তাই

একথা বলতে ভরসা পাচ্ছি। সে যাই হোক্‌, লর্ড কীচেনার আর লর্ড ব্যাডনপাওয়েলের মধ্যে যে-পরিমাণ প্রকৃতিগত পার্থক্য, এ-চিঠি আর একটা খুনীর চিঠির মধ্যেও ঠিক ততখানিই পার্থক্য বর্তমান। জেনে রেখো, এ-চিঠি যে লিখেছে—আর যাই হোক্‌ সে শুভ্রাবদ্‌যোগ নয়। আসল কথা পরিবেশ বড়ো বিচিত্র জিনিস।" বক্তৃতা থামাল বেসিল, কপালের ওপর হাত রেখে চুপ করে রইল।

রুপার্ট এবং মেজর ব্রাউন শুধু একবার তাকাল তার দিকে। সে দৃষ্টিতে শঙ্কা এবং কৌতুক দু-ই মেশানো রয়েছে।

রুপার্ট বলল, "অতোশতো বুঝি না, আমি চললাম। আমার যা ধারণা সে তোমাকে বলেছি। এখনো তার পরিবর্তন হয় নি। অপরাধের ইঙ্গিত দিয়ে যে চিঠি লেখে, তার ইঙ্গিতে সে-অপরাধ যখন সংঘটিতও হয়, তখন আর যাই হোক্‌ তাকে একটা সাধুপুরুষ ভাবা চলে না। কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, তোমার রিভলবারটা কি পাওয়া যাবে ?"

"নিশ্চয়ই," দাঁড়িয়ে উঠে বেসিল বলল, "রিভলবার তুমি নিশ্চয়ই পাবে, তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি।" বলে সে একটা জামা গায়ে দিয়ে নিল, ঘরের কোণ থেকে একটা গুপ্তীলাঠিও সঙ্গে নিতে ভুলল না।

"তুমি আবার কোথায় যাবে !" বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল রুপার্ট, "তুমি তো আজকাল বাইরের হাওয়া বড়ো একটা গায়ে লাগাওনা, তোমার আবার এ-শখ্‌ কেন ?"

বেসিল ততক্ষণে একটা পুরোনো শাদা টুপিও তার মাথায় পরে নিয়েছে। সে বলল, "বাইরের হাওয়া গায়ে লাগাইনা সত্যি, তবে সে-হাওয়া যখন একটু গোলমেলে হয়ে ওঠে তখন তার অর্থ না বুঝেও আমি তৃপ্ত হইনা।"

বলে সে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। ল্যাম্বেথের জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি। নিঃশব্দে আমরা পথ হাঁটছি,—মেজর ব্রাউন, রুপার্ট, আমি এবং বেসিল। ওয়েস্ট্‌-মিন্‌স্টার ব্রীজ্‌ ছাড়িয়ে এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্টের পাশ কাটিয়ে, আমরা হাঁটছি। শুভ্রাফল স্ট্রীট স্ট্রিট, ট্যানার্স কোর্ট। সবাগ্রে মেজর ব্রাউনের ঋজু অস্পষ্ট চেহারা, তার পেছনে রুপার্ট গ্র্যাণ্ট। তীব্র হাওয়ায় তার ওভারকোট দুলছে। গল্পের

বইয়ের ডিটেকটিভের মতোই তার হাবভাব। মেজরের ঠিক উল্টো। মেজাজে সে এখনো সেই ছোকরা-ছেলেটিই রয়ে গেছে। ইংল্যাণ্ডের কাব্য, তার বর্ণ-বৈচিত্র্যের সে একনিষ্ঠ ভক্ত। ওদিকে বেসিল হাঁটছে সবার থেকে পিছনে; দৃষ্টি তার পথের দিকে নয়, আকাশের দিকে নিবদ্ধ। কেমন যেন নিশিতে-পাওয়া তার দৃষ্টি, তার এই ভ্রমসঞ্চার।

ট্যানার্স কোর্টে এসে পৌঁছেচি। রুপার্ট থেমে দাঁড়াল। মনে হল, আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় সে বেশ উৎসাহিত হয়েছে। ওভারকোটের পকেটে সেই রিভলবার, দৃঢ়মুষ্টিতে সে তাকে অনুভব করে নিল।

রুপার্ট বলল, "তাহলে এবার ঢোকা যাক?"

"তার আগে পুলিশ ডাকবো না, পুলিশ?" জিজ্ঞেস করলেন মেজর ব্রাউন; হাতের কাছে যদি পুলিশ পাওয়া যায়, সেই আশাতেই চট করে একবার রাস্তার উপর চোখ বুলিয়ে নিলেন।

"ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।" ভ্রূ কুঁচকে রুপার্ট বললো, "ব্যাপারটা যে একটা শয়তানী কারসাজি, তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। তবে পুলিশ না হলেও বোধ হয় চলবে। আমরাও তো দলে ভারী আছি, ভয় কি? তাছাড়া—

"না, পুলিশের কোনও দরকার নেই।" বাড়ি থেকে বেরিয়ে এই প্রথম বেসিল কথা কইল। কেমন যেন অদ্ভুত শোনাল তার কণ্ঠস্বর। রুপার্ট তার দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল।

তারপরেই যেন সে চমকে উঠল, "বেসিল! বেসিল! তুমি এত কাঁপছ কেন? কী হয়েছে তোমার? ভয় পেয়েছ?"

মেজর বললেন, "বোধ হয় শীত লেগেছে।" বেসিল যে থরথর করে কাঁপছে, তাতে আর এতটুকুও সন্দেহ নেই।

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রুপার্ট তাকে নিরীক্ষণ করতে লাগল, বেসিল তবু কথা কয় না। হঠাৎ যেন ব্যাপারটা বুঝতে পারল রুপার্ট, রাগে খেঁকিয়ে উঠল, "ও, তোমার হাসি হচ্ছে বুঝি? লুকিয়োনা, তোমার ওই নিঃশব্দ ঠাট্টার হাসিকে আমি চিনি। হাসবার আর তুমি সময় পেলে না? একদল গুণ্ডার আড্ডায় এসে কোথায় এখন—"

বেসিল শুধু বলল, "কেন হাসছি, সেকথা এখন থাক। আপাতত জেনে রাখো, পুলিশ ডাকবার দরকার নেই। দলে আমরা চারজন আছি, চারজনেই মস্ত বীর, দরকার পড়লে চারশো লোকের মহড়া নিতে পারব।" বলে সে আবার তার সেই রহস্যময় হাসিতে ভেঙে পড়ল।

অধৈর্য হয়ে ফিরে দাঁড়াল রুপার্ট, তারপর দৃঢ় পদক্ষেপে সেই ফ্ল্যাট বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকল। আমরা যে তার অনুসরণ করলাম, সেকথা বলা-ই বাহুল্য। ১৪নং কামরার সামনে এসে সে থামল, দেখলাম—হাতের মধ্যে তার সেই রিভলবারটা ঝকমক করছে।

"লাইন বেঁধে দাঁড়াও," ফৌজী কায়দায় হুকুম দিল রুপার্ট। বলল, "শয়তানগুলো হয়তো এখন পালাবার ফিকিরে আছে। চট করে আমাদের ঢুকে পড়তে হবে।"

চারজনে আমরা সার বেঁধে দাঁড়ালাম! বুক আমাদের ভয়ে দুরদুর করছে; কী হয়, কী হয়। বেসিলের মুখে কিন্তু ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই, তখনো সে হাসছে। রুপার্টের দিকে তাকালাম। মুখের চেহারা ফ্যাকাশে, চোখের চেহারা অস্বাভাবিক। নিচু ফ্যাসফেসে গলায় সে বলল, "তৈরি থাকো; যে মুহূর্তে আমি 'চার' বলব, সঙ্গে সঙ্গে তোমরা আমার পিছন পিছন ঢুকে পড়বে। যদি বলি 'পাকড়াও', তো যে-ই সামনে পড়ুক না কেন, তাকে একেবারে মাটির ওপর পেড়ে ফেলবে। যদি বলি 'থামো' তো থামবে। গুণ্ডারা যদি দলে ভারী হয়, একমাত্র তাহলেই আমি 'থামো' বলব। যদি তারা আমাদের ওপর চড়াও হয়, বেপরোয়া গুলী চালাব। বেসিল, তুমিও তোমার গুপ্তীখানাকে তৈরি রেখো। রেডি! এক, দুই, তিন, চার!"

'চার' বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে দড়াম করে দরজাটা খুলে ফেলল, আর আমরাও গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম ঘরের মধ্যে। তারপরেই এক বিস্ময়ের ধাক্কা।

ঘরখানা, দেখে মনে হলো, সাধারণ একটি অফিস-কামরা। ঠিক সেই রকমেরই সাজানো-গোছানো, আর—আর সেই ঘরের মধ্যে জনপ্রাণী নেই। ভালো করে আবার তাকিয়ে দেখলাম চারদিকে; তখন দেখি ঘরের এক কোণে

অজস্র-ড্রয়ারওয়ালা বিরাট একটা টেবিলের আড়ালে কে-একজন বসে রয়েছেন। ছোট্টখাট্টো মানুষটি, মোমে-মাজা সূক্ষ্ম গোঁফ। কাছে আসতে তিনি চোখ তুলে চাইলেন।

"অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছিলেন বুঝি?" বিনয়-নম্র কণ্ঠে তিনি বললেন, "বড়োই দুঃখিত, আমি শুনতে পাইনি ; তা কী দরকার আপনাদের?"

কিছুক্ষণ চুপচাপ, কারুর মুখেই কথা নেই। সকলেই আমরা মেজরের পা টিপছি ; তাঁর ব্যাপার, তাঁরই তো কথা বলা উচিত।

গম্ভীরভাবে মেজর ব্রাউন সেই চিঠিখানাকেই সামনে এগিয়ে দিলেন। তারপর প্রশ্ন করলেন, "আপনার নামই কি পি জি নর্টহোভার?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" স্মিতহাস্যে জবাব দিলেন ভদ্রলোক।

"তাহলে—"দৃষ্টিকে আরও কঠিন করে আরও গভীর গলায় মেজর বললেন, "এ-চিঠি আপনারই লেখা?" বলেই তিনি চিঠিখানাকে টেবিলের ওপর মেলে ধরলেন। নর্টহোভারের আচরণে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না।

টেবিলের ওপরেই একটা ঘুষি মারলেন মেজর ব্রাউন ; তারপর বললেন, "কী, কথা বলছেন না যে? ব্যাপারটা কি?"

সূক্ষ্ম গোঁফওয়ালা সেই ভদ্রলোক তাতে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "কোন্ ব্যাপার?"

কড়া সুরে মেজর ব্রাউন বললেন, "কিছুই যে বুঝতে পারছেন না দেখছি? আমিই মেজর ব্রাউন।"

"ও, আপনিই?" নর্টহোভার মাথা নুইয়ে বললেন, "বড়োই আনন্দিত হলাম। তা, আপনি কিছু বলবেন?"

মেজর ব্রাউনের ধৈর্যের তখন বাঁধ ভেঙে গেছে। গলা একেবারে সপ্তমে চড়িয়ে তিনি বললেন, "আমি! আমার আর বলবার কী আছে? এবার মশাই আপনার বলবার পালা। এসবের মানে কি, এই চিঠির? চালাকি করবার আর—"

"ও, ওই চিঠি? চেয়ার ছেড়ে নর্টহোভার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, "আপনারা সব বসুন, এক্ষুণি সব মিটিয়ে দিচ্ছি।" বলে তিনি ইলেকট্রিক

বেলের বোতাম টিপলেন। পাশের ঘরেই ঘন্টা বেজে উঠল। নর্টহোভার বসতে বললেন বটে, তবে মেজর বসলেন না। চেয়ারের হাতলের ওপর ভর দিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন, মেঝের ওপর পা ঠুকতে লাগলেন।

পরক্ষণেই ভিতরের দিকের দরজা ঠেলে সুন্দরমতন একটি ছোকরা-কেরানী ভেতরে এসে ঢুকলেন, পরণে ফ্রক-কোট।

নর্টহোভার তাঁকে বললেন, "মিঃ হপসন, ইনিই হচ্ছেন মেজর ব্রাউন। এঁর সম্পর্কে যেটা আপনাকে আজ সকালে তৈরি করে রাখতে বলেছিলাম, এক্ষুণি সেটা শেষ করে নিয়ে আসুন।"

"এক্ষুণি এনে দিচ্ছি।" বলে মিঃ হপসন চকিতে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

মিঃ নর্টহোভার তখন আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনারা কিছু মনে করবেন না, হাতের কাজগুলো ততক্ষণে আমি শেষ করে ফেলি। কাল থেকে আমি ছুটি নিয়ে বাইরে যাচ্ছি, কাজগুলো তাই চুকিয়ে যাওয়া দরকার। হ্যাঁ, কাল থেকেই ছুটি নিচ্ছি, খুব খানিকটা ঘুরে আসব এবার। হাঃ-হাঃ।"

শিশুর মতন দিলখোলা হাসি হেসে তিনি তাঁর কলম তুলে নিলেন, নিস্তব্ধতা নেমে এল। সেই নীরবতার মধ্যে খসখস করে কলম চলতে লাগল তাঁর, আর আমরা সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রাগে ফুঁসতে লাগলাম।

কতক্ষণ যে এইভাবে কাটত জানি না, ভেতর দিকের দরজা খুলে আবার মিঃ হপসন এসে ঘরে ঢুকলেন। নর্টহোভারের সামনে একশিট্ কাগজ রাখলেন তিনি, তারপর ফের বেরিয়ে গেলেন।

কাগজখানা মিঃ নর্টহোভার টেবিল থেকে তুলে নিলেন। তার ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে অন্যমনস্কভাবে গোঁফে তা দিতে লাগলেন। কলম নিয়ে এখানে-ওখানে এক-আধটু অদলবদল করলেন, ভ্রূ কুঁচকে দু-একটা আত্মগত মন্তব্যও করলেন বুঝি, তারপর সেটা গোড়ার থেকে পড়লেন একবার, অতঃপর কাগজখানাকে তিনি মেজর ব্রাউনের দিকে এগিয়ে দিলেন। ক্রমেই অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন মেজর ব্রাউন; যেভাবে তিনি চেয়ারের হাতলের ওপর হাত ঠুকছিলেন, তার থেকেই তা বোঝা যাচ্ছিল।

নর্টহোভার বললেন, "পড়ে দেখুন মেজর ব্রাউন ; আশা করি, এতে আপনার আপত্তি হবে না।" মেজর পড়লেন। আপত্তি হলো কিনা যথাসময়েই তা জানা যাবে। কাগজ-খানাতে যা লেখা ছিল, হুবহু তা এখানে তুলে দেওয়া হলো।

মেজর ব্রাউন-এর বাবদে পি জি নর্টহোভারের পাওনা

	পাউণ্ড	শিলিং	পেন্স
১লা জানুয়ারী, অফিস হইতে জমা ...	৫	৬	০
৯ই মে, প্যান্‌সির টব ও ২শত প্যানসি গাছ খরিদ ...	২	০	০
ট্রলী ভাড়া ...	০	১৫	০
ট্রলীর জন্য লোকভাড়া ...	০	৫	০
একদিনের জন্য বাড়ি ও বাগান ভাড়া ...	১	০	০
ঘরের আসবাবপত্র ভাড়া ...	৩	০	০
মিস্ জেমসনের মাহিয়ানা ...	১	০	০
মিঃ গ্লোভারের মাহিয়ানা ...	১	০	০
একুনে	১৪	৬	০

পাওনা টাকা অবিলম্বে মিটাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।

কাগজখানা হাতে নিয়ে মেজর ব্রাউন কিছুক্ষণ একেবারে ঝিম মেরে রইলেন ; চেয়ে দেখলাম—চোখদুটি তাঁর ক্রমশই গোলাকার হয়ে উঠছে, মনে হলো এখুনি যেন কোটর থেকে ছিট্‌কে বেরিয়ে আসবে। তারপরেই তাঁর বিমূঢ়ভাব কেটে গেল, আচম্বিতে তিনি গর্জে উঠ্‌লেন, "এ-সবের অর্থ কি ? কী এ-সব ?"

মিঃ নর্টহোভার যেন কৌতুক বোধ করলেন তাঁর এই প্রশ্নাঘাতে ; বললেন, "কেন, অবাক হওয়ার কি আছে ? কী-এটা জিজ্ঞেস করছেন ; এটা আপনার বিল, বলাই বাহুল্য।"

"আমার বিল !" মেজর হতভম্ব হয়ে গেলেন, "আমার বিল ! এ-নিয়ে আমি কি করবো ?"

হেসে উঠলেন মিঃ নর্টহোভার, "টাকাটা মিটিয়ে দেবেন, এই আর কি !"

মেজর তখনও সেই চিত্রার্পিত অবস্থাতে চেয়ারের হাতলের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছেন। এক পা'ও তিনি নড়লেন না, যে-অবস্থাতে দাঁড়িয়েছিলেন সেই অবস্থাতেই শূন্যে তুললেন চেয়ারটাকে, তারপর সজোরে সেটাকে নর্টহোভারের মাথার ওপর ছুঁড়ে মারলেন।

টেবিলের ওপর গিয়ে সশব্দে সেটা আছড়ে পড়ল। সেখান থেকে মেঝেতে। ভয়ে নর্টহোভার লাফিয়ে উঠেছিলেন, অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন। কনুইতে একটু আঘাত লাগলো শুধু। আর সঙ্গে সঙ্গে আমরা গিয়ে তাঁর ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে। অভদ্র বেল্লিক কোথাকার—"নর্টহোভার চেঁচিয়ে উঠলেন।

কণ্ঠস্বরে কর্তৃত্বের ভাব ফুটিয়ে তুলে রুপার্ট বলল, "চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো শয়তান, এক পা'ও নড়ো না। মেজর ব্রাউন যা করেছেন ঠিকই করেছেন। যে ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র তুমি করেছিলে তাতে—"

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসছিলেন নর্টহোভার। উদ্ধতকণ্ঠে তিনি বললেন, "বেশতো, খদ্দেরের যদি মনে হয় তাঁর কাছে আমরা বেশী টাকা চাইছি—তা নিয়ে তিনি আপত্তি জানাতে পারেন ; সে অধিকার তাঁর নিশ্চয়ই আছে। তাই বলে তিনি চেয়ার-টেবিল ছুঁড়বেন ?"

মেজর ব্রাউন অতিশয় ধীরস্থির প্রকৃতির মানুষ, বিপদে বড়ো একটা বিচলিত হন না। কিন্তু এই জটিল রহস্যের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে গিয়ে তাঁর একেবারে দমবন্ধ হবার উপক্রম। নর্টহোভারের কথায় তিনি চিৎকার করে উঠলেন, "কে তোমার খদ্দের ? কিসের টাকা ? তুমিই বা কে ? জীবনে আমি তোমাকে দেখিনি, তোমার এই কিল্‌ফিল্‌ও না। তবে হ্যাঁ, তোমারই এক বদমায়েস সাকরেদ আমাকে খুন করবার উপক্রম করেছিল বটে।"

নর্টহোভারের চোখের দিকে চাইলাম। দৃষ্টি ঘোলাটে। বিমূঢ় বিস্ময়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "উন্মাদ ! আমি উন্মাদের পাল্লায় পড়েছি।

হে ঈশ্বর, পাগলরা যে আজকাল দলে দলে রাস্তায় বেরোচ্ছে কে তা জানতো।"

"ঢের হয়েছে," রুপার্ট গ্র্যাণ্ট তাঁকে ধমকে উঠল, "আর তোমাকে ভড়ং করতে হবে না। বাড়ীর নীচেই একজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে; জেনে রাখো, আমি নিজেও একজন প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ্। ফের যদি চালাকি—"

শ্রান্তগলায় নটহোভার শুধু বললেন, "উন্মাদ! সবকটাই উন্মাদ!"

বেসিল এতক্ষণ একটিও কথা কয়নি। এই সর্বপ্রথম সে মুখ খুলল। মৃদু তন্দ্রাচ্ছন্ন গলায় বলল, "মেজর ব্রাউন, একটি শুধু প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে। আপত্তি আছে?"

মেজর তাঁর দিকে ফিরে তাকালেন; বিস্মিতভাবে বললেন, "আপনি? বেশতো, কি প্রশ্ন করবেন করুন।"

মাথা নিচু করে কী যেন ভাবছিল বেসিল; ভ্রূ কুঞ্চিত। ওয়াড়িখানা দিয়ে মেঝের ওপর অন্যমনস্কভাবে একটা আঁকিবুকি টানতে টানতে সে বলল, "যে-বাড়ীতে আপনি আছেন, আপনার ঠিক আগে কে সেখানে থাকতেন জানেন? তাঁর নাম জানেন আপনি?"

এই অবান্তর অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নাঘাতে আরও খানিকটা ঘাবড়ে গেলেন মেজর ব্রাউন। আমতা আমতা করে বললেন, "জানতাম, তবে এখন ঠিক মনে পড়ছে না। কী যেন নামটা, পার্নি না কী-যেন একটা। ও হ্যাঁ মনে পড়েছে, তাঁর নাম মিঃ পার্নি-ব্রাউন।"

উত্তর শুনে বেসিল স্পষ্টতই বেশ খুশী হল। দেখলাম, চোখদুটি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আবার জিজ্ঞেস করল সে, "বাড়ীটা হাতবদল হয়েছে কবে? অর্থাৎ আপনি কবে এসেছেন?"

মেজর বললেন, "গত মাসে।"

কী যে ছিল তাঁর এই উত্তরের মধ্যে, ঘরের আবহাওয়াই যেন পালটে গেল। নটহোভার এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসছিলেন, হঠাৎ তিনি তাঁর বিরাট চেয়ারখানায় বসে পড়লেন, উচ্ছকিত প্রচণ্ড হাসিতে ভেঙে পড়লেন তিনি। সে হাসি আর থামতেই চায় না।

সেই হাসতে হাসতেই তিনি তাঁর চেয়ারের হাতল চাপড়াতে লাগলেন, সেই হাতল চাপড়াতে চাপড়াতেই তিনি বলতে লাগলেন, "অপূর্ব, ওহো অপূর্ব ; এ যে ভাবাও যায় না, আহা চমৎকার।

তাঁর হাসির শব্দে আমাদের কানে তালা লাগবার উপক্রম। বেসিলের দিকে চেয়ে দেখলাম সে-ও হাসছে। সেই নিঃশব্দ হাসি। আর আমরা তিনজন—আমি, কর্পাট গ্র্যাণ্ট এবং মেজর ব্রাউন—আমরা শুধু বোকার মতো তাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলাম। কেন যে এরা এত হাসছে—মাথামুণ্ডু কিছুই আমাদের বোধগম্য হল না।

কর্পাট আর সহ্য করতে পারছিল না। হঠাৎ সে ধমকে উঠল, "কী হয়েছে বেসিল, এত হাসছ কেন তোমরা? আমি যে এদিকে পাগল হবার উপক্রম। পাগল হয়ে তোমার খুলি উড়িয়ে দেব, তখন ঠ্যালা বুঝবে। ভাল চাও তো হাসি থামাও। কী হয়েছে বলো।"

নর্টহোভার উঠে দাঁড়ালেন।

বললেন, "কী হয়েছে সেটা তাহলে আমার কাছ থেকেই শুনুন। আমিই তবে বুঝিয়ে বলি সমস্ত। সর্বাগ্রে আমি মেজর ব্রাউনের কাছে যোড়হস্তে ক্ষমা চাইছি। আমাদেরই একটা মারাত্মক ভুলের জন্যে ওঁর মনে যে প্রচণ্ড ত্রাস এবং বিস্ময়ের সঞ্চার হয়েছে তার জন্যে আমরা আন্তরিক লজ্জিত। তবে হ্যাঁ, মেজর ব্রাউন, সেইসঙ্গে একথাও আমি বলব, সেই অভাবিত অকল্পনীয় বিপজ্জনক পরিবেশের মধ্যেও আপনি চূড়ান্ত সৎসাহস এবং আত্মমর্যাদার পরিচয় দিয়েছেন। আর, ভালো কথা, এই বিল নিয়ে আপনাকে মাথা ঘামাতে হবে না। খানিকটা আর্থিক ক্ষতি অবশ্য আমাদের হলো,—তা হোক্।" বলে তিনি সেই বিলটাকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললেন, ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ করলেন সেটাকে।

মেজরকে দেখে বুঝলাম, তখনো তাঁর বিস্ময়ের ঘোর এতটুকু কাটেনি। তিনি শুধু আমতা-আমতা করে বললেন, "কী যে আপনি বলছেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। কিসের বিল? ভুলই বা কে করল? আর্থিক ক্ষতিই বা কার।"

মিঃ নর্টহোভার তাঁর টেবিল ছেড়ে সামনে এগিয়ে এলেন। চিন্তামগ্নভাবে

পায়চারি করতে করতে ঘরের ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। এবার ভালো করে তাঁর মুখটিকে নিরীক্ষণ করবার সুযোগ পাওয়া গেল। চোখা তীক্ষ্ণ মুখ, বুদ্ধিদীপ্ত। হঠাৎ তিনি মাথা তুলে চাইলেন।

বললেন, "মেজর, কোথায় আপনি এসেছেন জানেন?"

মেজর বললেন, "না। কিছুই জানি না।"

নর্টহোভার বললেন, "এটা হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার অ্যাণ্ড্ রোমান্স্ এজেন্সী লিমিটেড্-এর হেড অফিস।"

মেজর শুধালেন, "সেটা আবার কি ব্যাপার?"

নর্টহোভার বেশ আরাম করে চেয়ারে ভর দিয়ে দাঁড়ালেন, তারপর পূর্ণদৃষ্টিতে মেজর ব্রাউনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মেজর, কোনও এক অলস অপরাহ্নে কখনও কি আপনি নির্জন কোনও রাস্তায় হেঁটে বেড়িয়েছেন? বেড়াতে বেড়াতে কখনও কি আপনার মনে এমন কোনও অদ্ভুত ইচ্ছে জাগেনি যে, কিছু একটা হোক্, কোনও একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটুক? সে যে কী, আপনাকে তা কেমন করে বোঝাই? ওয়াল্ট হুইটম্যান তাকেই হয়তো বলেছেন 'সাংঘাতিক ভয়াবহ কোনও ঘটনা, আমাদের এই নিরীহনির্দোষ প্রাত্যহিক জীবনে যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। এমন একটা কিছু ব্যাপার—প্রত্যক্ষতার প্রমাণ দিয়ে যাকে বোঝান যাবে না, যা শুধু আমাদের স্বপ্নের সম্ভার। অলৌকিকতার শৃঙ্খল থেকে সে মুক্তিলাভ করুক, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এসে উত্তীর্ণ হোক্,'—কখনো কি আপনার মনে এমন কোনও ইচ্ছে জাগেনি?"

বিমূঢ়ভাবে মেজর ব্রাউন বললেন, "কই, কখনোই তো তা মনে হয়নি।"

উত্তর শুনে মিঃ নর্টহোভার একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, "তাহলে আরেকটু বিশদভাবে বুঝিয়ে বলছি। আধুনিক জীবনের একটা বিরাট চাহিদা মেটাবার জন্যেই এই অ্যাডভেঞ্চার অ্যাণ্ড রোমান্স এজেন্সীর জন্ম। শুধুমাত্র সাহিত্যক্ষেত্রেই নয়, সবজায়গাতেই আজ একটা নতুন অভিযোগ শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। তা হলো এই যে, ক্রমশই ফোলো হয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবন। ঘটনাবৈচিত্র্যের স্বাদ পেতে চায় সবাই, নিত্যনতুন বাধাবিঘ্নের রোমাঞ্চকর সান্নিধ্য

পেতে চায়। বাড়ি থেকে বেরুবার সময় অনেকেই আজ মনে মনে কামনা করে, পথে একটা বিভ্রাটই হোক,—সেই বিঘ্ন তাকে নতুনতর কোনও বৈচিত্র্যের দিকে আকর্ষণ করুক। যাদের মনে এই ঘটনাবৈচিত্র্যের তৃষ্ণা জেগেছে, তৃষ্ণা মেটাবার জন্যে তাঁরা অ্যাডভেঞ্চার অ্যাণ্ড রোমান্স এজেন্সীর সদস্য হয়ে যান। তার জন্যে তাঁদের বাৎসরিক কিংবা তিনমাস অন্তর, একটা চাঁদা দিতে হয়। পরিবর্তে, অ্যাডভেঞ্চার অ্যাণ্ড রোমান্স এজেন্সীও তাঁদের পানসে জীবনকে অদ্ভুত সব অ্যাডভেঞ্চারের স্পর্শে বৈচিত্র্যময় করে তুলবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ধরুন, আমাদের একজন সদস্য হয়তো বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় বার হয়েছেন; হঠাৎ একজন উত্তেজিত ঝাড়ুদার হন্তদন্ত হয়ে এসে তাঁকে খবর দিয়ে গেল, তাঁকে খুন করবার জন্য একটা জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে। তারপর যে-গাড়ীতে তিনি চড়লেন তা তাঁকে তাঁর কর্মস্থলে পৌঁছে দেবার নামে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেল এক আফিং-এর আড্ডায়। সেখানে হয়তো একটা রহস্যময় টেলিগ্রাম পেলেন তিনি, কিংবা অপরিচিত কোনও একটা লোক এসে তাঁর সঙ্গে দু-চারটে কথাবার্তা বলে গেল। ব্যস, অতঃপর আর দেখতে হবে না। ভদ্রলোক ততক্ষণে রহস্যের জটিল জালে জড়িয়ে গেছেন। এখন কথা হলো এই, কী করে এসব করা হয়? সেই কথাই বলছি। স্টাফেরই কোনও লোককে দিয়ে আমরা একটা রোমাঞ্চকর গল্প লিখিয়ে নিই। প্রসিদ্ধ জনকতক লেখক এখন আমাদের স্টাফে রয়েছেন। এ-কাজে তাঁদের আমরা বেতন দিয়ে নিযুক্ত করেছি, পাশের ঘরে তারা গল্প লিখছেন বসে বসে। মেজর ব্রাউন, যে রহস্যময় গল্পের মধ্যে আপনি জড়িয়ে গিয়েছিলেন সেটা লিখেছেন মিঃ গ্রীগ্‌স্‌বাঁ। ওঃ, অদ্ভুত গল্প! আপনার দুর্ভাগ্য, গল্পের শেষটা আপনি দেখতে পেলেন না। কোথায় যে আমাদের ভুল হয়েছে, আশা করি এর পর আর তা বুঝিয়ে বলতে হবে না। যে-বাড়িতে আপনি এখন আছেন, আগে সেখানে থাকতেন মিঃ গার্নি-ব্রাউন। তিনি আমাদের এই এজেন্সীর একজন সদস্য। মিঃ গার্নি-ব্রাউন যে বাসা বদল করেছেন, আমাদের এখানকার ক্লার্করা আর সেটা খেয়াল করেননি। তাঁরা ভেবেছেন, মিঃ গার্নি-ব্রাউন আর মেজর ব্রাউন একই ব্যক্তি। পরিণামে,

মিঃ গার্নি-ব্রাউনের অ্যাডভেঞ্চারের জালে তাঁরা এখন আপনাকেই জড়িয়ে দিয়েছেন।"

রুপার্ট গ্র্যান্ট চোখ গোল করে সব শুনছিল। বোঝা গেল, ছোকরা বেশ বিমোহিত হয়েছে। সে শুধোল, "কিন্তু, ব্যবসা চলে কি করে? কত আর আপনাদের খদ্দের হবে?"

উৎসাহভরে মিঃ নর্টহোভার বললেন, "নেহাৎ কম নয়। আর তা ছাড়া শুধু ব্যবসা করাই তো আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা একটা মহৎ কাজ করছি। অনেকদিন ধরেই আমাদের মনে হচ্ছিল, এ যুগের জীবন ক্রমশই পানসে হয়ে পড়ছে। বাস্তব জীবনে এতটুকু রোমান্স নেই, তার জন্যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে হবে। এর থেকে দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে। মানুষ চায় কল্পলোকের অ্যাডভেঞ্চারের নায়ক হতে, তার জন্যে বিদ্ঘুটে সব বই পড়ে তাকে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হবে। মানুষ চায় যুদ্ধক্ষেত্রের উন্মাদনার আস্বাদ, সে আস্বাদ তাকে ওই বইয়ের মধ্যে থেকেই পেতে হবে। মানুষ চায় স্বপ্নলোকে যেতে, সে চায় বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করবার সম্মান,—সেখানেও ওই বই-ই তার একমাত্র আশ্রয়। বই-এর শৃঙ্খল থেকে তাকে আমরা মুক্তি দিয়েছি, তাকে আমরা তার প্রত্যক্ষ রক্তমাংসের জীবনেই অ্যাডভেঞ্চার আর রোমান্সের নায়ক হবার সুযোগ দিয়েছি। সেই সঙ্গে যাতে তার দৈহিক ব্যায়ামও খানিকটা হয় সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি রয়েছে। এমন সব ঘটনার মধ্যে তাকে আমরা জড়িয়ে দিই যাতে বিপদের মুখে পড়ে তাকে দেওয়াল টপকাতে হয়, অচেনা মানুষের সঙ্গে লড়াই করতে হয়, গুণ্ডার তাড়া খেয়ে প্রাণভয়ে দৌড়তে হয়। এতে তার ব্যায়াম হয় বেশ খানিকটা, তাতে তার স্বাস্থ্য ভাল হবে। সেই সঙ্গে রবিনহুড কিংবা মধ্যযুগীয় নাইটদের বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চারের সমারোহে পরিপূর্ণ এক আশ্চর্য জগতের দুয়ারও তার চোখের সামনে খুলে গেল, শুধুমাত্র বই পড়ে যার ঐশ্বর্য সে কল্পনাও করতে পারত না। তাকে আমরা তার শৈশবের সোনালী পৃথিবীতে ফিরিয়ে নিয়ে যাই, অফুরন্ত আনন্দ আর স্বপ্নের শৈশব।"

বেসিল তাঁর দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ব্যাপারটা যে শেষ পর্যন্ত এভাবে গড়াবে তা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি। বেসিলের চোখের দিকে চাইলাম। সে চোখ উন্মাদনায় জ্বলজ্বল করছে।

মেজর ব্রাউন নিখুঁত ভদ্রলোক, ব্যাপারটাকে তিনি প্রসন্ন মনেই গ্রহণ করলেন।

"সত্যি বলতে কি, বেশ জটিল জালই বটে!" মেজর বললেন, "চমৎকার আপনাদের পরিকল্পনা। তবে হ্যাঁ, আমার কথা আলাদা—" বলে একমুহূর্ত থেমে স্বপ্নাতুর চোখে তিনি বাইরের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, "যে-কথা বলছিলাম, হ্যাঁ, আমার কথা আলাদা। অ্যাডভেঞ্চারে আর আমার রুচি নেই। জীবনকে আমি বেশ ভালভাবেই দেখেছি কিনা, তাই একথা বলতে পারছি। অজস্র রক্তপাত, আর আর্তনাদ। ওঃ, বীভৎস। আর আমার তাতে আগ্রহ নেই। এখন আমার একমাত্র সাধ—ছোট্ট একখানা বাড়ী আর নির্দোষ কোনও নেশা। বাইবেল তো আপনি পড়েছেন, মনে নেই সেই অপূর্ব কথাটা,—সেই যে, 'দেয়ার রিমেনেথ্ এ রেস্ট্'?"

মিঃ নর্টহোভার মাথা নোয়ালেন। খানিকক্ষণ বাদে বললেন, "মেজরের তো আগ্রহ নেই দেখছি, আপনাদের কারুর আছে? যদি থাকে, আমার এই কার্ডখানা রেখে দিন। যখনি অ্যাডভেঞ্চার কিংবা রোমান্সের শখ্ জাগবে—দয়া করে শুধু একবার খবর দেবেন—"

মেজর ব্রাউন বললেন, "অ্যাডভেঞ্চারের শখ আমার নেই, স্বীকার করছি। তা সত্ত্বেও আপনার একখানা কার্ড আমাকে দিন। চেয়ারখানা ভেঙেছি, তার দামটা অন্তত পাঠিয়ে দেব।"

মিঃ নর্টহোভার তাঁর হাতে একখানা কার্ড তুলে দিলেন।

কার্ডে লেখা রয়েছে, "পি জি নর্টহোভার, বি-এ, আ-জী-স, অ্যাডভেঞ্চার অ্যাণ্ড রোমান্স এজেন্সী, ১৪ ট্যানার্স কোর্ট, ফ্লীট্ স্ট্রীট।"

মেজরের পেছন থেকে মাথা বাড়িয়ে রুপার্ট জিজ্ঞেস করল, "মিঃ নর্টহোভার, নামের পেছনে লেখা এই 'আ-জী-স'টা আবার কি?"

নর্টহোভার যেন বিস্মিত হলেন, "সে কি, আজব জীবিকা সঙ্ঘের কথা আপনারা শোনেননি? ওটা হচ্ছে তারই সংক্ষিপ্ত নাম।"

বিমূঢ় বিস্ময়ে মেজর বললেন, "বহু বিচিত্র জিনিসই আমাদের অজ্ঞাত রয়ে গেছে দেখছি। সে যাই হোক, আজব জীবিকা সঙ্ঘটা আবার কি?"

"এটা একটা নতুন ধরণের প্রতিষ্ঠান। এর যাঁরা সদস্য তাঁরা প্রত্যেকেই একটা-না-একটা সম্পূর্ণ নতুন ধরণের জীবিকা উদ্ভাবন করেছেন। আমি নিজে এর একজন প্রাচীনতম সদস্য।"

স্মিতহাস্যে বেসিল বলল, "যা দেখছি, তা আপনি হতেই পারেন।" বলে সে তার শাদা টুপিটা নিয়ে বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

তারা চলে গেল। মিঃ নর্টহোভার আগুনের চুল্লীটা নিবিয়ে দিলেন, ভেন্টটা তালাবন্ধ করলেন; তাঁর মুখে একটা বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছে। বললেন, "মেজরকে দেখে অবাক হতে হয়; বড়ো ভাল মানুষ। এমন লোক কিনা শেষকালে গ্রীগস্‌বীর গল্পে জড়িয়ে গেল।" সশব্দে তিনি হেসে উঠলেন।

হাসির রেশ তখনো মিলিয়ে যায়নি, দরজায় আবার ধাক্কা পড়ল হঠাৎ। দেখলাম, দরজা ফাঁক করে মেজর তাঁর গুম্ফসমেত ছোট্ট মাথাটি ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেন। মনে হলো, কি যেন জিজ্ঞেস করবেন।

বিস্মিত হয়ে নর্টহোভার বললেন "কি ব্যাপার মেজর? আবার ফিরে এলেন যে?"

ঘরে ঢুকে মেজর বললেন, "একটা ব্যাপার হয়েছে। মনে হয়, কী যেন একটা ওলটপালট হয়ে গেছে আমার মধ্যে। আশ্চর্য অনুভূতি। আগে কখনো হয়নি। শেষটা আমাকে জানতে হবে। নইলে শান্তি পাচ্ছি না।"

"শেষটা মানে?"

মেজর বললেন, "হ্যাঁ, শেষটা। সবটা। ওসব কথার মানে কি? ওই 'খেঁকশিয়ালী', 'দলিলপত্র', তারপর ওই 'মেজর ব্রাউনকে হত্যা কর'? কী মানে ওদের?"

মিঃ নর্টহোভার হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন, তবে তাঁর চোখে তখনও কৌতুকের ছটা লেগে রয়েছে।

গম্ভীরমুখে তিনি বললেন, "মেজর, আমি অত্যন্তই দুঃখিত। আপনার কৌতূহল মেটাতে পারলে আমি অত্যন্তই খুশী হতাম; তবে তার উপায় নেই। এজেন্সীর নিয়মকানুন বড়ো কঠিন। অ্যাডভেঞ্চারগুলোকে যতদূর সম্ভব গোপন রাখা হয়। আপনি বাইরের লোক, আপনার কাছে এসব খুলে বলবার উপায় নেই! আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন—"

ব্রাউন বললেন, "ঠিক আছে। নিয়ম-শৃঙ্খলা জিনিসটাকে আমি নিজেও খুব সম্মান করে চলি। যা হোক, আপনাকে ধন্যবাদ। শুভরাত্রি।"

মেজর ব্রাউন বিদায় নিলেন।

* * *

মিস্ জেমসনের কথা পাঠকদের মনে আছে আশা করি। হ্যাঁ, সেই স্বর্ণকেশী মহিলার কথাই বলছি। সেই যিনি সবুজ পোষাক পরে জানালার ধারে বসেছিলেন। মেজর ব্রাউন এর কিছুদিন পরেই তাঁকে বিবাহ করলেন। তিনি একজন অভিনেত্রী, আরো অনেকের মতই রোমান্স এজেন্সীর চাকরী নিয়েছিলেন। মেজরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ নিয়ে বেশ খানিকটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। কেন মিস্ জেমসন এই প্রৌঢ় ভদ্রলোককে বিবাহ করলেন—কেউ এমন প্রশ্ন তুললেই তিনি বলতেন,—মেজরের সাহসের জন্যে। নর্টহোভারের ফাঁদে পড়বার পর অনেকেই অবশ্য যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দিয়েছে, তাই বলে কয়লা-কুঠুরির মধ্যে নেমে একটা খুনে-গুণ্ডার সম্মুখীন হওয়া! মেজর তো অন্তত তাকে খুনে-গুণ্ডা বলেই জানতেন। তা সত্ত্বেও মেজর পেছপা হননি।

মেজর ব্রাউন এবং তাঁর স্ত্রী এখন পরম সুখে দিন কাটাচ্ছেন। মেজরের জীবনে একটি মাত্র পরিবর্তন এসেছে সম্প্রতি, তিনি ধূমপান শুরু করেছেন। না, না, আরও একটা পরিবর্তন এসেছে। মাঝে মাঝে হঠাৎ যেন তিনি কেমন উন্মনা হয়ে যান। তাঁর চোখে তখন একটা বিমূঢ় দৃষ্টি ফুটে ওঠে। তাঁর স্ত্রী সবই বুঝতে পারেন। বুঝতে পারেন যে, দলিলপত্রই বা কী, আর কেনই বা

তাঁকে বেঁকিনিয়ামের রাজ করতে বারণ করা হয়েছিল, মেজর এখন সেই চিন্তাতেই মগ্ন। তবে, আগেই বলেছি, মেজর ব্রাউন অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ পুরুষ ; এখনো তিনি বিশ্বাস করেন,মরজীবনে যে রহস্য তিনি বুঝতে পারলেন না, পরজীবনে নিশ্চয়ই তার মর্ম উদ্ঘাটিত হবে।

দ্বিতীয় পর্ব : প্রতিভার অপমৃত্যু

বেসিল গ্র্যান্ট এবং আমার মধ্যে একদিন কথা হচ্ছিল। কোথায় হচ্ছিল, জিজ্ঞেস করছেন ? কথাবার্তা বলবার যেটা সেরা জায়গা সেইখানে। অর্থাৎ একটি প্রায়নির্জন ট্র্যামগাড়ির দোতলায়। গালগল্প করবার পক্ষে, আমার মতে, আদর্শ জায়গা হলো পর্বতশিখর। সে হিসেবে ট্র্যামের দোতলা আরও ভালো। কেননা, একে এটা পর্বততুল্য, তায় চলমান।

চলন্ত পর্বতে বসে আমরা কথাবার্তা বলছি। লণ্ডনের এটা উত্তরাঞ্চল, চৃদিকের সব দৃশ্যাবলী যেন ছিটকে ছিটকে পিছিয়ে পড়ছে। জায়গাটা যে কতো বিরাট, এবং কী জঘন্য, এই প্রথম তা অনুভব করতে পারলাম। জঘন্য, সেই সঙ্গে অপরিসীম ; কুশ্রী, সেই সঙ্গে অফুরন্ত। লণ্ডনের দরিদ্র অঞ্চলগুলি এই সর্বপ্রথম তার ভয়াবহ নগ্নতা নিয়ে আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠল। এই যে তার ভয়াবহ রূপ, হুজুগে-সাহিত্যিকরা কি কখনো একে অনুভব করতে পেরেছেন ? না বোধ হয়। তাঁরা শুধু এর গলিঘুঁজি, ঝিঞ্জি ঘরবাড়ি, খুনে গুণ্ডা আর উন্মাদ, আর পাপের আড্ডাগুলিকেই দেখেছেন,—দেখিয়েছেন। অথচ ব্যাপারটা ঠিক তা নয়। এই গলিঘুঁজি, আর এই পাপের আস্তানা,—এখানে কেউ সভ্যতা আশা করে না, শৃঙ্খলা আশা করে না। মজা এই যে, এখানে সভ্যতাও বর্তমান, শৃঙ্খলাও। সভ্যতা এখানে এক আত্মঘাতী ক্লান্তিতে এসে পর্যবসিত হয়েছে, শৃঙ্খলা পর্যবসিত হয়েছে একটা একঘেঁয়ে বিরক্তিতে। গুণ্ডাপাড়া দিয়ে পথ হাঁটবার সময় কেউ সেখানে

বর্বরমূর্তি কিংবা গীর্জা নেই বলে বিস্ময়প্রকাশ করে না। এখানে কিন্তু তার সবকিছুই রয়েছে। বড়ো বড়ো সব সরকারী দালান রয়েছে; তবে তার অধিকাংশই উন্মাদ-আশ্রম, এই যা। বর্বরমূর্তিও রয়েছে; তবে সেগুলি রেলওয়ে ইঞ্জিনীয়ারদের, আর নয়তো বিশ্বপ্রেমিকদের। কার্যত এঁরা একই শ্রেণীভুক্ত; এই রেল-ইঞ্জিনীয়ার এবং এই বিশ্বপ্রেমিক—এঁদের মধ্যে এক যোগসূত্র বর্তমান। কেউই এঁরা মানুষকে ভালোবাসেননি, মানুষদের এঁরা ঘৃণাই করেছেন। গীর্জাও রয়েছে। বড়ো বড়ো সব রাস্তা রয়েছে, জনাকীর্ণ সব চৌমাথা, ট্র্যামলাইন আর হাসপাতাল—এককথায় সভ্যতার সমস্ত অবদানই এখানে উপস্থিত। আর-আর কত কী যে এখানে আছে আমরা জানি না; শুধু জানি, একটা জিনিস নেই। প্রকৃত বড়, প্রকৃত মহৎ—মানুষ যাকে শ্রদ্ধা করে—এমন কোনও কিছুই নেই। সবকিছু মিলিয়ে একটা অসহ্য পরিবেশ; টেমস্-এর তীরের সেই সত্যিকারের কানাগলি, সত্যিকারের গলিঘুঁজি, সত্যিকারের বস্তিপাড়া,—সে-ও যেন এর থেকে অনেক ভাল। সেখানে, আর কিছু না হোক, হঠাৎ কোনও এক আচম্‌কা-চৌমাথায় রোম্-এর গীর্জার বিরাট ক্রুশখানা অন্ততঃ চোখে পড়তে পারে।

বেসিল গ্র্যান্টকে আমি সেই কথাই বোঝাচ্ছিলাম।

বেসিল তার স্বভাবসিদ্ধ নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, "বুঝলাম বন্ধু। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও তোমার মনে রাখা দরকার যে, এই বিকলাঙ্গ শৃঙ্খলার নাগপাশে বাঁধা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অসহ্য দৈন্যই মানবাত্মার চূড়ান্ত জয়ের সাক্ষ্যবহন করছে। তোমার বক্তব্য আমি মেনে নিচ্ছি। স্বীকার করে নিচ্ছি যে, এ-জীবন আরণ্য বর্বরতার চেয়েও কদর্য, এ-সভ্যতা অসভ্যতারই নামান্তর। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দাই মূলত সৎ। চূড়ান্ত দুর্বিপাকের মধ্যেও সততাকে এরা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। এটা যে একটা কতবড় দুঃসাধ্য কাজ তা আর তোমাকে বুঝিয়ে বলবার দরকার নেই। আর তা ছাড়া—"

"বলে যাও—" আমি বললাম।

উত্তর এল না।

"থামলে কেন, বলে যাও—" বলে আমি মুখ তুলে চাইলাম। দেখি বেসিলের

বড় বড় নীলাভ চক্ষু দুটি যেন বিস্ময়ে ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে। আমার প্রতি তার লক্ষ্য নেই, টাঙ্গের থেকে ঝুঁকে পড়ে জানলা দিয়ে সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, "কি হয়েছে? অতো দেখছ কি ওখানে?" বলে আমি নিজেও রাস্তার দিকে তাকালাম।

গম্ভীর গলায় বেসিল বলল, "বড়োই অদ্ভুত ব্যাপার। আমার আশাবাদ বোধ হয় টি‍ঁকল না। এইমাত্তর তোমাকে বলছিলাম, এখানকার সমস্ত লোকই সৎ। বলছিলাম না? সে বিশ্বাস আমার ভেঙে গেল। ঐ-যে লোকটিকে দেখছ, ওরকম নচ্ছার লোক আর এদেশে দুটি আছে কিনা সন্দেহ।"

আরো খানিকটা ঝুঁকে পড়ে আমি বললাম, "কোথায় বেসিল? কার কথা বলছ?"

"নাঃ, যা বলেছি ঠিকই বলেছি।" বেসিল আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পুনশ্চ তার সেই তন্দ্রাচ্ছন্ন গলায় বলে যেতে লাগল, "ঠিকই বলেছি আমি, এখানকার সমস্ত মানুষই সৎ। এরা সাধু, মহাপুরুষ। মাঝে মাঝে অবিশ্যি চুরিচামারি করে, বউ ঠ্যাঙায়। তা হোক, তবু এরা মহৎ। ঐ যে লোকটাকে দেখছ, অন্তত ওর তুলনায় ওদের দেবদূত বললেও অত্যুক্তি হয় না।"

বেসিলের একটা মারাত্মক দোষ, পষ্টাপষ্টি কথা বলতে জানে না। ওর এই হেঁয়ালিতে আমি চটে গেলাম। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম, "কোন লোক? কার কথা বলছ?" তারপরেই তাকে দেখতে পেলাম আমি, বেসিলের দৃষ্টি অনুসরণ করে তার ওপর আমার নজর গিয়ে পড়ল।

পাতলামত ছিমছাম এক ভদ্রলোক। ত্রস্ত জনতা, তার মধ্যে তিনি দ্রুততর পদক্ষেপে সামনে এগিয়ে চলেছেন। চেহারার মধ্যে চমকপ্রদ কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, তবে একবার যদি তাঁর দিকে দৃষ্টি গিয়ে পড়ে, তো সে-দৃষ্টিকে চট্‌ করে ফিরিয়ে নেওয়াও যায় না। মাথায় কালো রঙের টুপি, কারুকার্য-করা। চুলের রঙ্‌ শাদা, তবে কায়দা করে' তাতে ঢেউ তোলা হয়েছে; শাদায়-রূপালিতে মিশিয়ে বেশ একটা বাহার খুলেছে তাতে। মুখখানা গোলমতন,—একটু যেন প্রাচ্যদেশীয় আদল আসে। গোঁফজোড়া তীক্ষ্ণ। সযত্নলালিত।

"বেচারার অপরাধটা কি?" বেসিলকে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"হলফ. করে বলতে পারব না—" বেসিল উত্তর দিল, "তবে আর-পাঁচজনের ক্ষতি করাই এর একমাত্র কাজ। তার জন্যে যাচ্ছেতাই সব চক্রান্ত করতেও লোকটা পেছপা নয়। আপাতত কারুর সর্বনাশ করতে চলেছে।"

"কিসের সর্বনাশ বেসিল? অতো হেঁয়ালি করছ কেন? সবই যখন জানো, তখন খুলে বলছ না কেন ব্যাপারটা? কী অপরাধ করেছেন ইনি? নাম কি এঁর?"

কয়েক মুহূর্তের জন্যে বেসিল আমার দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, "তুমি বুঝতে ভুল করেছ। নামধাম আমার জানা নেই। সত্যি বলতে কি, এর আগে আর একে আমি দেখিইনি কখনো।"

"এর আগে আর দেখোইনি!" রাগে আমি ফেটে পড়লাম, "তাহলে অযথা কেন বদনাম রটাচ্ছ? কেন বলছ যে, এঁর মত নচ্ছার লোক আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ?"

বেসিল শান্তস্বরে বললো, "ঠিকই বলেছি। চেহারা দেখছনা লোকটার? হতভাগা এতই পাজী যে, যে-মুহূর্তে ওকে আমি দেখলাম, সঙ্গে সঙ্গেই যেন আর-সবাইকে আমার সাধুপুরুষ বলে মনে হলো। বাদবাকী লোকগুলির দিকে চেয়ে ভাখো; কাউকেই তোমার গুণ্ডা বলে মনে হবে না। অথচ ঐ লোকটার দিকে তাকাও; মনে হবে, যেন একটা মুখোস এঁটে নিজের আসল চেহারাটাকে চাপা দিয়ে বেড়াচ্ছে। ঐ যে বস্তিগুলো দেখছো, কারা ওখানে থাকে? পকেটমার, গুণ্ডা এইসব তো? নেহাৎই উপায় নেই, তাই এরা সব অসৎ কাজে নেমেছে। মনেপ্রাণে কিন্তু সৎ হবার চেষ্টা ছাড়েনি। এ-লোকটার কিন্তু উদ্দেশ্যই আলাদা, অসৎ হওয়াটাই এর একমাত্র লক্ষ্য।"

"তুমি তো এঁকে আগে কখনো দেখোইনি, তাই না? সেক্ষেত্রে—"

উত্তরে এমন জোরে চেঁচিয়ে উঠল বেসিল যে ড্রাইভার পর্যন্ত চমকে গেল। "হা ঈশ্বর, সেইটেই কি বড়ো হলো? ভাখো ভাখো, লোকটার মুখখানাকে একবার ভাখো। ওই যে ওর ভ্রূভঙ্গী দেখছ, কী ফুটে উঠেছে ওখানে? অন্ধ অহঙ্কার। ওই অহঙ্কারেই শয়তান একদিন স্বর্গকেও বিদ্রূপ করেছিল। লোকটার গোঁফের দিকে তাকাও; পাকানো ওই গোঁফজোড়া যেন আর পাঁচজনের গায়ে

ব্যক্তের বিষ ঢেলে দেবার জন্তেই ফণা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেইখানেই শেষ নয়; চুলের বাহারটাকেও ভাখো ওর, টুপিটাকেও ভাখো।"

বেসিলের এবম্প্রকার বিচিত্র বিশ্লেষণ দেখে আমি একটু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। বললাম, "আরে দূর, চেহারা দেখে কখনো মানুষ চেনা যায়? উনি যে বদ্‌লোক তার প্রমাণ কোথায়? এই তুমি ওঁকে প্রথম দেখছ, তা সত্বেও—"

"প্রমাণ! প্রমাণ!!" ক্ষুব্ধকণ্ঠে বেসিল ব'লে উঠল, "প্রমাণটাকেই কি তুমি বড় ক'রে ভাখো? এতই কি তুমি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন? এতই কি তুমি অর্বাচীন? প্রথম দর্শনেই যে একটা ধারণা গড়ে ওঠে সেটা কি তাহলে কিছুই নয়?"

"না," আমি বললাম, "প্রমাণ জিনিসটা তার থেকে অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য।"

বেসিল বলল, "মূর্খ! প্রথম দর্শনে গড়ে ওঠা ধারণার ওপরেই আজ সারা জগৎ চলছে। তার থেকে বেশী নির্ভরযোগ্য আর অন্য কিছুই নয়। প্রমাণের কথা বলছিলে, ওটা হলো পুঁথিপত্রের ব্যাপার। ওর ওপরে নির্ভর করে দৈনন্দিন কাজ চলে না। তার জন্ত আমাদের ঐ ধারণা এবং পরিবেশের ওপরেই নির্ভর করতে হয়। ব্যাপারটা তোমাকে ভালো করে বোঝাই। ধরো, তুমি তোমার অফিসে একজন কেরাণী রাখবে। অনেকে তার জন্তে ইণ্টারভিয় দিতে এসেছে। এখন তার মধ্যে থেকে সেরা লোকটিকে বাছাই করে নেওয়া চাই, কেমন না? তা বাপু, কি ভাবে তুমি যোগ্যতম ব্যক্তিটিকে চিনে নেবে? মাথার খুলি মেপে, না দৈহিক যোগ্যতার একটা তুলনামূলক হিসেব নিয়ে? এইসবই হলো তার শ্রেষ্ঠত্বের সবচাইতে বড়ো প্রমাণ। তাই বলে কাজের বেলায় কি তুমি সে-প্রমাণের ওপর নির্ভর করতে যাও? বিন্দুমাত্রও না। প্রথম দর্শনে তোমার মনে যে একটা বদ্ধমূল ধারণা গড়ে ওঠে, তার ওপর নির্ভর করেই তুমি তোমার পছন্দমতো লোকটিকে বেছে নাও। সে-প্রত্যয়ের আর নড়চড় হয় না। আমিও সেই একই প্রত্যয়ের বশবর্ত্তী হয়ে বলছি যে, ঐ যে লোকটা রাস্তা দিয়ে হাঁটছে—ও একটা অতিশয় নচ্ছার বদমাস্।"

"কথায় তোমার সঙ্গে এঁটে উঠবার উপায় নেই," আমি বললাম, "তাই বলে তোমার কথাটাই যে সত্যি তা-ই বা কেমন করে বুঝি?"

বেসিল লাফিয়ে উঠল, ট্র্যামের দরজার দিকে দৌড়ল সে।

"বেশ তো, বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা হয়ে যাক্। চলো, লোকটার পিছু নিই। আমার ধারণা যদি মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়, তোমার কাছে পাঁচ পাউণ্ড বাজী হারব।"

লাফিয়ে আমরা ট্রাম থেকে নামলাম, রাস্তায় নেমে ভদ্রলোকের পিছু নিলাম।

দ্রুতপায়ে তিনি পথ হাঁটছেন; ফ্রককোটের পিছনদিকটা বাতাসে উড়ছে। এইভাবেই কিছুক্ষণ কাটল। তারপর তিনি হঠাৎ মোড় ফিরলেন, আলোকোজ্জ্বল বড়রাস্তা ছেড়ে পাশের একটা অন্ধকার গলিতে ঢুকে পড়লেন। নিঃশব্দে আমরা তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

আমি বললাম, "ব্যাপারটা একটু অদ্ভুত লাগছে। এমন লোকের পক্ষে এ রাস্তায় ঢোকাটা যেন ঠিক স্বাভাবিক নয়।"

"'এমন লোক' মানে?" বেসিল শুধোল।

আমি বললাম, "মানে এমন ফিটফাট লোক। ভদ্রলোকের চেহারা দেখে মনে হয় বেশ ফ্যাশনদুরস্ত, জুতোজোড়াও বেশ চকচকে। সত্যি বলতে কি, এ-ধরণের লোককে আমি এপাড়ায় আশাই করিনি।"

বেসিল বলল, "বুঝেছি।" তারপর সে চুপ করে রইল।

এবং আমরা হাঁটতেই লাগলাম। খানিক সামনে সেই ভদ্রলোকও হাঁটছেন। ছিমছাম মসৃণ চেহারা। কেমন যেন মনে হয়, একটা মসৃণ কালোহাঁস যেন নিস্তব্ধ অন্ধকারে সাঁতরে চলেছে। মাঝে মাঝে গ্যাসলাইটের আভা এসে পড়ছে তাঁর গায়ে, তারপরেই আবার তিনি অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছেন। গ্যাসপোস্টগুলো বেশ দূরে দূরে, মাঝখানে অনেকখানি করে ফাঁক। শহরে গাঢ় কুয়াশা। রাস্তার যেটুকু অংশ অন্ধকার সেখানে আমরা গতিবেগ বাড়িয়ে দিচ্ছি।

বেসিল যেন হঠাৎ লাগামটানা ঘোড়ার মত থমকে থামল। আমিও থেমে দাঁড়ালাম। দেখি, ভদ্রলোকের একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়েছি। সামনেই তাঁর কৃষ্ণ মূর্তি। অন্ধকারে তিনি একেবারে মিশে গেছেন।

প্রথমে ভেবেছিলাম, ভদ্রলোক বোধহয় আমাদের দেখেই থেমে দাঁড়িয়েছেন।

পরে আমার ভুল বুঝলাম। এত কাছাকাছি থাকা সত্ত্বেও আমাদের তিনি লক্ষ্যই করেন নি। সেই অন্ধকার ঘিঞ্জি গলির একটা নিচু নোংরা দরজার গায়ে তিনি আঙুল দিয়ে টোকা দিলেন। চারবার। ধীরে ধীরে খুলে গেল দরজাটা, ভিতর থেকে একটা তীক্ষ্ণ আলোর রশ্মি এসে বাইরের অন্ধকারে বিদ্ধ হলো। ভেতরে-বাইরে কী যেন একটা কথাবার্তা চলল, আমরা সেটা শুনবার চেষ্টা করলাম। তবে এতই টুকরো-টুকরো কথা যে তার কিছুই আমাদের বোধগম্য হলো না। ভদ্রলোক দেখলাম ভিতরের দিকে এক টুকরো কাগজ এগিয়ে দিলেন, তারপর বললেন, "হ্যাঁ এক্ষুণি। চট্ করে একটা গাড়ী ডেকে নাও।"

চাপা গলায় ভিতর থেকে কে যেন বলল, "বেশ, তাই হবে।"

ভদ্রলোক আর দাঁড়ালেন না, আবার পথ হাঁটতে শুরু করলেন।

আমরাও সেই অন্ধকারে পুনশ্চ তাঁর পিছু নিলাম, বলাই বাহুল্য। একটার পর একটা গলি আমরা পার হয়ে যাচ্ছি, গলিতে গলিতে একটা দুর্ভেদ্যর গোলক-ধাঁধা। আর সে-কী শীত, সে-কী কুয়াশা। মাত্র পাঁচটা বাজে, এরই মধ্যে যেন লণ্ডনের এই নোংরা পল্লীতে মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে।

আমরা হাঁটতেই লাগলাম।

কতক্ষণ আর হাঁটা যায়। সারা মন বিরক্তিতে ভরে উঠল। বেসিলকে বললাম, "বাপু হে, ভদ্রলোক তো বড়োই চিন্তায় ফেললেন। কতক্ষণ আর এঁর পিছু পিছু হাঁটতে হবে আমাদের? কোথায় চলেছেন ইনি?"

বেসিল বলল, "সে কি ছাই আমিই জানি! তবে মালুম হচ্ছে, আর কিছুক্ষণ হাঁটলে আমরা বার্কলী স্কোয়্যারে গিয়ে পড়বো।"

চলতে চলতেই সেই গাঢ় কুয়াশার মধ্যেও আমি জায়গাটাকে চিনবার চেষ্টা করলাম। মিনিট দশেক কিছুই ঠাহর হলো না। পরে বুঝলাম, বেসিল ঠিকই বলেছে। লণ্ডনের সেই নিরানন্দ ফ্যাশনপল্লীর দিকেই আমরা চলেছি। দরিদ্রপল্লীতেও অবশ্য আনন্দ নেই, তবে ফ্যাশনপল্লী যেন আরও নিষ্প্রাণ। আমার তো অন্তত তাই মনে হয়। আশাকরি আর-পাঁচজনেও একথা স্বীকার করবেন।

বার্ক্‌লী স্কোয়্যারে গিয়ে পৌঁছুলাম আমরা। বেসিল গ্র্যান্ট বলল, "এ-তো বড়ো অস্বাভাবিক ব্যাপার!"

"কী আবার অস্বাভাবিক বেসিল? তোমার তো ধারণা এইটেই স্বাভাবিক!"

বেসিল বলল, "লোকটা প্রথমে নোংরা গলিতে ঢুকেছিল, তাতে আমি অবাক হইনি। পরে সে ভদ্রপাড়া বার্ক্‌লী স্কোয়্যারে এল, তাতেও আমি অবাক হইনি। তবে, যাঁর বাড়িতে সে এখন যাচ্ছে তিনি অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি। সেইটেই আমার বিচিত্র লাগছে।"

"কে সজ্জন ব্যক্তি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

উত্তরে সে আবার তার হেঁয়ালী সুরু করল, "সময়ে সবই বদলায়। আমি এককালে জজ-এর চাকরী করেছি, এখন আর করি না। কিন্তু তাই বলে কেউ যদি বলে যে, সে-দিনের কথা আমি সবই বিস্মৃত হয়েছি তো সেইটেই কি ঠিক কথা হবে? হবে না। সবই আমার মনে আছে, অনেক দিন আগে-পড়া একখানা উপন্যাসের মতই সে-জীবন এখনো আমার মনে পড়ে যায়। অনেক দিনই বা কোথায়। মাত্তর পনের বছর। লর্ড রোজবেরি আজ এই বার্ক্‌লী স্কোয়্যারকে যতখানি চেনেন, পনের বছর আগে আমিও এ পাড়াকে তার থেকে কিছু কম চিনতাম না। যে-বাড়িতে গিয়ে পাজিটা উঠেছে সে বাড়িও আমি চিনি। ও বাড়ি ব্যুমন্ট-এর।"

বিরক্ত হয়ে আমি শুধোলাম, "ব্যুমন্ট আবার কে?"

"অতিশয় সজ্জন ব্যক্তি। কেন, ফল্লউডের লর্ড ব্যুমন্ট-এর নাম তুমি শোননি? খাঁটি ভদ্রলোক, অতিশয় অমায়িক ব্যবহার। সোস্তালিস্ট, অ্যানার্কিস্ট ইত্যাদি যতোরকমের সমাজসেবী আছে তাদের কারুর থেকেই লর্ড ব্যুমন্ট কিছু কম যান না। একজন বিশ্বপ্রেমিক দার্শনিক। তবে হ্যাঁ, অস্বীকার করে লাভ নেই, একটু খ্যাপাটে। অতিরিক্ত প্রগতিবাদী হওয়ারই পরিণাম আর কি। কী যে একটা উপসর্গ হয়েছে, যা-কিছুই উদ্ভট—তাকেই তিনি প্রগতির চিহ্ন বলে ধরে নেবেন। তুমি যদি গিয়ে বলো, মানুষ মরলে আর তাকে কবর দিয়ে লাভ কি, তার চেয়ে মরা-মানুষদের সব খেয়ে ফেলাই ভালো, এতে করে কবর

সেওলায় পালা বেঁচে যাবে—তো লর্ড ব্যুমণ্ট সে কথা খুশীমনেই মেনে নেবেন। আর যদি বোঝাতে পারো, মরা-মানুষ খেলে স্বাস্থ্য ভাল হয় তবে তো কথাই নেই, লর্ড ব্যুমণ্ট তোমাকে মাথায় তুলে নাচবেন। এগিয়ে চলাটাই তাঁর কাছে সব চাইতে বড় কথা; তা তুমি স্বর্গের দিকে এগোচ্ছ, না নরকের দিকে—তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতে রাজী নন। ফলে যা হবার তা-ই হয়েছে। প্রগতিবাদীদের ভিড় জমেছে তাঁর বাড়িতে। কতো রকমের যে উদ্ভট সব মানুষ, তার আর ইয়ত্তা নেই। কারুর বা বাবরি চুল; লর্ড ব্যুমণ্টকে সে বোঝাচ্ছে, বাবরি না হলে রোমান্স জমে না। কারুর বা ন্যাড়া মাথা; সেও বোঝাচ্ছে, ন্যাড়া হলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। কেউ বা পায়ে হাঁটে; তার যুক্তি—এতে করে হাত দুটোকে বেশ ইচ্ছেমতন কাজে লাগানো যায়। কেউবা শূন্যে পা তুলে দিয়ে হাতের ওপর ভর দিয়ে হাঁটে; সেও বোঝাচ্ছে, এতে করে পা দুটো একটু বিশ্রাম পাবে। এরা অবশ্য মূর্খ; মূর্খতায় লর্ড বুমণ্ট-এর চেয়ে কেউই এরা কম যায় না। তা যাক; মূর্খ হলেও এরা সৎ লোক, লর্ড বুমণ্ট-এর মতোই সৎ। অথচ ওই যে লোকটা ওখানে ঢুকল, ও হচ্ছে অত্যন্তই অসৎ; এই কারণেই আমি একটু অবাক হচ্ছি।"

রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল। ফুটপাথে পা ঠুকে জোর-গলায় আমি বললাম, "ব্যাপারটা আমি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি। আসলে, লর্ড বুমণ্ট-এর নয়, তোমারই মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। পথে একজন নতুন লোক তোমার চোখে পড়েছে, আগে কখনো তাঁকে তুমি দেখোইনি। তা সত্ত্বেও তাঁর চেহারা নিয়ে তুমি গবেষণা শুরু করে দিলে। তারপর, যেহেতু তিনি একজন সজ্জন ব্যক্তির বাড়িতে ঢুকেছেন, অমনিই তুমি ধরে নিলে যে লোকটি নিশ্চয়ই চোরছ্যাচোর গোছের। এ যে তোমার অত্যন্তই অন্যায় ধারণা সে-কথা স্বীকার করে নাও; তারপর লক্ষীছেলের মতো আমার সঙ্গে বাড়ি ফিরে চলো। এখনো অবশ্য সন্ধ্যা কাটে নি, এটা চা-খাওয়ারই সময়। কিন্তু আমাদেরও যে এখান থেকে বেশ খানিকটা দূরে যেতে হবে সেটাও মনে রেখো। আরও যদি দেরি করি তো রাত্তিরের খাওয়াটাও জুটবে না।"

বেসিলের চোখের দিকে তাকালাম; দেখি, গোধূলির ম্লানালোকেও চোখ দুটি তার জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

"ভেবেছিলাম—" বেসিল বলল, "অহংকারকে আমি জয় করতে পেরেছি। সেটা আমার ভুল ধারণা; এখনো আমার অহংকার কাটে নি।"

"কী তুমি করতে চাও?" আমি একেবারে চেঁচিয়ে উঠলাম।

বেসিলও তার কণ্ঠস্বরকে সপ্তমে চড়িয়ে বলল, "কী আর চাই, বাচ্চা মেয়েরা তাদের নতুন ফ্রক পরবার পর যা চায় আমিও ঠিক তা-ই চাই; বাচ্চা ছেলেরা তাদের স্কুলের সদার-পড়ুয়ার সঙ্গে ম্যাচ দেখতে গিয়ে যা চায় আমিও ঠিক তাই-ই চাই। আমি প্রমাণ করতে চাই যে আমি অতিশয় সজ্জন লোক, কারুর সম্পর্কেই আমার মনে কোনও অন্যায় ধারণা নেই। তোমার মাথায় একটা টুপি রয়েছে একথাও যতখানি সত্যি, ঐ লোকটা যে একটা পাজী বদমাস সে কথাও ঠিক ততখানিই সত্যি। তুমি বলছ, লোকটা যে পাজি এমন কোনও প্রমাণ দেওয়া যাবে না। আমি বলছি, প্রমাণ দেওয়া যাবে। চলো, লর্ড ব্র্যামণ্ট-এর বাড়িতেই যাওয়া যাক। আগেই বলেছি, লর্ড ব্র্যামণ্ট একজন মহদাশয় ব্যক্তি, আলাপ করলে খারাপ লাগবে না।"

"সে কী করে যাওয়া যায়?" সবেমাত্র আমি আমার আপত্তি জানাতে শুরু করেছিলাম, বেসিল আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "খুব যাওয়া যায়। আমরা যে কেতামাফিক সাজগোজ করে বেরোইনি তার জন্যে আমি ক্ষমা চেয়ে নেব।" বলেই সে দ্রুত পদক্ষেপে সেই কুয়াশাচ্ছন্ন পার্কটিকে অতিক্রম করল, লর্ড ব্র্যামণ্ট-এর প্রাসাদোপম অট্টালিকার কালো-পাথরে-বাঁধানো সিঁড়িতে গিয়ে দাঁড়াল, ঘণ্টা বাজাল সাক্ষাৎকারের জন্যে।

ভারগম্ভীর একটি ভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল, পরণে সাদা-কালো উর্দি। মুখে খানিকটা বিস্ময় ফুটে উঠেছিল বুঝি, ভিজিটিং কার্ডে বেসিল গ্র্যান্টের নাম দেখতেই মুহূর্তে তার বিস্ময় এসে সম্ভ্রমে পরিণত হলো। চটপট আমাদের সে বাড়ির ভিতরে নিয়ে চলল, বাড়ির কর্তাও খবর পেয়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোক, চুল সাদা, মুখ উত্তেজনায় লাল। চেহারা দেখে অনুমান করে নিলাম, ইনিই লর্ড ব্র্যামণ্ট।

বেসিলের সঙ্গে করমর্দন করতে করতে আনন্দের আবেগে তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন, "আরে বেসিল, তুমি? তুমি! কদ্দিন পরে তোমাকে দেখলাম! ওঃ ক'বচ্ছর বাদে। কোথায় গিয়েছিলে? কোথায়? খুব দেশ ঘুরছিলে বুঝি?"

স্মিতমুখে বেসিল বলল, "ফিলিপ, তুমি তো জানো বহুদিন আমি জজ-এর চাকরী ছেড়ে দিয়েছি। হৈ চৈ আর ভাল লাগে না, এখন আমার অবসর। তা আমি অসময়ে এসে পড়িনি তো?"

লর্ড ব্যামণ্ট বললেন, "অসময়! সব চাইতে সুসময়ে তুমি এসেছ। আজ এখানে কে এসেছেন জানো?"

শান্ত গলায় বেসিল বলল, "না।" বেসিলের কথা শেষ না হতেই ভিতরের দিক থেকে একটা উচ্চকিত হাস্যরোল আমাদের কানে এসে পৌছুল।

লর্ড ব্যামণ্ট সশ্রদ্ধভাবে বললেন, "বেসিল, আজ এখানে উইমপোল এসেছে।"

"উইমপোল আবার কে?"

লর্ড ব্যামণ্ট বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "সেকি! উইমপোলের নাম শোননি? বেসিল, আর আমার সন্দেহ নেই, নিশ্চয়ই তুমি দেশান্তরী হয়ে গিয়েছিলে। উইমপোলকেও তুমি চেন না? বলি, শেক্‌স্‌পীয়রকে চেনোত?"

আমতা-আমতা করে বেসিল বলল, "তা, হ্যা, শেক্‌স্‌পীয়রকে চিনি বই কি। এইটুকু জানি যে, তিনি বেকন নন। মেরী কুইন অব স্কট্‌স্‌-এরই আরেক নাম বোধ হয় শেক্‌স্‌পীয়র। না কি, ঠিক বললাম তো? তা ভাই, সত্যি বলতে কি, উইমপোলকে আমি সত্যিই চিনি না। কে যে—" কথার শেষটা আর আমরা শুনতে পেলাম না, বাড়ির ভিতর থেকে আবার একটা প্রচণ্ড হাস্যরোল ছুটে এসে তার কণ্ঠস্বরকে ডুবিয়ে দিল।

বিগলিত কণ্ঠে লর্ড ব্যামণ্ট বললেন, "উইমপোল একজন বিরাট কথা-শিল্পী। কথাবার্তা জিনিসটার তিনি একেবারে মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন। কথা-বলা একটা আর্ট, সে তুমি জানো। উইমপোল এই আর্টকে একটা মহৎ আর্টে পরিণত করেছেন। শিল্পের ক্ষেত্রে মাইকেল এঞ্জেলো যা, কথোপকথনের ব্যাপারে

উইমপোলও ঠিক তাই। তর্কোখানিই বড়। ব্যঙ্গবিদ্রূপে প্রতিপক্ষকে তিনি নিমেষে ধরাশায়ী করতে পারেন। উইমপোল যা বলবেন, তার ওপর আর কোনও পাল্টা জবাব নেই। তা একেবারে মোক্ষম, তা একেবারে—"

নেপথ্য থেকে আবার সেই উন্মত্ত হাস্যরোল ভেসে এল, এবং—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—বিস্তুলকলেবর এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ক্রুদ্ধ ভঙ্গীতে ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন।

"আচ্ছা, এবার তাহলে—" কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন লর্ড ব্র্যামণ্ট, তাঁর কথা আর শেষ হলো না, বৃদ্ধ একেবারে ক্রোধে ফেটে পড়লেন :

"শুনে রাখো ব্র্যামণ্ট, আর আমি এই বাঁদরামো বরদাস্ত করতে পারব না। দু'ইকোড় এক সাহিত্যিক এসে যা-খুশি আমাকে বলবে, আর আমি তা চোখকান বুজে শুনে যাবো? যা-খুশি ইয়ারকি করবে আমাকে নিয়ে, আর আমি তাই সহ্য করব? কক্ষণো না। কিছুতেই—"

"আহা হা, অতো চটছ কেন"—লর্ড ব্র্যামণ্ট বললেন, "এসো, এঁদের সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দি। ইনি হলেন মিঃ জাস্টিস্ বেসিল গ্র্যান্ট, আপাতত আর জাস্টিস্ নন, শুধুই মিঃ গ্র্যান্ট। আর বেসিল, স্যার ওয়াল্টার শল্‌মণ্ডেলির নাম তুমি শুনেছ নিশ্চয়ই?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।" বলে মাথা নোয়াল বেসিল, তারপর ঈষৎ কৌতূহলের সঙ্গে স্যার ওয়াল্টারকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। স্যার ওয়াল্টার তখন অত্যন্তই ক্রুদ্ধ, তা সত্ত্বেও সে-ক্রোধ তাঁর চেহারার আভিজাত্যকে গোপন করতে পারেনি। সুদর্শন দীর্ঘাকৃতি পুরুষ, চুল ধপধপে সাদা, দীর্ঘ নাসিকা, মাংসল চিবুকে দু'থাক ভাঁজ পড়েছে। সবকিছু মিলিয়ে বেশ একটা মহামহিম ভঙ্গী। ক্রোধান্ধ হয়েও তিনি আত্মমর্যাদা বজায় রেখেছেন।

"ব্র্যামণ্ট—" রুদ্ধকণ্ঠে স্যার ওয়াল্টার শল্‌মণ্ডেলি বললেন, "এঁদের প্রতি ঠিকমতো সৌজন্য দেখাবার মতো মানসিক অবস্থা এখন আমার নয়, তার জন্যে আমি অত্যন্তই লজ্জিত। শেষকালে তোমার বাড়িতে এসে আমার অসৌজন্য প্রকাশ পেল, এ-লজ্জা আমার জীবনেও যাবে না। না না—তোমার কোনও দোষ নেই, ওই ল্যাংড়া সাহিত্যিকের কসুরিতেই—"

স্যার ওয়াল্টারের বক্তব্য শেষ না হতেই ভিতরের ঘর থেকে একজন সৌম্যদর্শন যুবক বেরিয়ে এলেন। লালচে গোঁফ, মুখ গম্ভীর। দেখে মনে হলো, ভিতরে যে হাস্যপরিহাস চলছে ইনিও তাতে খুব সন্তুষ্ট নন।

বেসিলের দিকে তাকিয়ে লর্ড ব্যুমণ্ট বললেন, "এসো, এঁর সঙ্গেও তোমাকে আলাপ করিয়ে দি। ইনি হচ্ছেন মিঃ ড্রামণ্ড, আমার সেক্রেটারী। ড্রামণ্ডকে তুমি আগেও দেখেছ বেসিল, ওর বয়েস তখন খুবই অল্প। মনে নেই তোমার?"

"খুব মনে আছে।" বেসিল বলল। মিঃ ড্রামণ্ড বেশ সসম্ভ্রম আনন্দে বেসিলের সঙ্গে করমর্দন করলেন, তবে তাঁর মুখের সেই থমথমে ভাবটা কাটল না। স্যার ওয়াল্টার শল্‌মণ্ডেলির দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন, "স্যার ওয়াল্টার, এখনই আপনি চলে যাবেন না যেন। লেডী ব্যুমণ্ট আপনাকে আর-কিছুক্ষণ থেকে যেতে অনুরোধ করেছেন।"

স্যার ওয়াল্টার তখনও রাগে ফুঁসছেন। হয়তো চলেই যেতেন তিনি; লেডী ব্যুমণ্টের আহ্বানে, স্পষ্টই বোঝা গেল, একটু দোটানায় পড়ে গেলেন। ভদ্রতারই জয় হ'ল শেষ পর্যন্ত, আমতা আমতা করে তিনি বললেন, "তা লেডী ব্যুমণ্ট যখন অনুরোধ জানিয়েছেন—," এবং বলতে বলতে মিঃ ড্রামণ্ডের পিছন পিছন তিনি ভিতরের ঘরেই ফিরে গেলেন। আধমিনিটও কাটেনি তারপর, নেপথ্য থেকে আবার সেই উচ্চকিত হাস্যরোল ভেসে এল। বোঝা গেল, বিদ্রূপবাণে আবারো স্যার ওয়াল্টার ধরাশায়ী হয়েছেন। লর্ড ব্যুমণ্ট বললেন, "বেচারা শল্‌মণ্ডেলি! ওরই বা কী দোষ! এখনো ওর মনটা ঠিক আধুনিক হয়ে উঠতে পারেনি।"

"আধুনিক মন বলতে তুমি কি বোঝো?" গ্র্যাণ্ট জিজ্ঞেস করল।

"আধুনিক মন? এর আবার বোঝাবুঝির কি আছে? অর্থাৎ, যে-মনে এসে প্রগতির হাওয়া লেগেছে; বাস্তব জীবনকে যে মন মুখোমুখী দাঁড়িয়ে চিনে নিতে পারে।" ভেতর থেকে আবার সেই প্রচণ্ড হাস্যরোল ভেসে এল।

বেসিল বলল: "এ-প্রশ্ন তোমাকে জিজ্ঞেস করছি শুধুমাত্র এই কারণেই যে, তোমার শেষ যে-দুটি বন্ধুকে আমি দেখেছিলাম—এখনো তাদের কথা আমার

বেশ ভালভাবেই মনে আছে। তাঁদের মধ্যে প্রথমজন বলতেন, মাছ খাওয়াটা উচিত নয়; দ্বিতীয়জন বলতেন, নরখাদক হওয়া উচিত। না-কি আমি ঠিক বলছি তো?"

আমাদের দু'জনকে ভিতরের দিকে নিয়ে যেতে যেতে লর্ড ব্যামন্ট বললেন, "বেসিল, কী যে তোমার বক্তব্য সেইটেই আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। কখনো তোমাকে পরম উদারনৈতিক বলে মনে হয়, কখনো চরম রক্ষণশীল। বেসিল, তুমি কি প্রগতিবাদী?"

খুশীগলায় বেসিল বলল, "না।"

ভিতরের দিককার একটি ড্রয়িংরুমে গিয়ে আমরা ঢুকলাম। বেশ একটা মজলিশ বসে গেছে সেখানে; তার মধ্যমণি সেই ছিমছাম ভদ্রলোক, সারাটা বিকেল নোংরা গলিঘুঁজির মধ্যে ছায়ার মতো আমরা যাকে অনুসরণ করে এসেছি। বুঝলাম, ইনিই মিঃ উইমপোল। সকলেই মুগ্ধ হয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন, আমরা যেতে তাঁরা আমাদের দিকে ফিরে চাইলেন। তবে দুজনের চোখ কিন্তু তাঁর দিকেই নিবদ্ধ হয়ে রইল। একজন হলেন মুরিয়েল ব্যামন্ট, লর্ড ব্যামন্টের কন্যা। বড় বড় নীলাভ দুটি চক্ষু মেলে লতৃষ্ণ নয়নে মুরিয়েল তাঁর দিকে তাকিয়ে রয়েছেন; বাক্‌চাতুর্যের প্রতি অভিজাতবংশীয়মাত্রেরই মনে যে অধীর তৃষ্ণা বর্তমান মুরিয়েলও তার থেকে অব্যাহতি পাননি। আর, অন্যজন হলেন স্যার ওয়াল্টার শল্‌মণ্ডেলি, তিনিও মিঃ উইমপোলের দিকে তাকিয়ে আছেন। তবে স্যার ওয়াল্টারের দৃষ্টি একটু অন্যরকম; অস্থির, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ। দেখে মনে হলো, পারলে তিনি উইমপোলকে ছিঁড়ে ফেলেন।

মিঃ উইমপোলকে আর একবার ভাল করে দেখলাম। একখানা ইজিচেয়ারে বেশ ঝাঁকিয়ে বসে আছেন ভদ্রলোক। ঢেউতোলা বাহারে চুল, মসৃণ চেহারা এতই মসৃণ যে, সাপের সঙ্গে একটা সাদৃশ্য মনে আসে। ইনিই যে সেই ভদ্রলোক, আর তাতে সন্দেহ নেই। এঁকেই আমরা উত্তর-লণ্ডন থেকে অনুসরণ করে আসছি। আমার তার দিকে তাকালাম। বিজয়গর্বে দুচোখ তাঁর জ্বলজ্বল করছে।

মুরিয়েল ব্র্যাক্ট বললেন, "একটা জিনিস আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছি না মিঃ উইমপোল। এই যে আপনি এমন চমৎকার কথা বললেন, কী করে এটা সম্ভব হলো? আর কী অদ্ভুত আপনার বিদ্রূপ, কী রসালো! ভাবতেই তো আমার হাসতে হাসতে দম আটকে আসে।"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে স্যার ওয়াল্টার বললেন, "মিস্ ব্র্যাক্ট্ ঠিক কথাই বলেছেন। অতিশয় হাস্যকর আপনার কথাবার্তা; এই অর্থে হাস্যকর যে তা অত্যন্তই নিকৃষ্ট শ্রেণীর রসিকতা, অত্যন্তই যাচ্ছেতাই। ভাবতে তো আমার মেজাজ রাখাই কঠিন হয়ে পড়ে।"

কতোই যেন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন এমনই একটা ভাব দেখিয়ে বিদ্রূপাত্মক গলায় মিঃ উইমপোল বলে উঠলেন, "তাই নাকি? মেজাজ রাখাই কঠিন হয়ে পড়ে? তবে তো বড়োই মুশকিল হলো দেখছি। অমন একটা দামী মেজাজ, ওটাকে তো নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। এক কাজ করুন বরং, মেজাজটাকে এবার যাদুঘরে গিয়ে জমা দিয়ে আসুন।"

বলতে-না-বলতেই উচ্চকণ্ঠে সকলে হেসে উঠলেন। আগে থাকতেই যেন সকলে ধরে নিয়েছিলেন যে, একটা কিছু মোক্ষম রসিকতা করা হবে। অপমানে লাল হয়ে গেলেন স্যার ওয়াল্টার, স্থানকালপাত্র বিস্মৃত হয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, "চুপ করুন, চুপ করুন বলছি। কার সাথে আপনি ইয়ারকি দিচ্ছেন জানেন? চেনেন আমাকে?"

"চিনি বইকি, নিশ্চয়ই চিনি—" মিঃ উইমপোল বললেন, "লোক না চিনে কি আর ইয়ারকি দিতে যাই?" আবার হাস্যরোল।

ঘরের একোণ থেকে ওকোণে চলে গেল বেসিল গ্র্যান্ট, লর্ড ব্র্যাক্ট-এর সেই সেক্রেটারীটির পাশে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর তাঁর কাঁধে হাত রাখল। ভদ্রলোক তখন দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিলেন, মুখ থমথমে। মুরিয়েল অধীর আগ্রহে মিঃ উইমপোলের দিকে তাকিয়ে আছেন। সে দৃশ্য দেখে মিঃ ড্রামণ্ডের মুখ যেন আরও থমথমে হয়ে উঠেছে বলে' মনে হলো।

গ্র্যান্ট বলল, "স্ল্যাময়ও, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। জরুরী কথা, একটু বাইরে যেতে হবে। লেডী ব্র্যাণ্ট কিছু মনে করবেন না।"

আমিও তাদের সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গেলাম। বেসিলেরই অনুরোধে, বলাই বাহুল্য।

সমস্ত ব্যাপারটাই আমার কাছে একটা প্রচণ্ড প্রহেলিকার মতো ঠেকছিল। কী-যে বেসিল বলবে স্ল্যামগুকে, আর তার জন্যে বাইরে আসবারই বা দরকার কী, কিছুই আমি বুঝে উঠতে পারলাম না। হল্-এরই সংলগ্ন একটা ছোট্টমতন ঘরে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা; আমি, বেসিল আর মিঃ স্ল্যামণ্ড।

"স্ল্যামণ্ড,—" তীক্ষ্ণস্বরে বেসিল বলল, "আজকের এই আসরে যাঁরা এসেছেন তাঁদের মধ্যে একদল হলেন ভালমানুষ, আরেক দল বুদ্ধিমান। মুশকিল হয়েছে এই যে, ভালমানুষরা সব উন্মাদ, আর বুদ্ধিমানরা অসৎ। এক শুধু তোমাকেই দেখছি একাধারে সৎ এবং বুদ্ধিমান। এখন এই উইমপোল লোকটা সম্পর্কে তোমার ধারণা কী বলো।"

মিঃ স্ল্যামণ্ডের চুলের রঙ ঈষৎ রক্তিম, মুখের রঙ ফ্যাকাসে। বেসিলের কথা শুনে তাঁর সেই ফ্যাকাসে মুখও রক্তিম হয়ে উঠল। তিনি বললেন, "মিঃ উইমপোল সম্পর্কে কোনও মতামত দেওয়াটা আমার উচিত নয়।"

বেসিল শুধোল, "কেন নয়?"

স্ল্যামণ্ড কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন, তারপর বললেন, "উইমপোলকে আমি ঘৃণা করি।"

কেন যে ঘৃণা করেন তা আর আমাদের জিজ্ঞেস করবার দরকার হলো না। যে দৃষ্টিতে তিনি মিস ব্র্যাণ্ট এবং মিঃ উইপোলের দিকে তাকাচ্ছিলেন তাতেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। শান্তস্বরে বেসিল বলল, "তাতো বুঝলাম। তবে, তবে, প্রথম থেকেই তো আর ঘৃণা করতে শুরু করোনি বাপু। আগে তোমার এ লোকটিকে কেমন লাগত?"

"দেখুন, আপনারা আমাকে বড্ডোই মুশকিলে ফেললেন," মিঃ স্ল্যামণ্ড জবাব দিলেন; তাঁর কণ্ঠস্বর শুনেই বুঝলাম যে লোকটি অত্যন্তই সৎ; বললেন, "এখন

যদি কোনও মতামত দি তো সেটা বোধ হয় ঠিক হবে না। প্রথম প্রথম লোকটিকে আমার বেশ ভালই লেগেছিল, একথা বলতে পারলেই আমি খুশী হতাম। কিন্তু সেটাও সত্যভাষণ হবে না। ব্যক্তিগত কারণে ইদানীং মিঃ উইপোলকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করেছি, তবে প্রথম থেকেই লোকটিকে আমার ভাল লাগেনি। আগে অবশ্য এতটা বাচালতা করতেন না, তবে বড্ডো বেশী উপদেশ আওড়াতেন। তারপর স্যার ওয়াল্টার শল্মগুলি একদিন এ বাড়িতে পদার্পণ করলেন। ব্যস্, সঙ্গে সঙ্গেই চেহারা পালটে গেল মিঃ উইমপোলের। বুড়ো ভদ্রলোকটিকে তিনি যাচ্ছেতাইভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে শুরু করলেন। একেই নাকি বলে বাকপটুত্ব। তখন থেকেই লোকটিকে আমার আরো খারাপ লাগছে। স্যার ওয়াল্টার একে বৃদ্ধ, তায় অত্যন্ত ভালমানুষ। তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করাটা কি ঠিক? আর সে কী জঘন্য দুর্ব্যবহার! ব্যঙ্গবিদ্রূপে মিঃ উইমপোল এই বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে যেন নাজেহাল করে ছাড়চেন। এই জন্যেই আমি চটে গেছি। একথা অবশ্য ঠিক যে, উইমপোলকে যে আমি ঘৃণা করি তার কারণ আর-একজন তাঁকে শ্রদ্ধা করে। তবে সেইটেই কিছু একমাত্র কারণ নয়। স্যার ওয়াল্টার মিঃ উইমপোলকে ঘৃণা করেন,—সে-কারণেও উইমপোল ঘৃণ্য।"

মিঃ ড্রামণ্ডের জন্যে আমি করুণাবোধ করলাম। সেই সঙ্গে একটু শ্রদ্ধাও জন্মাল। করুণা এই কারণে যে, মিস্ ব্র্যাম্‌স্টের জন্যে বেচারা একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে। শ্রদ্ধার কারণ, উইমপোল সম্পর্কে তাঁর বর্ণনাটি নিখুঁত, সেই সঙ্গে তথ্যপূর্ণ। একটু যেন দুঃখও হলো। আহা বেচারা, উইমপোলের ওপরে একেবারে ক্ষেপে গেছে! কেন যে ক্ষেপেছে—তার কারণ দেখাতে গিয়ে একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারটাকেও কিনা গোপন রাখতে পারল না!

এবম্প্রকার চিন্তা করছি, বেসিল হঠাৎ চাপা-গলায় আমাকে এক অদ্ভুত অনুরোধ জানাল:

"ঈশ্বরের দোহাই, আর এক মুহূর্তও দেরী করো না। চলো, রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি।"

বেসিল গ্র্যান্টের প্রতি বরাবরই আমি এক বিচিত্র আকর্ষণ বোধ করেছি। কেন, জানি না। এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হলো না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম।

রাস্তায় নেমে সে বলল, "বড়োই অদ্ভুত ব্যাপার সন্দেহ নেই, তবে সেই সঙ্গে একটু সরসও বটে।"

"কোন ব্যাপারটা?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"কোন ব্যাপারটা আবার, এই ব্যাপারটাই। এখন যা বলছি শোন। লর্ড ব্র্যামন্ট-এর বাড়িতে আজ রাত্রে একটা বিরাট ডিনার পার্টির আয়োজন করা হয়েছে, আমাদের দুজনকেও তাতে যোগ দিতে হবে। লর্ড এবং লেডী, দুজনেই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়েছেন। মিঃ উইমপোলও ডিনার-পার্টিতে উপস্থিত থাকবেন এবং সেখানে যে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের ফোয়ারা ছোটাবেন তাতে আর সন্দেহ নেই। যা হোক, এটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। অস্বাভাবিক ব্যাপারটা হলো এই যে, ডিনার-পার্টিতে আমরা উপস্থিত থাকব না।"

আমি বললাম, "বেসিল, ঘড়ির দিকে চেয়ে ছাখো। ছ'টা বেজে গেছে। এখন আমাদের বাড়ি ফিরতে হবে, ডিনার-পার্টিতে আসতে হলে পোশাক বদলাতে হবে তার জন্যে। এত অল্প সময়ে তা সম্ভব নয়। সুতরাং নেমন্তন্ন রাখাও অসম্ভব। এর মধ্যে আবার অস্বাভাবিক কি আছে?"

গ্র্যান্ট বলল, "কিছুই নেই? বেশ, উত্তম কথা। তবে, নেমন্তন্নে আসার বদলে অন্য একটা কাজ করব আমরা; তাতে নিশ্চয়ই তুমি অবাক হয়ে যাবে।"

বোকার মতো আমি বেসিলের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমতা-আমতা করে বললাম, "অন্য কাজ? কী অন্য কাজ?"

"কাজটা হলো এই যে, এই শীতের সন্ধ্যায় লর্ড ব্র্যামন্ট-এর অট্টালিকার বাইরে আমরা ঘণ্টা দুয়েক স্রেফ চুপচাপ করে দাঁড়িয়ে থাকব। আগেই তোমাকে বলেছি, আমি একটু অহঙ্কারী। তুমি আমার অহঙ্কারে ঘা দিয়েছ। তোমাকে আমি দেখাতে চাই যে, আমার কথাই ঠিক। আপাতত এই চুরুটটি খাও;

যতক্ষণ না স্যার ওয়াণ্টার শল্‌মণ্ডেলি এবং মিঃ উইমপোল বাইরে বেরিয়ে আসছেন ততক্ষণ আমাদের ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।"

আমি বললাম, "তথাস্তু। একটা কথা, দুজনের মধ্যে কে আগে বেরোবেন জানো ?"

বেসিল বলল, "না। হয়তো স্যার ওয়াণ্টারই চটেমটে বেরিয়ে আসবেন। উইমপোলও আগে বেরোতে পারে; প্রতিপক্ষের ওপর শেষ বিদ্রূপের তীক্ষ্ণ তীর ছুঁড়ে দিয়ে বিজয়গর্বে সে হয়তো রাস্তায় এসে নামবে। আর স্যার ওয়াণ্টার হয়তো বসে' বসে' তাকে শাপমণ্যি দেবেন। মোট কথা কে যে ঠিক আগে বেরোবে, কিছুই বলা যাচ্ছে না। তবে দুজনকেই তাড়াতাড়ি করে কেতে হবে। পোষাক পাল্টে আবার ডিনারে আসা চাই'তো—"

রাস্তা দিয়ে একটা ভাড়াটে গাড়ী যাচ্ছিল। বেসিলের কথা তখনও শেষ হয়নি, লর্ড ব্যামণ্ট-এর বিরাট অট্টালিকার বারান্দা থেকে কে যেন শিস দিয়ে সেই গাড়ীখানাকে ডাকল। আর তারপরেই এক অপ্রত্যাশিত দৃশ্য দেখলাম। মিঃ উইমপোল আর স্যার ওয়াণ্টার শল্‌মণ্ডেলি একই সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে এলেন।

রাস্তায় নেমে তাঁরা একটু থমকে দাঁড়ালেন, পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন একবার। সে দৃষ্টিতে সন্দেহ, দ্বিধা, সংশয়। তবে দুজনেই তাঁরা ভদ্রলোক, তাই ভদ্রতাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হলো। স্যার ওয়াণ্টার হাসলেন একটু, তারপর বললেন, "বড্ডোই কুয়াশা পড়েছে দেখছি; আসুন না, এক গাড়িতেই যাই—"

দুজনেই এক সাথে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন, ঘর্ঘর আওয়াজ তুলে গাড়ি ছুটল। আর তারপরেই বেসিল আমাকে বলল, "দৌড়োও, এক মুহূর্তও আর সময় নষ্ট করো না, গাড়িখানার পেছন পেছন দৌড়োও।"

ছুটতে শুরু করলাম আমরা। অন্ধকার রাস্তা, গাড়ির পিছনে আমরা পাগলের মতো দৌড়চ্ছি। কেন যে দৌড়চ্ছি ঈশ্বর জানেন, তবে দৌড়চ্ছি যে এটা ঠিক। সৌভাগ্যবশত খুব বেশীক্ষণ আমাদের ছুটতে হলো না, খানিকটা

ঘুরে মোড়ের মাথায় গিয়ে থেমে দাঁড়াল গাড়িখানা। আরোহী দুজন গাড়ির থেকে নেমে এলেন। স্যার ওয়াল্টারই ভাড়া চুকিয়ে দিলেন দেখলাম। বকশিশের মাত্রাটা বোধ হয় একটু বেশীই হয়ে থাকবে, খুশী মনে তাই গাড়োয়ান তার গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল। দুজনে তারপর কথাবার্তা বললেন খানিকক্ষণ, শত্রুতা সত্বেও বীর যোদ্ধারা যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। ক্ষমা অথবা দ্বন্দ্বযুদ্ধই এর একমাত্র পরিণতি; দশ গজ দূরের থেকে অন্তত তাই আমাদের মনে হলো। তারপর তাঁরা হাসিমুখে করমর্দন করে দুজনে দুপথে এগোলেন।

আবার লাফিয়ে উঠল বেসিল; শূন্যে হাত ছুঁড়ে বলল, "দৌড়োও, দৌড়োও, শীগ্‌গীর গিয়ে ওই হতচ্ছাড়াকে পাকড়াও।"

এক লাফে আমরা সেই মোড়ের মাথায় গিয়ে দাঁড়ালাম, তারপরেই স্যার ওয়াল্টার যে পথে এগিয়ে গিয়েছেন সেই পথ ধরে বেসিল ছুটে চলল।

"থামো বেসিল, থামো—" চিৎকার করেই আমি বললাম, "শীগ্‌গীর থামো। আমরা ভুল পথে এসেছি।"

বেসিল এ্যাণ্ট দৌড়েই চলল।

আবার আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "মূর্খ, করেছো কি? উইমপোল এ-পথে যায়নি, এ-পথে গিয়েছেন স্যার ওয়াল্টার। উইমপোল এতক্ষণে নির্বিঘ্নে সরে পড়ল। এতক্ষণে সে উল্টো দিকের পথ ধরে আধমাইল অন্তত এগিয়ে গিয়েছে। বেসিল, তুমি ভুলপথে এসেছ। তবুও তুমি থামছ না? বেসিল তুমি কি কালা হয়ে গিয়েছ? বেসিল, বেসিল—"

"কেন এতো চ্যাচাচ্ছ? ঠিক পথেই এসেছি আমরা—" দৌড়তে দৌড়তেই বেসিল জবাব দিল।

বললাম, "বেওকুফ, এই কি তোমার ঠিক পথ? চেয়ে ছাখো, কে তোমার সামনে। ওই কি উইমপোল? উনি হলেন স্যার ওয়াল্টার। বেসিল, তবুও শুনছ না? উদ্দেশ্যটা কি তোমার?"

"চেঁচিয়ো না; দৌড়োও, প্রাণপণ দৌড়োও।"

দৌড়তে দৌড়তে আমরা সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রায় কাছাকাছি এসে পড়লাম। রাস্তার আলোতে তাঁর শুভ্র গুম্ফ পর্যন্ত আমার দৃষ্টিগোচর হলো। আমি একেবারে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম, কিছুই আমার বোধগম্য হলো না।

বেসিল বলল, "চার্লি, আর মাত্র কয়েকটা মিনিট। দয়া করে আমার বুদ্ধির ওপর একটু আস্থা স্থাপন করো। করবে?"

দৌড়তে দৌড়তে আমি বললাম, "নিশ্চয়ই করবো, নিশ্চয়ই।"

"তাহলে শীগ্‌গীর গিয়ে সামনের ওই লোকটিকে পাকড়াও। মাটির ওপর একেবারে পেড়ে ফেলা চাই। যে মুহূর্তে বলব 'পাকড়াও' সেই মুহূর্তেই গিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। বুঝেছ? ব্যাস্, পাকড়াও।"

বাঘের মতো আমরা গিয়ে স্যার ওয়াল্টার শল্‌মণ্ডেলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লাম, মাটির ওপরে শুইয়ে ফেললাম তাঁকে। ভদ্রলোক বেশ বীরত্ব সহকারেই আমাদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন, আমরা একেবারে তাঁর টুঁটি টিপে ধরলাম। তবে, কেন ধরলাম জানি না। বুড়ো বয়েসেও স্যার ওয়াল্টার দেখলাম অমিত শক্তির অধিকারী। হাত দুখানাকে বেঁধে ফেলাতে তিনি পা ছুঁড়তে লাগলেন; পা দুখানাকে বেঁধে ফেলায় তিনি ষাঁড়ের মতো চ্যাচাতে লাগলেন। কী আর করা যায়, অগত্যা তাঁর মুখের মধ্যে খানিকটা কাপড় গুঁজে দেওয়া হলো। তারপর, বেসিলেরই পরামর্শমতো, রাস্তার একপাশে তাঁকে একটা বস্তার মতো ফেলে রাখলাম। তবে কেন যে এই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে নিয়ে এত হেনস্তা করছি দুজনে, কী এর উদ্দেশ্য, কিছুই আমার মাথায় ঢুকল না।

"চার্লি—" সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শান্তস্বরে বেসিল গ্র্যান্ট বলল, "তোমায় একটু অসুবিধে ঘটালাম। একটু কষ্ট দিলাম তোমাকে। তার জন্যে আমি দুঃখিত। তা এতই যখন করলে, আরও একটু কষ্ট করো। এখানে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার দেখা করবার কথা আছে। যতক্ষণ না তিনি আসছেন, অপেক্ষা করতে হবে।"

"দেখা করবার কথা!" বোকার মতো আমি বিস্ময় প্রকাশ করলাম।

স্যার ওয়াল্টার বন্দীদশায় পড়ে আছেন রাস্তার ওপর, চোখে তাঁর নিরুপায়

খুশি। তার দিকে তাকিয়ে বেসিল বলল, "হ্যাঁ, দেখা করবার কথা। চমৎকার একটি ছেলের সঙ্গে। নাম বেলশার ড্রামণ্ড। তাকে তুমি চেনো। আজই বিকেলে লর্ড ব্র্যামর্ট-এর ওখানে তার সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে। তবে হ্যাঁ, আসতে তার দেরী হবে। ডিনার-পার্টির হাঙ্গামা মিটিয়ে তারপর সে আসবে।"

কতক্ষণ যে আমরা সেই রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে রইলাম জানি না; মনে হলো যেন অনাদি অনন্তকাল ধরে এমনিভাবেই আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। ততক্ষণে আমি বুঝে নিয়েছি যে, সর্বনাশ হয়েছে। বহুদিন, বহু বছর আগে ইংল্যাণ্ডের এক আদালতে যা ঘটেছিল সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। বেসিল গ্র্যাণ্ট নিশ্চয়ই উন্মাদ হয়ে গেছে আবার। বৃদ্ধ স্যার ওয়াল্টার শল্‌মণ্ডেলি নিরুপায়ের মতো বন্দী হয়ে পড়ে আছেন, তাঁর প্রতি বেসিলের এই অমানুষিক আচরণের আর কোনও হেতু আমি খুঁজে পেলাম না।

প্রায় ঘণ্টাচারেক পরে মিঃ ড্রামণ্ড এসে হাজির হলেন। পরণে সান্ধ্য পোষাক। রাস্তার মৃদু আলোতে সেই লালচে গোঁফ আর বিবর্ণ ফ্যাকাসে মুখ দেখে তাঁকে আমি চিনলাম।

"মিঃ গ্র্যাণ্ট—" বিমূঢ় বিস্ময়ে তিনি বললেন, "যা হয়েছে তা প্রায় অবিশ্বাস্য; আপনার কথা একেবারে অক্ষরে-অক্ষরে মিলে গেছে। বিরাট বিরাট সব লোক এসেছিলেন আজকের ডিনার-পার্টিতে,—ডিউক, ডাচেস্, সম্পাদক—সকলেই। সকলেই তাঁরা মিঃ উইমপোলের কথামৃত শুনতে এসেছিলেন। কিন্তু কী আশ্চর্য, উইমপোল আজ একটিও কথা কয়নি; সারাক্ষণ সে একেবারে বোবা হয়ে বসে ছিল। কী করে এটা সম্ভব হলো? আমি তো কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।"

গ্র্যাণ্ট শুধু বন্দী স্যার ওয়াল্টার শল্‌মণ্ডেলির দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করল, বলল, "কী করে সম্ভব হলো জানতে চাও? সম্ভব হলো এই বুড়োর জন্যে।"

ড্রামণ্ড দেখলেন, বৃদ্ধ এক স্থূলাঙ্গ ভদ্রলোক চুপচাপ ভূতলে শুয়ে আছেন; দেখে তিনি চমকে উঠলেন।

"কে, ও কে?"

উত্তর না দিয়ে আর ওয়ান্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ল বেসিল, বুকের বুক পকেট থেকে একখানা কাগজ টেনে বের করল। বন্দীদশাতেও আর ওয়ান্টার প্রাণপণ তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন; সে চেষ্টা কার্যকরী হলো না।

শাদা একটুকরো কাগজ; বেসিল সেটা মিঃ ড্রামণ্ডের দিকে এগিয়ে দিল। ড্রামণ্ড সেটা পড়লেন, মুখেচোখে একটা বিমূঢ়ভাব ফুটে উঠল তাঁর। দেখলেন, কাগজটাতে শুধু একগাদা প্রশ্ন এবং উত্তর পর-পর সাজানো রয়েছে। প্রশ্নোত্তরও ঠিক নয়, উক্তি এবং প্রত্যুক্তি। ধস্তাধস্তির ফলে তার অনেকখানিই ছিঁড়ে গেছে; অক্ষত অংশটুকু এই রকম :—

শল্মণ্ডেলি—"মিস্ ব্ল্যুমণ্ট ঠিক কথাই·········মেজাজ রাখাই কঠিন হয়ে পড়ে!"

উইমপোল—"তাই নাকি·········যাদুঘরে গিয়ে জমা দিয়ে আসুন।"

শল্মণ্ডেলি—"চুপ করুন, চুপ·········চেনেন আমাকে?"

উইমপোল—"চিনি বই কি,·········ইয়ারকি দিতে যাই?"

পড়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন মিঃ ড্রামণ্ড, মাথামুণ্ডু কিছুই তিনি বুঝলেন না। কাগজখানাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, "কী এটা? কী এর অর্থ?"

সেই অবিচলিত শান্তস্বরে মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে বেসিল বলল, "কী এটা জানতে চাইছ? এটা একটা নতুন ধরণের পেশা। নতুন ধরণের জীবিকা। খুব সৎ নয় অবশ্য; তা না হোক—তা সত্ত্বেও বলব, জীবিকাটা অপূর্ব।"

"নতুন পেশা!" বিমূঢ়ভাবেই মিঃ ড্রামণ্ড বললেন, "নতুন জীবিকা! কী আপনি বলতে চাইছেন?"

"ঠিকই বলেছি, একেবারে আনকোরা নতুন ধরণের একটা ব্যবসা। ব্যবসাটা খুব সৎ নয়, তার জন্যে আমার দুঃখ হচ্ছে।"

ড্রামণ্ড এবং আমি এবারে এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, "মাথামুণ্ডু কিছুই আমরা বুঝে উঠতে পারছি না! কী এটা?"

উত্তরে বেসিল বলল, "চঞ্চল হয়ো না; এটাই হচ্ছে মিঃ উইমপোলের জীবিকা। এই যে এক অসহায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক বেকারদায় পড়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করেছেন, কী তোমাদের ধারণা এঁর সম্পর্কে? ভাবছ, ইনি একটি পয়সাওয়ালা মূর্খ? আসল ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই তা নয়। আসলে এঁরও অবস্থা আমাদেরই মতো। আমাদেরই মতো ইনি বুদ্ধিমান, আমাদেরই মতো দরিদ্র। এবং আমাদেরই মতো শীর্ণকলেবর। স্থূলাঙ্গ বলে মনে হচ্ছে তো? হতেই পারে। একগাদা কাপড়জামা পরে' ইনি স্থূলাঙ্গ মূর্খ ধনীর ভূমিকায় অভিনয় করতে নেমেছেন। খুব একটা কিছু বয়েস হয়নি এঁর, নামও এঁর পদ্মগুলি নয়। আসলে ইনি একটি জোচ্চোর, চমৎকার একটি জোচ্চোর। আর এঁর জোচ্চুরিটাও বেশ নতুন ধরণের। ডিনার-পার্টিতে ইনি অন্য লোকের সুবিধার্থে মূর্খের ভূমিকায় ভাড়া খাটতে আসেন; আগে থাকতেই পার্ট মুখস্থ থাকে, কাগজের ওই ছেঁড়া টুকরোটাতেই তোমরা তার আভাষ পেয়েছ। সেখানে ইনি মূর্খের পার্ট বলে যান, আর এঁর মক্কেল বলে যান চালাকের পার্ট। তার জন্যে এঁকে মাইনে দিতে হয়, প্রতি রাত্তিরে এই ধরো এক গিনি।"

ঘৃণাভরে মিঃ ড্রামণ্ড বলে উঠলেন, "তাহলে ওই ব্যাটা উইমপোলের—"

সহাস্য মুখে বেসিল তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, ওই ব্যাটা উইমপোলের আর তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হবার সম্ভাবনা নেই। চেহারাটা অবশ্য তার ভালোই; বেশ ছিমছাম পুরুষ, চুলগুলোও বেশ রূপোলি আর ঢেউ খেলানো—। তা সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হতে পারো, উইমপোলের আর আশা নেই। বুদ্ধি দেখিয়ে সে বাজীমাৎ করতে চেয়েছিল; চেয়ে ভাখো, সেই বুদ্ধিরই ভাণ্ডার এখন তার ধূলোয় গড়াগড়ি যাচ্ছেন।"

রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন মিঃ ড্রামণ্ড, "জেল হওয়া উচিত, জেলই এই হতচ্ছাড়া বুড়োর উপযুক্ত জায়গা।"

মৃদু হেসে বেসিল বলল, "না, জেল নয়। উপযুক্ত জায়গা একটা আছে বটে,—তবে সেটা জেল নয়, আজব জীবিকা সঙ্ঘ।"

তৃতীয় পর্ব : পাত্রীর আবির্ভাব

আমার বিশ্বাস, মনুষ্যসমাজ এবং বস্তু-জগতের মধ্যে একটা তীব্র বিরোধ বর্তমান। বিরোধটার ইদানীং ভোল পাল্টেছে। একমাত্র বড় বড় বস্তুগুলিই আগে আমাদের জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করত, আজকাল আর করে না। সে-দায়িত্ব ক্ষুদ্রাকার বস্তুগুলি গ্রহণ করেছে। অনবরত আমাদের সঙ্গে তারা সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, আমাদের নাজেহাল করে ছাড়ছে। এই ধরুন ঝড়ঝঞ্ঝা। এই বিরাট দৈত্যটি আর আজকাল আমাদের জ্বালায় না, আজকাল সে শান্ত হয়েছে। আগে আগে সামুদ্রিক ঝড়ঝঞ্ঝায় আথছার আমাদের জাহাজডুবি হতো, আজকাল আর বড়-একটা হয় না। কিংবা ধরুন, আগ্নেয়গিরি। আগেকার কালে অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ে অষ্টপ্রহর সকলে তটস্থ থাকত; তারও আজকাল দাপট কমেছে। বৃহদাকার এই বস্তুরূপী দৈত্যগুলি আজকাল শান্ত হয়ে এসেছে বটে, তবে তাতে কিছু লাভ হয়নি। বড়র দাপট কমেছে, ছোটর দাপট বেড়েছে। ক্ষুদ্রাকার সব শত্রুর সঙ্গে, দৃষ্টান্তস্বরূপ জীবাণু কিংবা জামার বোতামের উল্লেখ করা যায়, অহোরাত্র যুদ্ধ চালাতে হচ্ছে আমাদের।

শার্টের গায়ে কলার-বোতামটিকে প্রবিষ্ট করাতে করাতে গলদঘর্ম অবস্থায় এই মহান সত্যটি আমি আবিষ্কার করলাম। এ নিয়ে নিবিষ্টমনে আরও কিছুক্ষণ হয়তো চিন্তা করতাম আমি, আর তার ফলে মহত্তর কোনও সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌছুনও হয়তো অসম্ভব ছিল না আমার পক্ষে; তার আর অবসর হলো না। সজোরে কে যেন আমার দরজার কড়া নাড়ল।

কে আবার জ্বালাতে এলো? একটু বিরক্ত হলাম আমি; পরক্ষণেই মনে হ'ল, হয়তো বা বেসিল গ্র্যান্ট নিজেই আমাকে ডেকে নিতে এসেছে। আমাদের দুজনের আজ ডিনারের নেমন্তন্ন আছে এক জায়গায়; সেইজন্যেই আমি জামা-কাপড় পরে

তৈরী হয়ে নিচ্ছিলাম। কথা ছিল আমরা আলাদা-আলাদা যাব। কে জানে, শেষ মুহূর্তে কী তার মাথায় ঢুকেছে। হয়তো ভেবেছে, একা যেতে দ্বিধাগ্রস্ত হতে পারি; তাই হয়তো ডেকে নিতে এসেছে। যে ভদ্রমহিলার বাড়িতে নেমন্তন্ন, সমাজে তিনি সহৃদয়া এবং অতিথিবৎসলা বলে সুপরিচিতা। বেসিলেরই তিনি বান্ধবী, ইদানীং রাজনীতি নিয়ে মত্ত আছেন। কে এক ক্যাপ্টেন ক্রেজার আজ তাঁর ওখানে আসবেন, বাঁদর সম্পর্কে তিনি নাকি একজন বিশেষজ্ঞ। তাঁরই সম্মানার্থে ভদ্রমহিলা এই ডিনার-পার্টির আয়োজন করেছেন। আমাকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে বেসিলেরই সুবাদে, নিমন্ত্রণকারিণীকে আমি আগে কখনো দেখিওনি। তাই একলা যেতে আমার সঙ্কোচ হতে পারে—এই আশঙ্কাতে বেসিল নিজেই হয়তো আমাকে ডেকে নিতে এসেছে। কড়ানাড়া শুনে তাই অন্তত আমার মনে হয়েছিল। পরে দেখলাম, না—বেসিল নয়।

দরজা খুলতেই বেয়ারা আমার হাতে একটি ভিজিটিং-কার্ড তুলে দিল। নাম লেখা রয়েছে 'রেভারেণ্ড এলিস্ শর্টার'। তার নীচে লেখা, 'অত্যন্তই গুরুতর বিষয়ে কিছুক্ষণের জন্যে আপনার সাক্ষাৎ প্রার্থনা করি'। কথাক'টি খুব দ্রুতহাতে লেখা হয়েছে, তা সত্ত্বেও তার পরিচ্ছন্নতা লক্ষ্য করবার মত।

ততক্ষণে আমি আপ্রাণ চেষ্টায় কলার-বোতামটিকে ঠিকমতো পরিয়ে নিতে পেরেছি। তাতে প্রমাণিত হয়েছে যে, বস্তুর চাইতে মানুষের ক্ষমতাই বেশী। তবে, এ নিয়ে আর চিন্তা করবার সময় পাওয়া গেল না। চটপট্ ওয়েস্ট-কোট আর ড্রেস-কোটটাকে গায়ের ওপর চাপিয়ে আমি ড্রইং-রুমের দিকে ছুটলাম। আগন্তুক আমাকে দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। মনে হ'ল, একটা সিল্‌মাছ যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে। কি বলব, অন্য কোনও উপমা আমার মনে এল না। ভদ্রলোকের গায়ে একটা শাল জড়ান, জড়সড় হয়ে সেইটেকেই তিনি বারকয়েক ঝেড়েঝুড়ে নিলেন। কাল দস্তানা-জোড়াটিকেও নাড়াচাড়া করলেন কয়েকবার; জামাকাপড়ের থেকে ধুলো ঝাড়লেন। এ-সবই তার স্নায়ু-দৌর্বল্যের লক্ষণ। মনে হ'ল, উঠে দাঁড়াবার সময় নয়নপল্লব-দুটিকেও যেন ঝাপটে নিলেন বারংবার। আগন্তুককে বেশ ভাল করে একবার দেখে নিলাম। বেশভূষার থেকে বুঝলাম,

ইনি একজন পাদ্রী। চক্ষুদুটি জ্যোতিহীন, চুল আর গোঁফ ধপধপে শাদা। বেশ বয়েস হয়েছে। চেহারায় একটা অপ্রস্তুত কাচুমাচু ভাব।

"ভারী দুঃখিত আমি, খুব দুঃখিত। অত্যন্তই দুঃখিত," হাত কচলাতে কচলাতে আগন্তুক মিঃ এলিস্ শর্টার বললেন, "এই এসেছি, মানে আসতেই হ'ল, মানে ইয়ে কী বলব—অত্যন্তই জরুরী দরকার। তাই মানে এই অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। তা, আপনি কিছু মনে করেননি তো—"

বললাম যে কিছুই আমি মনে করিনি।

"কেন যে আমি এসেছি, মানে কী বলবো, ভয়ঙ্কর একটা ব্যাপার;" ভয়ত্রস্ত ভাঙা-ভাঙা গলায় তিনি ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করতে লাগলেন, "অত্যন্তই ভয়ঙ্কর, বীভৎস কাণ্ড। কারুর সাতেপাঁচে কখনো আমি মাথা গলাইনি; আসলে কি জানেন, ভারী শান্তিপ্রিয় লোক আমি। তা সত্ত্বেও যে—"

এ কী দীর্ঘ ভূমিকা! আমি একেবারে অধৈর্য হয়ে উঠলাম। এতক্ষণে আমার ডিনারে পৌঁছুবার কথা। এরপর যদি আর সময় নষ্ট করি তো অত্যন্তই দেরী হয়ে যাবে। এদিকে, নড়তেও পারছি না; ভদ্রলোকের কথায়বার্তায় এমন একটা করুণ আকুতি ফুটে উঠেছে যে তাঁকে থামিয়ে দেওয়াও অসম্ভব। কে জানে, কী এঁর বিপদ। সে তুলনায় আমার এই নেমন্তন্নের তাড়াটা হয়তো নিতান্তই একটা তুচ্ছ ব্যাপার।

ব্যস্ততা গোপন করে বললাম, "থামলেন কেন, বলে যান।"

মিঃ শর্টার অতিশয় ভদ্রলোক, চেষ্টা সত্ত্বেও আমার ব্যস্ততা তাঁর কাছে গোপন রইল না। ফলে তিনি আরও অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন।

কাচুমাচু গলায় বললেন; "অত্যন্তই দুঃখিত আমি; অসময়ে আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন! আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নেই, তবে আপনার বন্ধু মেজর ব্রাউনকে আমি চিনি। তিনিই আমাকে এখানে আসতে বললেন।"

শুনে আমি বিস্মিত হলাম। মেজর ব্রাউন!!

রেভারেণ্ড মিঃ শর্টার বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, মেজর ব্রাউন। তাঁর কী-এক

বিপদে আপনারা তাকে সাহায্য করেছিলেন, তাই না? আমারও আজ মহা বিপদ। সেই জন্যেই আমি এখানে ছুটে এসেছি। এর ওপরে একজনের বাঁচামরা নির্ভর করছে।"

ওদিকে ডিনারের বেলা বয়ে যায়। কী করি এখন? দাঁড়িয়ে উঠে বললাম, "মিঃ শর্টার, আর আমার বসবার উপায় নেই! ডিনারের নেমন্তন্ন আছে এক জায়গায়, এক্ষুণি আমায় বেরিয়ে পড়তে হবে।"

মিঃ শর্টারও প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই উঠে দাঁড়ালেন; দেখি তিনি থরথর করে কাঁপছেন। তা সত্ত্বেও, এই চরম বিপদেও তাঁর কণ্ঠস্বরে আত্মমর্যাদা ফুটে উঠল। কাঁপা-কাঁপা গলায় তিনি বললেন, "মিঃ সুইনবার্ন, আপনার সময় নষ্ট করবার কোনও অধিকারই আমার নেই। বিপদ আমার, তাতে আপনার কী। যান, আপনি ডিনারেই যান। কিছুক্ষণের জন্যে যে আপনাকে বিরক্ত করলাম, তারজন্যে আমি নিজেই লজ্জিত। এইটুকু শুধু আপনি জেনে রাখুন, অচেনা একজন অসহায় ব্যক্তিকে হয়তো আপনি ইচ্ছে করলেই বাঁচাতে পারতেন। যতক্ষণে আপনি ডিনার থেকে ফিরে আসবেন ততক্ষণে সে খুন হয়ে যাবে।"

কাঁপতে কাঁপতেই তিনি বসে পড়লেন আবার।

আমি তো থ। ভদ্রলোক বলেন কী। খুন হয়ে যাবে! আর আমি কিনা ডিনারের আনন্দে মশগুল। ছিঃ, ভারী তো ডিনার! কে-এক বাঁদর-বিশারদ ক্যাপ্টেন, তাঁর আবার সম্বর্ধনা! তার জন্যে আবার ডিনার-পার্টি! রাজনীতি-পাগলা এক বিধবা ভদ্রমহিলার প্রাণে শখ জেগেছে, রাজ্যের লোককে তিনি ডিনার খাইয়ে বেড়াচ্ছেন। এদিকে এক অসহায় নিরপরাধের যে প্রাণ যায়। তাকে ফেলে আমি ডিনারে যাব? শেষকালে নেমন্তন্নটাই কি বড় হল? নৈব নৈব চ। নেমন্তন্নের চিন্তাকে আমি মন থেকে একেবারে মুছে ফেলে দিলাম, প্রস্তুত হলাম এই বিপদাপন্ন বৃদ্ধের কাহিনী শোনবার জন্য।

তাঁকে সাহস দেবার জন্যে বললাম, "একটা চুরুট খাবেন?"

"না, ধন্যবাদ।" অপ্রস্তুতভাবে তিনি মাথা নাড়লেন; যেন চুরুট না-খাওয়াটা তাঁর মস্ত একটা অপরাধ।

"এক পাত্তর বার্গান্ডি খান বরং ?"

"না না, এখন আর ওসব ঝামেলার দরকার নেই ; ধন্তবাদ, আপনাকে অসংখ্য ধন্তবাদ। পরে বরং—"

আদপেই যাঁরা মদ ছোঁননা, ঠিক এমনিভাবেই বোধ হয় তাঁরা প্রসঙ্গটাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন ; বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, ঠিক এক্ষুনি তাঁদের তৃষ্ণা নেই—তাই খেলেন না ; পরে আরেকদিন বরং সারারাত জেগে হৈ হৈ করে মদ টানা যাবে।

"কিছুই খাবেন না তাহলে ?" অপদার্থ বুড়োর জন্তে আমার করুণা হ'ল, "এক কাপ চা দিই বরং ; না-কি তাও না ?"

আমারই জয় হ'ল এবার। চা এল ; ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঢক্ ঢক্ করে তিনি তাকে গলাধঃকরণ করলেন। তারপর একটু দম নিয়ে বললেন, "মিঃ সুইনবার্ন, কী যে বিপদ গেছে আমার উপর দিয়ে তা আর আপনাকে কী বলব ? আমি শান্তিপ্রিয় লোক, এ-সব ঝড়ঝাপ্টায় আমি অভ্যস্ত নই। ওঃ কত বচ্ছর ধরেই তো চান্দা-তে আমি ধর্মযাজকের কাজ করছি—,কী বলব, কক্ষণো আর এসব বীভৎস ব্যাপারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেনি।"

"কিসের বীভৎস ব্যাপার ?" উৎসুক কণ্ঠে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সেই কথাতেই আসছি। ওঃ, মনে করতেও আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। ভাবতে পারেন, চান্দার এই নিরীহ ধর্মযাজককে জোর করে একটা বুড়ী সাজানো হয়েছিল ? বুড়ী-সাজিয়ে আমাকে দিয়ে মারাত্মক রকমের একটা অপরাধ করিয়ে নেবার চেষ্টা হয়েছিল, ভাবতে পারেন এ-কথা ? আমি নিজেই কি কখনো স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছি ?"

"পারাটা একটু কষ্টকর বটে", আমি সায় দিয়ে বললাম, "তবে কি জানেন, আপনাদের ধর্মযাজকদের যে কী করতে হয়-না-হয়—আমি ঠিক জানি না। যতদূর মনে হচ্ছে, ও-কাজটা বোধ হয় আপনাদের কর্ম-তালিকার অন্তর্ভুক্ত নয়। হ্যাঁ, কি বলছিলেন যেন, কী সাজতে হয়েছিল আপনাকে ?"

"বুড়ী সাজতে হয়েছিল। হ্যাঁ, একটা বুড়ী।"

সত্যি বলতে কি, মিঃ শর্টারকে বুড়ী সাজাতে যে খুব বেগ পেতে হয়েছিল তা আমার মনে হয় না ; ভদ্রলোকের চেহারাটা খানিকটা মাসি-পিসি গোছেরই বটে। তবে কি না এটা রসিকতার সময় নয়, তাই আমি হাস্যসংবরণ করে বললাম, "ব্যাপারটা ঘটল কি করে, খুলে বলুন।"

মিঃ শর্টার বললেন, "গোড়ার থেকেই তাহলে শুরু করি। ভয় নেই, খুব সংক্ষেপেই সারব। আজ সকালে এগারোটা বেজে সতেরো মিনিটে আমি গীর্জের থেকে বেরোই। কয়েকটা জায়গায় দেখা করতে যাবার কথা ছিল। সেই সঙ্গে গ্রামটাও একবার ঘুরে আসব ভাবলাম। প্রথমে গেলাম মিঃ জার্ভিসের বাড়ী। ইনি হচ্ছেন আমাদের 'খৃষ্টীয় উৎসব সমিতি'র কোষাধ্যক্ষ। টেনিস-লনটাতে রোলার টানার দরুণ আমাদের মালী পার্কারের কিছু টাকা পাওনা ছিল ; সেই সম্পর্কেই মিঃ জার্ভিসের সঙ্গে কথাবার্তা হলো আমার। তারপর গেলাম মিসেস আর্নেটের ওখানে। ধর্মপ্রাণা মহিলা, তবে চিররুগ্না। ধর্মের ওপর খানকতক বইও লিখছেন মিসেস আর্নেট ; একখানা কবিতার বইও আছে। কী যেন বইখানার নাম ? ও হ্যাঁ—মনে পড়েছে, 'ইগল্যানটাইন'।"

সবিস্তার ভূমিকা। মিঃ শর্টার বেশ ধীরে-সুস্থে এইসব খুঁটিনাটি ঘটনার বর্ণনা দিয়ে চলেছেন, আর বেশ আগ্রহের সঙ্গে। ভদ্রলোকের বোধ হয় গোয়েন্দা-কাহিনী পড়া আছে ; সেই যে সেই সব বই—গোয়েন্দারা যেখানে এইসব আপাত-অপ্রাসঙ্গিক খুঁটিনাটি ঘটনার ওপরেই সব থেকে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেন !

মিঃ শর্টার তাঁর সেই একটানা ভঙ্গীতেই বলে চললেন, "অতঃপর গেলাম মিঃ কার্-এর বাড়ী (না না, ইনি মিঃ জেম্‌স্ কার্ নন, ইনি হলেন মিঃ রবার্ট কার্)। আমাদের গীর্জেতে যিনি অর্গ্যান বাজান, মিঃ কার্ই আপাতত তাঁকে সাহায্য করছেন। তাঁর ওখানেও কিছুক্ষণ আলাপ হলো (আলাপের বিষয়বস্তুটাও তাহলে শুনুন ; গীর্জের অর্গ্যানটায় যেন কে ছ্যাদা করে দিয়েছে। সকলে সন্দেহ করছে, সদতলার ছোকরাদেরই এই কীর্তি। তা, তাই নিয়েই আলোচনা হলো)। সেখান থেকে গেলাম মিস ব্রেট্-এর বাড়ী। আপনি হয়তো জানেন, গরীবদের সাহায্য করবার জন্যে কুমারী-ধর্মযাজিকারা সস্তায় জামা-কাপড় তৈরী করে'

বিলিয়ে থাকেন। এই সম্পর্কে সেখানে একটা সভা হবার কথা ছিল। এসব মেয়েদের সভা সাধারণত আমাদের বাড়ীতেই হয়। আমার স্ত্রী এবার অসুস্থ থাকায় স্থির হয়েছিল যে, এবারকার সভা মিস্ ব্রেট-এর বাড়ীতে বসবে। মিস্ ব্রেটও তাতে সাগ্রহেই রাজী হয়েছিলেন। আমাদের গ্রামে তিনি নবাগতা, তা সত্বেও ধর্মকর্মের ব্যাপারে তিনি খুবই আগ্রহ দেখাচ্ছেন। গীর্জের নিয়ম অনুসারে, কুমারী-ধর্মযাজিকাদের এইসব সভা-সমিতির ব্যাপারে আমার স্ত্রী-ই হচ্ছেন সর্বময়ী কর্ত্রী। তিনিই এসব ব্যাপারের দেখাশোনা করেন; আমিতো প্রায় কাউকেই চিনি না, এক শুধু মিস্ ব্রেটকেই চিনি। যা হোক, তা সত্বেও এবারকার সভায় আমি গেলাম। আগে থাকতেই কথা দিয়ে ফেলেছিলাম, না গেলে খুব খারাপ দেখাত।

"পৌছে দেখি মিস্ ব্রেট্ ছাড়া আর মাত্র চারজন কুমারী সেখানে হাজির হয়েছেন। আপন মনে তাঁরা সেলাই-ফোঁড়াই করছেন। কখনো বা মৃদুস্বরে কথা বলছেন নিজেদের মধ্যে। সে-কথাবার্তার একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ যে আপনাকে দেওয়া দরকার তা আমি জানি, আর তা আমি দিতামও। তবে মুশকিল হয়েছে এই যে, ভালো করে সব কথা আমার নিজেরই মনে নেই। থাকা সম্ভবও নয়। এটুকুমাত্র মনে আছে যে, মোজা-সেলাই-এর কায়দাকানুন নিয়েই তাঁদের কথাবার্তা হচ্ছিল। আর হ্যাঁ, আরও একটা কথা মনে আছে; তাঁদের মধ্যে একজন একবার শুধু বলেছিলেন যে, আবহাওয়াটা বড্ডো তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে (কৃশাঙ্গী এক ভদ্রমহিলা এ-কথা বলেছিলেন; গায়ে তাঁর শাল-জড়ানো, একটু যেন শীতকাতুরে বলে' মনে হলো আমার; প্রথম আলাপের সময় জেনেছিলাম তাঁর নাম মিস জেমস্)। মিস ব্রেট্ অতঃপর আমাকে এক কাপ চা এগিয়ে দিলেন। ঠিক কী বলে' যে চা-টা আমি নিয়েছিলাম এখন আর আমার মনে নেই। ও হ্যাঁ, মিস্ ব্রেট-এর চেহারাটারও একটা বর্ণনা দেওয়া দরকার। বেঁটে-খাটো চেহারা, স্থূলাঙ্গিনীই বলা যায়; চুল শাদা। আরেক জনের কথা আমার মনে আছে, নাম মিস্ মোব্রে। ইনি কৃশাঙ্গিনী, মাথায় একরাশ রুপোলি চুল। কণ্ঠস্বর অভিজাত, একটু বা উঁচু; গায়ের রং পরিষ্কার। প্রতিটি কথাই

তিনি বেশ জোর দিয়ে বলছিলেন, বেশ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। গাত্রাবাস সম্পর্কে কি-যেন একটা মন্তব্য করলেন; মন্তব্যটা আমার ভালো লেগেছিল। যে-কটি মহিলাকে সেখানে দেখলাম তাঁদের সকলেরই পরনে শাদাসিধে কালো পোষাক। তার মধ্যে, এক মিস্ মোরে বাদে, কারুর পোষাকই তেমন পরিপাটি নয়।

"মিনিট দশেক কথাবার্তার পর আমি উঠে দাঁড়ালাম, এবার বিদায় নেব। কিন্তু সেই বিদায়-মুহূর্তে এমন একটা কথা আমার কানে এল, ওঃ—সে যে কী ভীষণ কথা কেমন করে আপনাকে তা বোঝাই? কথাটার অর্থ এই দাঁড়াচ্ছে যে—নাঃ, কোনও মতেই আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারব না।"

আমি একটু অধৈর্য হয়ে উঠলাম; বললাম, "বলেই ফেলুন না, কী আপনি শুনলেন?"

"শুনলাম—" গম্ভীর গলায় মিঃ শর্টার বললেন, "শুনলাম, মিস মোরে (অর্থাৎ যাঁর রুপোলি চুল) মিস্ জেম্‌স্‌কে (অর্থাৎ সেই শাল-জড়ানো ভদ্রমহিলাকে) এই অদ্ভুত কথাকটি বললেন। কথাগুলি আপনাকে বলছি দাঁড়ান। সেই ভয়াবহ বাক্যসমষ্টিকে আমি সেখানে দাঁড়িয়েই মুখস্থ করে ফেলেছি; তারপর বিপন্মুক্ত হয়েই, পাছে কথাকটি আমি ভুলে যাই, চট্‌পট্ একটা কাগজে টুকে রেখেছি। কাগজটা আমার সঙ্গেই আছে, বার করছি দাঁড়ান—" বলে ভদ্রলোক তাঁর পকেট হাতড়াতে লাগলেন। টুকিটাকি নানাবিধ দ্রব্যাদি বেরুতে লাগল সেখান থেকে; নোট-বই, সার্কুলার, কনসার্টের প্রোগ্রাম ইত্যাদি। তারপর সেই কাগজের টুকরোও বেরুল। সেখানাকে সামনে রেখে মিঃ শর্টার বললেন, "এই যে, পাওয়া গেছে। মিস্ মোরেকে আমি মিস্ জেম্‌স্-এর উদ্দেশ্যে বলতে শুনলাম, 'বিল্, হুঁশিয়ার'।"

একাগ্র দৃষ্টিতে মিঃ শর্টার আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। বেশ কয়েক মুহূর্ত। ভাব দেখে মনে হলো, যা তিনি শুনেছেন সে-সম্পর্কে তাঁর এতটুকুও সন্দেহ নেই। তারপর আগুনের চুল্লীর দিকে আরো একটু ঝুঁকে পড়ে তিনি বলতে শুরু করলেন,—"শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সব যেন আমার তালগোল পাকিয়ে গেল। একজন মহিলা যে আরেকজন মহিলাকে 'বিল্' নামে

সম্বোধন করছেন শুধুমাত্র এইটুকুই অবশ্য অবাক হবার পক্ষে যথেষ্ট। তবে এক্ষেত্রে আমার বিস্ময়ের আরো একটু হেতু ছিল। আগেই বলেছি, অভিজ্ঞতার পরিধি আমার খুব বিস্তীর্ণ নয়। কে জানে, কুমারী-মেয়েদের মধ্যে কী-সব সৃষ্টিছাড়া সম্বোধন-রীতি থাকে! 'বিল্' সম্বোধনে তাই আমি খুব অবাক হইনি; অবাক হলাম মিস্ মোব্রের কণ্ঠস্বর শুনে। মিস মোব্রের কথাবার্তায় যে একটা আভিজাত্যের ছাপ লক্ষ্য করেছিলাম, সেকথা আপনাকে বলেছি। কিন্তু যে-রকম হেঁড়ে গলায় তিনি 'বিল্, হুঁশিয়ার'—বললেন তার মধ্যে সেই আভিজাত্যের নামগন্ধও ছিল না। এ আমি একেবারে শপথ করে বলতে পারি (যদিও শপথ করাটাকে আমি পাপ বলেই গণ্য করে থাকি)। আসলে 'বিল্, হুঁশিয়ার'—এই কথাটির মধ্যেই এমন একটা অকাট্য অশ্লীলতার ছাপ রয়েছে যে, অভিজাত-কণ্ঠে তা বরং বেখাপ্পাই শোনাত।

"ছাতা আর টুপি হাতে নিয়ে আমি দরজার দিকে পা বাড়িয়েছি, ঠিক এমন সময়েই মিস্ মোব্রে উপরোক্ত কথাদুটি উচ্চারণ করলেন। শুনে আমি একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। আরো চমকে গেলাম এই দেখে যে মিস্ জেম্স্ও (অর্থাৎ শাল-গায়ে সেই কৃশাঙ্গী কুমারীটি) নিঃশব্দে গিয়ে দুয়ার আগলে দাঁড়ালেন। তখনও তিনি একমনে সেলাই করে যাচ্ছেন। ভাবখানা এই যেন কিছুই হয়নি। ব্যাপারটাকে প্রথমে কুমারী-মেয়েদের একটা উদ্ভট খেয়াল বলেই আমার মনে হয়েছিল। সেই সঙ্গে এও বুঝেছিলাম যে, সহজে এরা আমাকে যেতে দেবে না।

"তবু বেশ ভদ্রভাবেই আমি মিনতি জানালাম, 'মিস্ জেম্স্, অনুগ্রহ করে দরজাটা একটু ছেড়ে দিন। আপনাকে বিরক্ত করতে হচ্ছে বলে আমি অত্যন্তই দুঃখিত। কিন্তু আমার আর সময় নেই; এক্ষুণি আমাকে আর এক জায়গায় যেতে হবে। দরজাটা একটু—।' আমার কথা তখনও শেষ হয়নি; উত্তরে মিস্ জেম্স্ চাঁছাছোলা ভাষায় যা-একখানা উক্তি করলেন, শুনে আমি থ হয়ে গেলাম। পাছে আবার ভুলে যাই, তাই এ-উক্তিটিকেও আমি কাগজে টুকে রেখেছি। এই যে, দেখুন,—মিস্ জেম্স্ আমাকে বললেন, 'চোপরও বেল্লিক'।

এ-ছাড়াও কী-যেন তিনি বলেছিলেন, আমার ঠিক স্মরণ নেই। তারপর যা শুনলাম, এখনো তা মনে পড়লে আমার প্রাণ উড়ে যায়। একমাত্র মিস্ ব্রেট্‌কেই আমি আগের থেকে চিনতাম; ম্যাণ্টলপীসের পাশেই তিনি দাঁড়িয়েছিলেন; শুনলাম তিনি বলছেন, 'ওহে স্যাম্, বুড়োটাকে একটা বস্তায় পুরে ফেলে তারপর আচ্ছাসে মার লাগাও'।"

একটুখানি দম নিলেন রেভারেণ্ড্ মিঃ এলিস্ শর্টার; তারপর ফের শুরু করলেন, "বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যেন আমার চোখের সামনেই ঘুরপাক খেতে লাগল। এ-কী ভয়াবহ কাণ্ড! বিয়ে-থাওয়া না হলে মেয়েরা কি শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে যায়? এরাও কি সব পাগল হয়ে গেছে? আমি মূর্খ নই, এককালে আমি বিস্তর বইপত্তর পড়েছি (এখন আর চর্চা নেই, বিদ্যেয় মরচে ধরে গেছে); পুঁথিপত্রে পড়া পরী আর ডাইনীদের কিম্ভূত সব আচার-আচরণের কথা আমার মনে পড়তে লাগল। জলপরীদের ওপরে লেখা কী-একটা কবিতার গুটি দুই ছত্র সবে আমার মনে এসেছে, এমন সময়—কী ভয়ানক কাণ্ড—মিস্ মোব্রে হঠাৎ পেছন থেকে হাত বাড়িয়ে আমাকে জাপ্‌টে ধরলেন। আর সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা জিনিস আমি টের পেলাম, মিস্ মোব্রের হাতদুটিতে নারীসুলভ কোমলতা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত। মিস্ মোব্রে মেয়ে নন, পুরুষ।

"ওদিকে মিস্ ব্রেট্, অর্থাৎ মিস্ ব্রেট্-এর ছদ্মবেশধারী ব্যক্তিটিও তৎক্ষণে আমার নাকের ডগায় একটা পিস্তল উঁচিয়ে ধরেছে। মুখে পৈশাচিক হাসি। মিস্ জেম্স্ ওদিকে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁর আচরণেও একটা পৌরুষব্যঞ্জক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি মেঝের ওপর পা ঠুকোচ্ছেন, মাথার টুপিটি এক পাশে হেলে পড়েছে। দেখলাম, মিস্ জেম্স্‌ও একটি ছদ্মবেশধারী পুরুষ, মানে সেই পুরুষটি একটি ছদ্মবেশী মেয়ে। না না, এও বড় গোলমেলে শোনাচ্ছে; অর্থাৎ বুঝলেন কিনা—মিস্‌ই হোক্ আর মিস্টারই হোক্—মোদ্দা কথাটা হলো এই যে, সেই ছদ্মবেশধারী প্রাণীটি একটি পুরুষ-প্রাণী।"

ভাষাতত্ত্বের জটিল জালে জড়িয়ে গিয়ে মিঃ শর্টার খানিকটা বেসামাল হয়ে

পড়লেন; ক্রমেই তাঁর বক্তব্য যেন তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল, "হ্যাঁ, মিস্ মোব্রের কথা বলছিলাম। সেই ভয়ঙ্কর মহিলা—অর্থাৎ কিনা সেই ভয়ঙ্কর পুরুষ—আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। কী তাঁর হাত! হাত তো নয়, লোহা। গলার ওপরেই, বুঝলেন কিনা, আমার একেবারে গলার ওপরেই তাঁর পাঁচ-পাঁচটা আঙুল। চেঁচাতেও পারি না। ওদিকে মিস্ ব্রেট্, অর্থাৎ মিঃ ব্রেট্, অর্থাৎ সেই ছদ্মবেশী পুরুষ—যিনি আর যাই হোন মিস্ ব্রেট্ নন—আমার ওপরে একটা চকচকে পিস্তল উঁচিয়ে ধরেছেন। অপর দুই ভদ্রমহিলা—অর্থাৎ অপর দুই ভদ্রলোক—একটা বস্তার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে প্রাণপণে কী যেন হাতড়াচ্ছেন। ব্যাপারটা ততক্ষণে আমি আঁচ করতে পেরেছি। আসলে এরা গুণ্ডা, আমাকে কোনও ফাঁদে ফেলবার জন্যেই এদের ছদ্মবেশধারণ। কে জানে, হয়তো আমাকে এরা গুম করে রাখবে। কিন্তু কেন? চার্চের এই নিরীহ ধর্মযাজককে লুকিয়ে রেখে কোন পরমার্থ সাধিত হবে এদের? তাহলে কি এরা নাস্তিক?

"যে গুণ্ডাটি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে ছিল, নিস্পৃহকণ্ঠে সে হুকুম দিল, 'ওহে হ্যারি, চটপট্ সারো চাঁদ। বুড়োকে আগে সমঝে দাও ব্যাপারটা; তারপর চলো, ডেরা তুলি।'

"মিস্ ব্রেট্, অর্থাৎ পিস্তলধারী গুণ্ডাটি তাতে বলল, 'থামো দোস্ত, আসল ব্যাপার আর ফাঁস করবার দরকার নেই—'

"দ্বাররক্ষী গুণ্ডা বলল, 'একশোবার আছে। বুড়োকে সব সাফ্‌সুফ্ জানিয়ে দাও; কাজের তাতে সুবিধেই হবে।'

"মিস্ মোব্রে, অর্থাৎ যে গুণ্ডাটি আমাকে পেছন থেকে জাপটে রেখেছিল সে হঠাৎ হেঁড়ে গলায় বলে উঠল, 'বিল্ ন্যায্য কথাই বলেছে; ও যা বলেছে একেবারে হক্ কথা। ওহে হ্যারি, ছবিটা একবার নিয়ে এসো ত?'

"আগেই বলেছি, দুজন গুণ্ডা আবার ঘরের এক কোণে বসে একটা বস্তার মধ্যে কি-যেন হাতড়াচ্ছিল; পিস্তলধারী গুণ্ডাটি তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই তারা তার হাতে কী-একটা জিনিস তুলে দিল। সেটি নিয়ে সে আবার ফিরে

এল আমার কাছে, আমার চোখের সামনে সেই নকল জিনিসটিকে তুলে ধরল। যা দেখলাম তাতে আর আমার বাক্‌স্ফূর্তি হলো না।

"দেখলাম, তার হাতে আমারই একটা ফটোগ্রাফ। হ্যাঁ আমারই চেহারা, কিছুমাত্রও ভুল নেই তাতে। আপনি ভাবছেন, এতে এত অবাক হবার কি আছে। ভাবছেন, গুণ্ডারা নিশ্চয়ই আগে থাকতে আমার একখানা ফটো হাতিয়ে রেখেছে। কেমন, তাই না? তা যদি হতো, তাহলে তো আর চিন্তাই ছিল না। ফটোটার একটা বর্ণনা দিই। বাগানের মধ্যে বেশ কায়দা করে আমি বসে আছি, হাতের চেটোয় থুতনি রেখে মৃদুমৃদু হাস্য করছি,—এই হলো ফটোখানার বিষয়বস্তু। দেখলেই বোঝা যাবে, ও ফটো অতর্কিতে কিম্বা আমার অজ্ঞাতে তোলা হয়নি; বেশ করে আমি পোজ্‌ দিয়ে বসেছি, তবেই তোলা হয়েছে। অথচ মজা এই যে, কস্মিনকালেও আমি অমন পোজ্‌ দিয়ে ফটো তোলাইনি।

"বোকার মতো আমি সেই ফটোখানার দিকে তাকিয়ে রইলাম। দেখলাম, সামান্য একটুখানি তাতে টাচ্‌-আপ করা হয়েছে; বাঁধানো ফটো, কাঁচের জন্যে একটু চকচকে দেখাচ্ছে। এ ছবি যে আমার তাতে কোনও সন্দেহ নেই; এ আমারই ছবি, এ আমিই। আমারই মুখ, আমারই চোখ, আমারই নাক, আমারই হাত,—এ যা দেখছি এর সবকিছুই আমার; এ আমিই। অথচ কস্মিনকালেও যে আমি এ ছবি তোলাইনি তা-ও ঠিক।

"কতক্ষণ যে তাকিয়েছিলাম জানি না; পিস্তলধারী হঠাৎ ব্যঙ্গের গলায় বলে উঠল, 'নে ব্যাটাচ্ছেলে, এবার একটা ভেলকি ছাখ্‌'। বলেই সে ফটোর উপর থেকে তার কাঁচখানাকে সরিয়ে নিল। দেখলাম যে, কাঁচখানার ওপরে ধপ্‌ধপে শাদা একজোড়া গোঁফ আর একটা কলার আঁকা রয়েছে। কাঁচ আর নীচের ফটো—এই দুইয়ে মিলিয়ে একখানা পুরো ছবি তৈরী হয়েছিল; কাঁচা সরে যেতেই ফটোখানার যেন চেহারা পালটে গেল। দেখলাম, আসলে সেটা এক বুড়ীর ছবি; কালো পোষাক-পরা থুরথুরে এক বুড়ী, হাতের চেটোর উপর থুতনি রেখে মৃদুমৃদু হাস্য করছে। বুড়ী ঠিক আমারই মতো দেখতে, দুজনের চেহারায়

আশ্চর্য সাদৃশ্য। আর সেই সাদৃশ্যটাকে একেবারে পাকাপাকি করে তোলবার জন্তেই ফ্রেমের কাচের ওপর শ্মশ্রু গোঁফ আর কলায় এঁকে দেওয়া হয়েছে।

"পিস্তলধারী সেই গুণ্ডা, নাম তার হ্যারি, পুনশ্চ কাচখানাকে সেই কটোর উপরে এঁটে দিল; দিয়ে বলল, 'কেমন, খুব মজা লাগছে বুঝি? চেহারার মিলটা একবার চেয়ে ছাখ্। তোর সঙ্গে কিনা একটা বুড়ীর চেহারার মিল! বুড়ীও ধন্ত হ'ল, তুইও ধন্ত হলি, আমরাও ধন্ত হলাম। হ্যাঁ, এবারে কাজের কথা শোন্। এ অঞ্চলে কর্ণেল হুকার ব'লে এক ভদ্রলোক থাকেন, তুই তো তাঁকে চিনিস?'

"মাথা নেড়ে জানালাম যে চিনি।

"হ্যারি বলল, 'এই যে বুড়াকে দেখছিস, এ হলো সেই কর্ণেলের মা। ওঃ, মাকে সে খুব ভালবাসে, খু-উব।'

"হ্যারির কথা তখনও শেষ হয়নি, দরজার কাছ থেকে বিল্ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'আঃ হ্যারি, বাজে কথায় সময় নষ্ট করো না, কাজের কথাটা বলে ফ্যালো চট্‌পট্। শোনো হে রেভারেণ্ড, আমরা তোমার এতটুকুও ক্ষতি করতে চাই না। বরং, যা তোমাকে করতে বলা হবে তা যদি তুমি ঠিকঠাক করে দাও তো তার জন্তে তোমাকে এক গিনি বক্‌শিশ দিতেও আমরা রাজী। ও হ্যাঁ, মেয়েদের পোষাক! তা, তাতে কি হয়েছে? সে পোষাকে তোমাকে চমৎকার মানাবে।'

"বিলের কথা তখনও শেষ হয়নি; পেছন থেকে যে আমাকে জাপটে রেখেছিল সে হঠাৎ ধম্‌কে উঠল বিল্‌কে, 'থামো বাপু, এখনো পর্যন্ত তুমি কথা কইতেই শিখলে না। এস হে শর্টার, আমিই তোমাকে বুঝিয়ে বলছি ব্যাপারটা। এই যে কর্ণেল হুকারএর কথা হচ্ছিল, আজ রাত্তিরেই তার সঙ্গে আমরা একবার মোলাকাৎ করতে চাই। হয়তো বা আমাদের দেখে সে খুশীই হবে, আদর করে শ্যাম্পেন খাওয়াবে। আবার এমনও হতে পারে যে সে মোটেই খুশী হবে না আমাদের দেখে, এবং শ্যাম্পেনও খাওয়াবে না। চাই কি তাকে আমরা খুনও করতে পারি; আবার এমনও হতে পারে যে, খুন করবার কোনও দরকারই হলো না। তা সে যাই হোক্, মোদ্দা কথাটা হচ্ছে দেখা আমাদের করতেই হবে। এখন

মুশকিল হলো এই, ভয়ের চোটে সারা রাত্তির সে খিল এঁটে ঘুমোয় ; কাউকেই সে দরজা খুলে দেয় না। কেন যে তার এই ভয়—একমাত্র আমরাই তা জানি ; সেই সঙ্গে এও জানি যে, একমাত্র তার মা'কেই সে দরজা খুলে দেবে। শুনতে তোমার অবাক লাগবে, তা সত্ত্বেও বলি—তুমিই হচ্ছো তার মা।'

"ওদিক থেকে বিল্ তার মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক, তুমিই তার মা। আর আমিই তা আবিষ্কার করেছি। কর্ণেল হুকার-এর মা-জননীর ছবিখানা যখন আমি দেখলাম, তখুনি আমি বলে দিয়েছিলাম যে, এ হচ্ছে বুড়ো শর্টার ; হ্যাঁ, বুড়ো শর্টার।'

"ভয়ে আমি কাঁটা হয়ে গেলাম। কি চায় এরা, কী চায়! রুদ্ধকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলাম, "কি তোমরা চাও ?'

"পিস্তলধারী শয়তান বলল, 'কি চাই, সেই কথাই তো বলছি। ওই যে দেখছ মেয়েদের একগাদা কাপড়-জামা পড়ে রয়েছে ঘরের কোণে, যাও—চট্‌পট্ ওগুলোকে পরে ফ্যালো।'

"মিঃ হুইনবার্ণ, অতঃপর কি ঘটলো—বলতে আমার লজ্জাবোধ হচ্ছে। আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, সহজেই আমার অবস্থাটা আপনি অনুমান করতে পারেন। বিবেচনা করুন, পাঁচ-পাঁচটা গুণ্ডা, আর সেই সঙ্গে একটা উদ্যত পিস্তল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার চেহারা পাল্‌টে গেল। একটা থুর-থুরে বুড়ী সেজে—অর্থাৎ কিনা কর্ণেল হুকারের মা'র ছদ্মবেশে—রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হলো আমাকে ; সঙ্গে সেই গুণ্ডার দল, তারাও মহিলাবেশী। কোথায় কোন্ পাপকার্যে যে এরা আমাকে টেনে নিয়ে চলেছে, কিছুই আমার বোধগম্য হলো না।

"পথে যখন বেরুলাম, গোধূলির নির্জন পদসঞ্চারে তখন আসন্ন রাত্রির আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। রাত্রি নামছে। কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে, রাস্তা নির্জন। কর্ণেল হুকার-এর আস্তানায় চলেছি আমরা ; কে জানে তা কোথায়। ছ'জনে আমরা পথ হাঁটছি, দেখে মনে হবে—সম্ভ্রান্ত ছ'জন মহিলা। কালো পোষাক, মাথায় পুরনো-ধাঁচের টুপি। আসলে যে আমরা মহিলা নই, পাঁচটি গুণ্ডা আর একটি পাত্রী, কারুরই তা বুঝবার জো নেই।

"আর বেশীক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না, ব্যাপারটা এবার সংক্ষেপে বলছি। ততক্ষণে আমি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছি বললেও চলে। সারাক্ষণ শুধু একটিই মাত্র চিন্তা আমার মাথায়,—কি করে পালানো যায়, কী করে। চিৎকার করে যে কাউকে ডাকব তারও উপায় নেই, শয়তানরা তাহলে আমাকে ছিঁড়ে ফেলবে। হয়তো ছোরা মারবে, খুন করে আমার লাশটাকে হয়তো একটা খানাখন্দে ফেলে রাখবে। ভাবতেই আমি শিউরে উঠলাম। কি করা যায় তাহলে? পথচারীদের কারুর দৃষ্টি আকর্ষণ করব? বুঝিয়ে বলব সমস্ত ব্যাপারটা? পাকেচক্রে ব্যাপারটা এখন এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, সে-কাজটাও খুব সহজসাধ্য হবে না। আমার সঙ্গীরা হয়তো তাদের বলবে, মদ টেনে আমি বেসামাল হয়ে পড়েছি, আমার এখন মাথার ঠিক নেই। কিম্বা আমাকে পাগল বলেই চালিয়ে দেবে হয়তো। হঠাৎ এই শেষ সম্ভাবনাটির মধ্যেই আমি মুক্তির একটি ক্ষীণ ইঙ্গিত দেখতে পেলাম। একটিই মাত্র উপায় রয়েছে এখন, সে উপায় ভয়াবহ। পাগল কিম্বা মাতালই সাজতে হবে আমাকে। ধর্মযাজককে শেষে মাতাল সাজতে হবে? কি করব, উপায়ান্তর নেই।

"চুপচাপ আমি পথ চলতে লাগলাম। সঙ্গীরা সব মেয়েলী ছন্দে পথ হাঁটছে, সেই সঙ্গে আমিও। আর অনবরত খালি সুযোগ খুঁজছি, কতক্ষণে জনমনিষ্যির সন্ধান পাওয়া যায়। অবশেষে সেই সুযোগ এল। দূরে একটি ল্যাম্পপোস্ট, তার নীচে এক কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। ততক্ষণে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। চুপচাপ এগোতে লাগলাম, তারপর—যেই আমরা সেই কনস্টেবলটির কাছে এসে পৌঁছেছি—হঠাৎ আমি একেবারে মাতালের মতো টলতে টলতে সেই রাস্তার ধারের রেলিং-এর ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম; আর পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগলাম সেই সঙ্গে, 'হুররে! হুররে! হুররে! রুল ব্রিটানিয়া! চুল ছাঁটাও! হপ্ লা! ব্যু!' বিবেচনা করুন, নিরীহ একজন ধর্মযাজক আমি, দায়ে ঠেকে আমাকে তখন মাতলামির অভিনয় করতে হচ্ছে।

"যা ভেবেছিলাম। তৎক্ষণাৎ কনস্টেবলটি আমার দিকে লণ্ঠন উচিয়ে ধরল, তীব্রকণ্ঠে শুধোল, 'কি হচ্ছে এসব? ব্যাপারটা কি?'

"আর ঠিক আমার পাশেপাশেই হাঁটছিল, তারও পরনে মহিলার ছদ্মবেশ। সে শুধু আমার কানে কানে বলল, 'টু শব্দটি করো না, চুপচাপ আমাদের সঙ্গে চলে এসো ; নইলে তোমার জান্ খেয়ে ফেলব উল্লুক।' চেয়ে দেখি তার আপাত-নিরীহ চোখদুটি যেন বীভৎস ক্রোধে জলছে।

"কিন্তু ঐ যে বললাম, ততক্ষণে আমি মনস্থির করে ফেলেছি। পাঁড়-মাতালের মতো আমি হাই তুলতে লাগলাম। শুরুই যখন করেছি তখন এর শেষ দেখে ছাড়ব। মুখে গাঁজলা তুলে অশ্লীল সব ছড়া কাটতে লাগলাম, আর টলতে লাগলাম সারাক্ষণ।

"কনস্টেবলটি আমাকে নিরীক্ষণ করল দুচার মুহূর্ত, তারপর আমার সঙ্গীদের বলল, 'আপনাদের এই বন্ধুটির তো দেখছি টাল্‌মাটাল অবস্থা। ভালোয় ভালোয় যদি একে বাড়ী নিয়ে যেতে পারেন তো আমার আপত্তি নেই। কিন্তু এই রকমই যদি ইনি হল্লা করতে থাকেন তো বাধ্য হয়েই আমার এঁকে হাজতে নিয়ে যেতে হবে। দেখে মনে হচ্ছে আপনারা ভদ্রঘরের মেয়ে, কিন্তু কি করি বলুন, আমার উপায় নেই।'"

"কনস্টেবলের উক্তি শুনে তত্‌ক্ষণাৎ আমি আমার মাতলামির মাত্রাটাকে আরও চড়িয়ে দিলাম কয়েক ডিগ্রী ; যতো রাজ্যের সব অশ্লীল কথা, অশ্লীল গান—কোনটাই আর আমি বাদ দিলাম না।

"বিল্-এর দিকে তাকিয়ে দেখি নিরুপায় ক্রোধে সে দাঁত ঘষছে ; অন্যদিকে ফিস্‌ফিস্ করে আমাকে বলল, 'খুব চ্যাচাচ্ছ এখন ;—তা চ্যাচাও, পরে আরো চ্যাচাতে হবে। একবার ছাড়া পেলে হয়, গন্‌গনে আগুনের চুল্লীতে তোমাকে ঝল্‌সে মারবো ; ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ো তখন।' "

"প্রাণের দায়ে তখন আমি মাতলামি করছি। আমার সামনে মহিলাবেশী সেই শঙ্কদস্যু ; নিরুপায় নিষ্ঠুরতায় সারা মুখ তাদের বীভৎস হয়ে উঠেছে। পারলে তারা আমাকে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। মনে হলো যেন এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন এই পাঁচ শয়তানের মধ্যে এসে মূর্তিলাভ করেছে।

"পরণীদের বেশভূষার আভিজাত্য লক্ষ্য করে কনস্টেবলটি যেন একটু দোমনা হয়ে পড়েছে মনে হলো। কে জানে, হয়তো বা সে আমাদের ছেড়েই দেবে। তাহলে তো সর্বনাশ। আমি আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করলাম না, বিকটস্বরে চেঁচিয়ে উঠলাম হঠাৎ, 'কোথায় বাবা সোনার চাঁদ', আর তারপরেই বিদ্যুদ্বেগে সামনে ছুটে গেলাম, মাথা বাঁকিয়ে সেই কনস্টেবলটির পেটে এক নিদারুণ গুঁতো বসিয়ে দিলাম। উঃ, ভেতরে ভেতরে লজ্জায় ক্ষোভে যেন আমার মাথা কাটা যেতে লাগল; চার্চের এক ধর্মযাজক আমি, আমার কিনা এই কাণ্ড! কিন্তু কি করব বলুন, আমি তখন নিরুপায়। একমাত্র এই মাতলামির অভিনয়ই আমাকে বাঁচাতে পারে তখন।

"আর তা বাঁচালও। গুঁতো খেয়ে কনস্টেবলটি আমার টুঁটি টিপে ধরল; বলল, 'নাঃ, কোনও মতেই আর একে ছেড়ে দেওয়া চলে না। হাজতেই নিয়ে যেতে হবে—।' আমি তো তা-ই চাই।

"ওদিকে আরেক গেরো। বিল্ হঠাৎ মেয়েলী সুরে অনুনয় সুরু করল কনস্টেবলটির কাছে, 'দেখুন, এ নিয়ে আর ফ্যাশাদ বাধাবেন না। খুবই বড় ঘরের মেয়ে ইনি; মদটা অবশ্য একটু বেশীই খান—কিন্তু, বিশ্বাস করুন, আসলে ইনি খুবই সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়ে। এঁকে যদি এখন হাজতে নিয়ে যান তো জানাজানি হয়ে গেলে টি-টি পড়ে যাবে চারদিকে; লজ্জায় আর এঁর মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না। হাতজোড় করে বলছি, দয়া করে এঁকে ছেড়ে দিন; আমরাই বরং এঁকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি।'

"কনস্টেবলটি ঘোঁৎঘোঁৎ করতে লাগল। বলল, 'কি করে ছাড়ি? যেভাবে ইনি আমাকে গুঁতিয়ে দিয়েছেন তাতে আর এঁকে ছাড়া যায় না। ছাড়া পেলেই হয়তো আবার অন্য কাউকে গুঁতোতে আরম্ভ করবেন।'

"স্যাম বলল, 'কি জানেন, ওঁর মাথায় একটু ছিট আছে। দয়া করে ওঁকে আপনি ছেড়ে দিন।'

"বিল্ও আবার তার অনুনয়-বিনয় আরম্ভ করল, 'দয়া করে ওঁকে ছেড়ে দিন কনস্টেবল সাহেব; ওঁকে আমরা বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি। তা ছাড়া ওঁর দেখাশোনা করবার জন্যেও একজন লোক দরকার—'

"কনস্টেবলটি বলল, 'নিশ্চয়ই দরকার ; তা সে-জন্যে আর ভাবনা কি, আমিই তো রইলাম—'

"বিল্ নাছোড়বান্দা। সে বলল, 'তা কি করে হয় ? বন্ধুদের সঙ্গে থাকলেই উনি সুস্থ হয়ে উঠবেন, ওঁকে আপনি ছেড়ে দিন। তা ছাড়া বাড়ি গিয়ে ওঁকে ওষুধ খাওয়াতে হবে, সে ওষুধ একমাত্র আমাদের কাছেই আছে ; দয়া করে ওঁকে ছেড়ে দিন।'

"মিস মোত্রেও বললেন, 'ঠিক কথা ; অন্য ওষুধে কাজ হবে না। ছেড়ে দিন, ওঁকে আমরা বাড়ি নিয়ে যাই।'

"বুঝলাম, একবার যদি সুযোগ হারাই তো আমার রক্ষে নেই। আবার তাই মাতলামি আরম্ভ করলাম। জড়িয়ে জড়িয়ে বলতে লাগলাম, 'কেন ঘাবড়াচ্ছ বাবা, বেশ তো রয়েছি ; ট্রা লা লা লা লা—ওফ্।'

"কনস্টেবলটি আমার সঙ্গীদের ওপর তার লণ্ঠনের আলো ফেলে কঠিন গলায় বলল, 'না, ইনি বদ্ধমাতাল ; ছেড়ে দেওয়া চলবে না। দেখুন, আপনাদের এই বন্ধুটির আচরণ অত্যন্তই আপত্তিজনক। তা ছাড়া যে সমস্ত অশ্লীল গান ইনি গাইছেন তাও আমার খুব ভাল ঠেকছে না। সত্যি বলতে কি, আপনাদের দেখেও আমার সন্দেহ হচ্ছে। কে আপনারা, সত্যি কথা বলুন—'

"মিস মোত্রে দেখলেন, সর্বনাশ ; বেশীক্ষণ ঝুলোঝুলি করলে তাঁরাও শেষে প্যাঁচে পড়ে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গেই কণ্ঠস্বরে সেই অপূর্ব আত্মমর্যাদার ভঙ্গীটিকে ফুটিয়ে তুলে তিনি বললেন, 'কে আমরা জিজ্ঞেস করছেন ? আমরা ধর্মযাজিকা। সঙ্গে আমাদের পরিচয়পত্র নিয়ে আসিনি, নইলে আপনাকে দেখাতে পারতাম। আর হ্যাঁ, মনে রাখবেন, মহিলাদের সম্মানরক্ষাই আপনার কাজ ; অযথা তাঁদের অপমান করবার সামান্যতম অধিকারও আপনার নেই। আমাদের এই বন্ধুটিকে আপনি বাগে পেয়েছেন ; বেশ, এঁকে আপনি হাজতে নিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদেরকেও যদি আপনি চোখ রাঙাতে আসেন তো পরিণামে আপনাকে পস্তাতে হবে। চাকরী নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে আপনার, দয়া করে সেটা মনে রাখবেন।'

"মিস্ মোরের এই সুদৃঢ় উক্তি শুনে কনস্টেবলটি একটু বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সেই সুযোগে আমার ছদ্মবেশী সঙ্গীরা একবার তাকালেন আমার দিকে। ক্রোধের আগুনে চোখ তাঁদের ধক্‌ধক্ করছে দেখলাম। পরমুহূর্তেই তাঁরা স্থানত্যাগ করলেন। জানতাম, শেষ পর্যন্ত তাঁরা সরে পড়বেন। কনস্টেবলটি যখন সন্দিগ্ধভাবে তাদের ওপর লণ্ঠনের আলো ফেলেছিল, তখনই তাদের মধ্যে একবার নীরব দৃষ্টিবিনিময় ঘটতে দেখি। সে দৃষ্টির অর্থ—এবার সরে পড়াই ভালো।"

অবাক বিস্ময়ে আমি শুনতে লাগলাম মিঃ শর্টারের সেই অপূর্ব কাহিনী। একটুখানি চুপ করে থেকে পুনশ্চ তিনি সুরু করলেন, "গুণ্ডারা সরে পড়ল। তখন আবার আমার আর-এক চিন্তা ; প্রথম ফাঁড়াটা তো কাটল, এবারে আমার কর্তব্য কী। গুণ্ডারা যতক্ষণ কাছে ছিল, মাতলামির ছদ্মবেশটাকে ত্যাগ করতে আমি সাহস পাইনি। কেননা, কনস্টেবলটি আমার সাধুকথায় কর্ণপাত করত কিনা সন্দেহ। আসল ব্যাপারটা যদি তখন তাকে বুঝিয়ে বলতে যেতাম তো সূত্রপাতেই সে ধরে নিত যে, আমি বোধ হয় খানিকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠেছি ; অতঃপর পুরো-বক্তব্য না শুনেই সে আমাকে আমার সঙ্গীদের হাতে সমর্পণ করত। এখন আর সে-ভয় নেই। সঙ্গীরা সরে পড়ছে ; এবারে হয়তো তাকে সব কথা বুঝিয়ে বলতে পারি।

"স্বীকার করতে লজ্জা নেই মিঃ সুইনবার্ণ, সে সাহসও আমার হলো না। কেন হলো না বলছি। বহু বিচিত্র ব্যাপারই ঘটে থাকে আমাদের জীবনে, অবস্থাগতিকে একজন ধর্মযাজককেও যে মাতলামির অভিনয় করতে হতে পারে তাতেই বা এমন অবাক হবার কি আছে। মজা হচ্ছে এই যে, সেই বিচিত্র ব্যাপারগুলো কিছু আখছার ঘটে না। ফলে সাধারণ মানুষের চোখে তা একটু অস্বাভাবিকই ঠেকে। তা যদি হয় তো বড় মুশকিলের কথা। কোন সাহসে কনস্টেবলটির কাছে আমি আত্মপরিচয় প্রকাশ করি? কে জানে, আমার এই মাতলামির কথাটা হয়তো জানাজানি হয়ে যেতে পারে। কে জানে, সেটা যে আমার শুধুই মাত্র অভিনয়—কজনে তা বিশ্বাস করবে।

"রাস্তার উপর গড়াগড়ি খেতে খেতে এবম্প্রকার চিন্তা করছি, কনস্টেবলটি

আমাকে ঘাড় ধরে টেনে তুলল। আমিও আর কথা বাড়ালাম না, টলতে টলতে তার সঙ্গে পথ হাঁটতে লাগলাম। চলার মধ্যে এমন একটা দুর্বল টালমাটাল ভঙ্গী ফুটিয়ে তুললাম যে, কনস্টেবলটির ধারণা হলো—অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে আমি কাহিল হয়ে পড়েছি। ভাবল, পালানো আমার পক্ষে অসম্ভব; আলতোভাবে সে তাই আমার একটি হাত ধরে রাখল মাত্র। হাঁটতে হাঁটতেই আমরা কয়েকটি বাঁক অতিক্রম করে এলাম। প্রথম বাঁক, দ্বিতীয় বাঁক, তৃতীয় বাঁক, চতুর্থ বাঁক। বাস্, চতুর্থ বাঁকে পৌঁছেই আচমকা আমি আমার হাতখানাকে এক ঝটকায় তার শিথিল মুঠির থেকে ছিনিয়ে নিলাম, বিদ্যুদ্বেগে দৌড় লাগালাম সামনের দিকে। কনস্টেবলটি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেল। সে বোধ হয় স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি, এইভাবে আমি ছুট লাগাব। আর কি সে আমার নাগাল পায়। একেই তো সে মোটা, তার ওপরে পথটাও বেশ অন্ধকার। চোখকান বুজে দৌড়তে লাগলাম আমি। মিনিট পাঁচেক দৌড়েই বুঝলাম; ব্যবধানটা বেশ দীর্ঘ হয়ে এসেছে। আধ ঘণ্টাটাক পরে পথ ছেড়ে আমি মাঠে নেমে পড়লাম! উপরে নক্ষত্রখচিত আকাশ;—আঃ, বুক ভরে আমি মুক্তির নিশ্বাস নিলাম। মাটিতে একটা গর্ত খুঁড়লাম তারপর, ছদ্মবেশটাকে নিক্ষেপ করলাম তার মধ্যে। গাউন আর টুপি—সবকিছুকে সেখানে আমি গোর দিয়ে এসেছি।"

মিঃ শর্টারের কাহিনীর এইখানেই ইতি। গল্প শেষ করে তিনি চেয়ারটাতে বেশ হেলান দিয়ে বসলেন। এই অদ্ভুত কাহিনী এবং বক্তার চমকপ্রদ বাচনভঙ্গী—দুয়েতেই আমি অভিভূত হয়ে পড়লাম। ভদ্রলোকের হাবভাব একটু মিনমিনে সন্দেহ নেই, তবে তিনি যথেষ্ট আত্মমর্যাদাসম্পন্ন। তা ছাড়া বিপদের মুহূর্তে তিনি যে সাহস এবং উপস্থিত-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তাও প্রশংসার যোগ্য। একটুবা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলতে ভালবাসেন; তা হোক,—তবু বলব, তাঁর কথাবার্তায় একটা প্রত্যয়বাচক ভঙ্গী উপস্থিত।

বললাম, "তাহলে এখন—"

"তাহলে এখন—" সামনের দিকে ঝুঁকে বসলেন মিঃ শর্টার, আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "তাহলে এখন সেই যে কর্নেল হকার—তাঁর কথাটা একবার

ভাবুন। না জানি কী আছে তাঁর অদৃষ্টে। গুণ্ডারা যা বলেছিল তা কি সত্যি? সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক, কর্নেল হুকার-এর যে একটা বিপদ ঘনিয়ে এসেছে তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। সরাসরি আমি পুলিসে খবর দিতে পারতাম, অথচ বর্তমান অবস্থায় তাও আমার পক্ষে অসম্ভব। তা ছাড়া পুলিস যে আমার কথা বিশ্বাস করবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়। কী করা যায় তাহলে? মিঃ সুইনবার্ণ, যা হোক একটা উপায় বাৎলান।"

পকেট থেকে আমি আমার ঘড়িটা বার করলাম; সাড়ে বারোটা বাজে।

বললাম, "আমার এক বন্ধু আছেন, নাম বেসিল গ্র্যান্ট। এ সব ব্যাপারে তাঁর চমৎকার মাথা খোলে। আজ একটা ডিনারের নেমন্তন্ন ছিল আমাদের। আমার তো আর যাওয়া হলো না, তিনিও হয়তো এতক্ষণে ফিরে এসেছেন। চলুন, তাঁর ওখানেই যাওয়া যাক। আপনার কোনও আপত্তি নেই তো?"

"কিছুমাত্র না।" শালটাকে ঠিকমতো বিন্যস্ত করতে করতে বিনীত ভঙ্গীতে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ শর্টার।

রাস্তায় বেরিয়ে একটা ফিটন নেওয়া হলো, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ল্যাম্বেথে গিয়ে পৌঁছুলাম। বেসিল যে বাড়িটায় থাকে তার কাঠের সিঁড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। দরজার বাইরে থেকেই দেখলাম, বেসিলের শাদা শার্ট আর ঝলমলে ফার-কোটটা একটা কাঠের তেপায়ার উপর ছড়িয়ে পড়ে আছে। বেসিল এখন শুতে যাবে, শোবার আগে বার্গাণ্ডির গেলাশে চুমুক দিচ্ছে। বুঝলাম যে, বেশ কিছুক্ষণ আগেই সে ডিনার থেকে ফিরেছে।

বেসিলের একটা মস্ত বড় গুণ, কখনোই সে অধৈর্য হয়ে পড়ে না। বেশ শান্তভাবেই সে আগাগোড়া মিঃ শর্টারের সেই অপূর্ব কাহিনীটি শুনল। তারপর নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রশ্ন করল, "মিঃ শর্টার, ক্যাপ্টেন ফ্রেজারকে আপনি চেনেন?"

এ আবার কি অবান্তর প্রশ্ন! বাঁদরবিশেষজ্ঞ ক্যাপ্টেন ফ্রেজার, যাঁর সম্মানার্থে সেই বিধবা ভদ্রমহিলা আজ এক ডিনার-পার্টির আয়োজন করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে এর সম্পর্ক কোথায়! তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমি বেসিলের দিকে তাকালাম। মিঃ

শর্টারের দিকে তখন আর আমার মনোযোগ নেই ; শুধু তাঁর খলিত-দুর্বল জবাবটা আমার কানে এল,—"না তো, ও নামে কাউকেই আমি চিনি না।"

বেসিল যেন একটু কৌতুক বোধ করল। জবাব শুনে, না মিঃ শর্টারের বিভ্রান্তভাব দেখে, বলতে পারি না। বড় বড় নীলাভ চক্ষু দুটি মেলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে মিঃ শর্টারকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তারপর ফের জিজ্ঞেস করল, "চেনেন না ? সে কি ? ঠিক বলছেন তো ?"

"সত্যি বলছি তাঁকে আমি চিনি না।" কাতরকণ্ঠে ধর্মযাজক মিঃ শর্টার জবাব দিলেন। এমনই একটা ত্রস্ত ভয় তাঁর কথার মধ্যে ফুটে উঠল যে, আমি তাতে অবাক হয়ে গেলাম।

বেসিল আর বাক্যব্যয় করল না, চট্‌পট্ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "বেশ উত্তম কথা। এবার তাহলে তদন্ত আরম্ভ করা যাক, কেমন ? চলুন, প্রথমেই যাওয়া যাক ক্যাপ্টেন ফ্রেজারের কাছে।"

"কখন যাব ?" আমতা আমতা করে মিঃ শর্টার প্রশ্ন করলেন।

ফার-কোটের হাতার মধ্যে হাত গলিয়ে দিতে দিতে বেসিল বলল, "এক্ষুনি, এই মুহূর্তে।"

জবাব শুনে সেই বৃদ্ধ ধর্মযাজক যেন ভেঙে পড়লেন একেবারে, ভাঙা-ভাঙা গলায় বললেন, "তার কি কোনও দরকার আছে ? সেখানে গিয়ে কোনও লাভ হবে বলে মনে হচ্ছে না।"

ফার-কোটটা ছেড়ে ফেলল বেসিল, সেটাকে পুনশ্চ সেই তেপায়ার উপরে নিক্ষেপ করল।

তারপর বলল, "বেশ, ক্যাপ্টেনের কাছে তাহলে না-ই গেলাম। তবে তার একটা সর্ত আছে। সর্তটা হল এই যে, আপনার ওই ধপধপে গোঁপজোড়াটি আমার চাই।"

প্রস্তাব শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। বেসিল বলে কী! বুঝলাম, আবার সেই সর্বনাশ ঘটেছে। বেসিলের সাহচর্য অবশ্য সকলসময়েই বেশ উদ্দীপনাময়, একটুকুও সন্দেহ নেই তাতে ; তবে সেই সঙ্গে একথাও আমার মনে হয়েছে যে,

সে-উত্তীর্ণনা যুক্ত-যুক্তিকতার একেবারে শেষ সীমানায় অবস্থিত। যুক্তি-জিজ্ঞাসার যে সীমান্তে তার কল্পনা বাসা বেঁধেছে, তার ঠিক অব্যবহিত পরের ধাপেই সমস্ত যুক্তি-জিজ্ঞাসার অবসান ; উন্মত্ততার সীমানা আরম্ভ। যে কোনও মুহূর্তেই এদিক-ওদিক হয়ে যেতে পারে, আর তাহলেই সর্বনাশ। এর আগেও বেসিলের কথাবার্তায় কখনো কখনো উন্মত্ততার এই অনিবার্য লক্ষণ আমি লক্ষ্য করেছি, তাতে বিষণ্ণ বোধ করেছি। এ উন্মত্ততা যে-কোনও মুহূর্তে দেখা দিতে পারে ; মাঠে কিংবা কিচেনে, সূর্যাস্তের সময় কিংবা ধূমপানের নিশ্চিন্ত অবসরে। আবারো তার পায়ের ধ্বনি শুনতে পেলাম। পাগল হয়ে গেছে—হতভাগ্য মিঃ শর্টারকে যখন একটা সদ্যুক্তি দেবার সময় সমাগত, সেই চূড়ান্ত মুহূর্তেই বেসিল গ্র্যান্ট পাগল হয়ে গেছে।

বেসিলের চোখের দিকে তাকালাম। অস্বাভাবিক দুই চোখ, বিস্ময়ে বিস্ফারিত। পায়ে পায়ে সে সামনে এগিয়ে এল, চেঁচিয়ে উঠল তারপর, "দিন, গোঁফজোড়াটি দিন ; শুধু গোঁফ নয়, ওই টাক্‌টাও দিন—"

আতঙ্কে পিছিয়ে গেলেন বৃদ্ধ ধর্মযাজক। আমি আর সময় নষ্ট করলাম না ; দুজনের ঠিক মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। বললাম, "বেসিল, তুমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছ। চুপচাপ একটু জিরোও তো ভাই, নাও—ওই বার্গাণ্ডিটুকু খেয়ে নাও তো আগে। কথা শুনবে না ভাই ?"

উত্তরে সে কঠিন কণ্ঠে বলল, "গোঁফ চাই, গোঁফ।"

বলে সে আর অপেক্ষা করল না, ঝাঁপিয়ে পড়ল মিঃ শর্টারের দিকে। বেগতিক দেখে মিঃ শর্টারও বুঝি দরজার দিকে দৌড় লাগাচ্ছিলেন, বেসিল তার পথ আটকে দাঁড়াল। ব্যাপারটাকে একটু তলিয়ে বুঝবার আগেই দেখি, ঘরখানা যেন কুরুক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। চেয়ার উল্টে, টেবিল ভেঙে, পর্দা ছিঁড়ে, বাসন ভেঙে সে-এক লগকম্প কাণ্ড। তবুও শ্রান্তি নেই বেসিলের, তখনো সে মিঃ শর্টারের টুঁটি টিপে ধরবার চেষ্টা করছে।

সেই উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খলার মধ্যেও অদ্ভুত একটা জিনিস চোখে পড়ল আমার ; বিস্ময় তাতে বেড়েই গেল। বৃদ্ধ ধর্মযাজক রেভারেণ্ড মিঃ এলিস্‌ শর্টারের আচরণে যেন পূর্বেকার সেই বার্ধক্যভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে না। ঠিক এমনটা আমি আশা

করি নি। বেসিলের সঙ্গে সঙ্গে তিনিও বেশ সমানেই পাল্লা দিয়ে চলেছেন। যে রকম ভঙ্গিগতিতে তিনি ঘরময় ছুটোছুটি হুটোপুটি করছেন, লাফাচ্ছেন, ঝাঁপাচ্ছেন, —একমাত্র ছেলেছোকরাদের পক্ষেই তা সম্ভব। তা ছাড়া মুখ দেখে মনে হলো, বেসিলের আচরণে তিনি খুব বিস্মিত হন নি, একটুবা কৌতুকবোধ করছেন; যেন আগের থেকেই ধরে নিয়েছিলেন যে, এমন একটা কিছু ঘটবে। বেসিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, তার চোখেও কৌতুকের ছটা। সত্যি বলতে কি, দুজনেই যেন মৃদু মৃদু হাসছে।

বেশীক্ষণ আর ছুটোছুটি করতে হলো না, একটু পরেই মিঃ শর্টার কোণঠাসা হয়ে পড়লেন।

হাঁফাতে হাঁফাতে তিনি বললেন, "দোহাই মিঃ গ্র্যান্ট, আর আমার পিছু লাগবেন না। আপনি তো জানেন, এ কিছু বেআইনী ব্যাপার নয়। তাছাড়া কারুর তো আর এতে কোনও ক্ষতি হয় নি? কি করি বলুন, সামাজিক কাঠামোটাই এমন বদখৎ যে, এসব না করেও আমাদের কোনও উপায় থাকে না। বুঝতেই তো পারছেন—"

ঠাণ্ডা গলায় বেসিল বলল, "না না, আপনার আর দোষ কি। সে-কথা হচ্ছে না। নিন, এবার গোঁফজোড়াটা দিয়ে দিন তো? টাকটাও দিন। ভাল কথা, ও দুটো কি ক্যাপ্টেন ফ্রেজারের সম্পত্তি?"

হাসতে হাসতেই মিঃ শর্টার বললেন, "না না, ক্যাপ্টেনের হবে কেন? আমাদেরই।"

সব কিছুই আমার গোলমেলে ঠেকতে লাগল; দুজনেই কি এরা পাগল হয়ে গেছে? বিস্ময়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "কি সব আবোল-তাবোল বকছ তোমরা; কী এর অর্থ? মিঃ শর্টারের টাক্ তো তাঁর নিজেরই টাক্,—ও-টাক্ ক্যাপ্টেন ফ্রেজারের হতে যাবে কেন? আর তা হওয়াও কি সম্ভব? একজনের টাক্ কি আরেকজনের হয়? ক্যাপ্টেন ফ্রেজারের সঙ্গেই বা এর সম্পর্ক কোথায়? বেসিল, তাঁর সঙ্গে তুমি আজ ডিনার খাও নি?"

বেসিল বলল, "না।" বলে সে হাসতে লাগল।

"সে কি! মিসেস্ থর্টন যে পার্টি দিয়েছিলেন, তুমি সেখানে যাও নি? কেন, যাও নি কেন?

হাসতে হাসতেই বেসিল বলল, "কি, করে যাই বলো? অচেনা এক আগন্তুক এসে অযথা আমার সময় নষ্ট করলেন। তা আমিও তাঁকে ছেড়ে দিই নি, শোবার ঘরে তাঁকে আটকে রেখেছি।"

"আটকে রেখেছ? শোবার ঘরে? বলো কি?" আমি একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম। কে জানে, এর পরেই বেসিল হয়ত বলবে যে, কয়লা-কুঠরিতে—কিংবা তার বুকপকেটেই—সে কাউকে আটকে রেখেছে। কিছুতেই আর তাকে বিশ্বাস নেই।

ভিতরের দিকে একটা ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল বেসিল, দরজা খুলল তার। একটু পরেই আর-এক বিস্ময়ের অবতারণা। ঘাড় ধরে যে ভদ্রলোকটিকে সে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল, তাঁকে দেখে আর আমার বাকস্ফূর্তি হলো না। ইনিও আর একটি পাদ্রী, মাথায় চওড়া টাক, গোঁফ শাদা, গায়ে শাল-জড়ানো। হুবহু মিঃ শর্টারেরই প্রতিমূর্তি যেন।

"বসুন সকলে, বসুন—" সহাস্যমুখে বেসিল বলল, "বসে পড়ুন সবাই। নিন, সকলেই একপাত্তর করে' মদ ঢেলে নিন। খুব খানিকটা রগড় হলো, কেমন? তা মিঃ শর্টার, ঠিকই বলছেন আপনি,—এ কিছু দোষের কাজ হয় নি। শুধু ক্যাপ্টেন ব্রেস্তারের জন্যেই যা-একটু দুঃখ হচ্ছে। আহা, ব্যাচারা! ঘুণাক্ষরেও যদি একবার আমাকে জানাতেন, তাহলে কি আর ওঁর এই অর্থদণ্ড হয়! আপনারা দুজনে অবশ্য তাতে খুশী হতেন না, কেমন—তাই না?"

যুগল-পাদ্রী চুপচাপ বসে বার্গাণ্ডি টানছিলেন, বেসিলের কথায় তাঁরা হো হো করে হেসে উঠলেন। একজন দেখি নিস্পৃহভাবে তাঁর গোঁফজোড়াটি খুলে নিয়ে টেবিলের ওপর রেখে দিলেন।

"বেসিল," কাতরকণ্ঠে আমি বললাম, "কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। দয়া করে আমাকে বুঝিয়ে বলো ব্যাপারটা, নইলে আমি পাগল হয়ে যাব।"

হেসে উঠল বেসিল ; বলল, "বন্ধু হে, আজব জীবিকা সব—এরই কাণ্ড এ-সব। এই যে দুই ভদ্রলোককে দেখছ এঁরা হচ্ছেন 'আটকদার'।"

"আটকদার! সে আবার কি?"

রেভারেণ্ড এলিস্ শর্টার বললেন, "ঘাবড়াবেন না মিঃ সুইনবার্ন, ব্যাপারটা আপনাকে বুঝিয়ে বলছি—"

রেভারেণ্ডের গলা শুনে আমি চমকে গিয়ে তিন পা পিছিয়ে এলাম। কী তাজ্জব, কোথায় সেই বার্ধক্যের স্খলিত কণ্ঠ! এ একেবারে শহুরে ছোকরার চাঁচাছোলা গলা। রেভারেণ্ড বললেন, "যা বলছিলাম ; ব্যাপারটা কিছু গুরুতর নয়। অবাঞ্ছনীয় লোকদের আটকে রাখবার জন্যে আমরা ভাড়া খেটে থাকি। ক্যাপ্টেন ব্রেজার হচ্ছেন—" বাকিটুকু আর মিঃ শর্টার বললেন না, আমতা-আমতা করতে লাগলেন।

বেসিল বলল, "বলতে আপনার লজ্জা হচ্ছে বুঝি? আচ্ছা, তাহলে আমিই বলছি। শোনো হে চার্লি, ক্যাপ্টেন ব্রেজার হচ্ছেন এঁদেরই একজন মক্কেল। ব্রেজার আমাদের বন্ধুলোক, তা সত্ত্বেও তিনি চান নি যে, আজকের ডিনারে আমরা উপস্থিত থাকি। কেন চান নি, না? তাও বলছি। এই যে মিসেস থর্নটন, যিনি আজ আমাদের নেমন্তন্নে ডেকেছিলেন, ক্যাপ্টেন ব্রেজার তাঁর প্রণয়াসক্ত। তা মুশকিল হয়েছে এই যে, কালকেই বেচারাকে আফ্রিকায় চলে যেতে হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আজ রাত্রেই মিসেস থর্নটনের কাছে তাঁকে বিবাহের প্রস্তাব পাড়তে হয়, কেমন ঠিক কিনা? ওদিকে, মিসেস থর্নটনও আবার ঠিক আজ রাত্রেই আমাদের ডিনারে ডেকে বসেছেন। কী করা যায় তাহলে? একটিইমাত্র উপায় বর্তমান, ডিনার থেকে আমাদের সরিয়ে রাখা। তা-ই বা কী করে সম্ভব? ক্যাপ্টেন ব্রেজার অগত্যা এই এঁদের শরণাপন্ন হলেন।"

বিনীত ভঙ্গীতে মিঃ শর্টার আমার দিকে চাইলেন ; বললেন, "আমার কোনও দোষ নেই ; যা-হোক করে আপনাকে আটকে রাখতে হবে তো? বাধ্য হয়েই তাই ওই আষাঢ়ে গল্প ফাঁদতে হলো। মারাত্মক একখানা গল্প ফেঁদেছিলাম, তাই না?"

"ওঃ বাব্বাব্বা! চমৎকার!"

আমার এই মন্তব্যে, স্পষ্টই বোঝা গেল, মিঃ শর্টার বেশ খুশী হলেন ; বললেন, "ধন্যবাদ। আপনার এই প্রশংসার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।"

অপর ভদ্রলোকটির দিকে তাকালাম ; দেখি তিনি তাঁর নকল-টাকটি মাথার থেকে খুলে রাখছেন। তার নীচে লাল্‌চে ঘন চুল। বার্গান্ডি টেনে চোখ দুটি তাঁর ঢুলুঢুলু হয়ে উঠেছে ; স্বপ্নাচ্ছন্ন গলায় তিনি বলে যেতে লাগলেন, "এখন আর কেউ অবাক হয় না ; ব্যাপারটা বেশ চালু হয়ে এসেছে আজকাল। এই তো আমাদের ছোট্ট একটা অফিস, দিন-রাত সেখানে মক্কেলদের ভীড় লেগে রয়েছে। আগেও নিশ্চয়ই আমাদের সঙ্গে আপনাদের মোলাকাৎ হয়েছে কখনো-না-কখনো, আপনারা হয়তো বুঝতে পারেন নি। এবার থেকে একটু নজর রাখবেন। এই ধরুন কারুর সঙ্গে আপনি দেখা করতে যাবেন ; হঠাৎ, বলা নেই কওয়া নেই, অচেনা এক ভদ্রলোক এসে গালগল্প জুড়ে নিলেন আপনার সঙ্গে। বুঝবেন, তিনি আমাদেরই লোক। কিংবা ধরুন, কোনও এক বন্ধুর বাড়ি বেড়াতে চলেছেন ; হঠাৎ এক ভদ্রমহিলা এসে এটা-ওটা ছুতোনাতায় বেশ খানিকক্ষণ গাল-গল্পে আপনাকে জমিয়ে ফেললেন। বুঝবেন, তিনিও একজন আটকদার,—আমাদেরই লোক। বলা যায় না, আপনার বন্ধুই হয়তো তাঁকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।"

বললাম, "তা তো হলো, একটা কথা কিন্তু আমি এখনও বুঝে উঠতে পারছি না। দুজনেই কেন আপনারা পাদ্রী সাজতে গেলেন ?"

মিঃ শর্টারের মুখে যেন একটু ক্ষোভের চিহ্ন ফুটে উঠল। হাত উল্টে তিনি বললেন, "কি বলব, ঐখানেই একটু ভুল হয়ে গেছে। তা সেটা আমাদের দোষ নয় ; আগ্রহের আতিশয্যে ক্যাপ্টেন ক্রেজারই একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলেন। তাঁর নির্দেশ দেওয়া ছিল, আপনাদের আটকে রাখবার জন্যে যেন সবচাইতে বেশী ফী-ওয়ালা আটকদার লাগানো হয়। তা, আমাদের মধ্যে যারা পাদ্রী সাজে, তাদের ফী-ই হলো সবচাইতে বেশী। পাদ্রী সাজাটা বেশ কঠিন কাজ কিনা, তাই। প্রতিবারে আমরা পাঁচ গিনি করে পাই। কোম্পানী আমাদের কাজে খুবই

গণ্ডী, এখন তাই আমাদের পাদ্রী ছাড়া আর অন্তকিছু সাজতে বলা হয় না। এর আগে আমরা কর্নেল সাজতাম। পাদ্রীর ঠিক নীচেই হলো কর্নেল। কর্নেলরা পায় চার গিনি।"

চতুর্থ পর্ব : স্থান-রহস্য

লেফটেন্যান্ট স্ট্রামণ্ড কীথ্ হচ্ছেন সেই জাতের মানুষ—যে-কোনও রকমের আড্ডাকেই যাঁরা রোমাঞ্চকর সব ব্যক্তিগত অ্যাডভেঞ্চারের গল্পে জমিয়ে রাখতে ওস্তাদ এবং আড্ডাঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই যাঁদের সম্পর্কে শ্রোতারা সব তীক্ষ্ণ সমালোচনায় মত্ত হয়ে ওঠেন। অর্থাৎ তাঁর এইসব উদ্ভট গল্প, শুনতে যদিও চমৎকার, কেউই প্রায় বিশ্বাস করেন না। তা না করুন, লেফ্‌টেন্যান্টকে উপেক্ষা করবারও উপায় নেই কারুর। অন্তত সামনাসামনি। ভদ্রলোকের সর্বাঙ্গে এমন একটা অনায়াসলব্ধ বৈশিষ্ট্য বর্তমান যে, সহজেই তা আপনার চোখে পড়বে। হাল্কা ফুরফুরে মানুষটি, পরনে ঢিলেঢালা ট্রাউজার আর শাদা শার্ট। বহুদিন গরমদেশে ছিলেন, পোষাক পরিচ্ছদ যে বাহুল্যবর্জিত—এইটেই তার হেতু। চেহারায় একটা লিক্‌লিকে স্বাচ্ছন্দ্য বর্তমান। চোখ দুটি ঘনকৃষ্ণ, ঈষৎ চঞ্চল।

এবং সবসময়েই তাঁর হাত-টানাটানি অবস্থা। এর থেকে তাঁর চরিত্রের খানিকটা আভাষ পাওয়া যাবে। দরিদ্রদের মধ্যে, লক্ষ্য করে দেখবেন, সবসময়েই একটা বাসা-বদলানোর মর্মান্তিক তাড়না বর্তমান। যেন বাসা-বদলালেই তাদের সব দুর্দশার অবসান হবে। লেফ্‌টেন্যান্ট স্ট্রামণ্ড কীথ্-এর মধ্যেও এ-তাড়না উপস্থিত। কৃত্রিম সভ্যতার পীঠস্থান এই লণ্ডন শহরের মধ্যেই, হিসেব করলে বোঝা যাবে, জনসাধারণের একটা বৃহৎ অংশ যেন পুনর্বার যাযাবর হয়ে উঠেছে। অনবরত তারা বাসস্থান পাল্টাচ্ছে। এবং তাদের মধ্যে সবচাইতে বড় যাযাবর হচ্ছেন এই লেফ্‌টেন্যান্ট কীথ্। ভদ্রলোক এককালে মস্ত শিকারী ছিলেন ; কথা শুনে অন্তত

তা-ই মনে হয়। নিরীহ মাইল থেকে শুরু করে মত্ত হস্তী, কিছুই নাকি তিনি মারেননি। শ্রোতারা সব আড়ালে হাসাহাসি করে ; বলে—গাঁজাখুরি গল্প।

সম্পত্তি বলতে এক কীট-ব্যাগ। সেটা তাঁর সঙ্গেসঙ্গেই ঘোরে। দুটো বর্শা থাকে তার মধ্যে, একটা সবুজ ছাতা, এককপি শতচ্ছিন্ন পিকউইক-পেপার্স, বড় একটা রাইফেল, আর এক বোতল ধেনো মদ। বর্শা দুটো একটুকরো দড়ি দিয়ে বাঁধা ; কোত্থেকে তিনি এদের সংগ্রহ করেছেন জানি না, বোধ হয় কোনও জংলী-জাতির কাছ থেকে। যেখানেই গিয়ে এবং যতো অল্পদিনের জন্যেই গিয়ে তিনি ডেরা বাঁধুন না কেন, কীট-ব্যাগটি তাঁর সঙ্গেসঙ্গেই যাবে। প্রতিবেশীরা ঠাট্টা করে, চ্যাংড়া ছোড়ারা হাততালি দেয়,—লেফ্‌টেন্যান্ট তা গ্রাহ্যও করেন না।

আর হ্যাঁ, আর-একটা জিনিস তাঁর নিত্যসঙ্গী ; সে হ'ল তাঁর ফৌজী জীবনের তরোয়াল। প্রতিবেশীদের কৌতুক তাতে আরো খানিকটা বেড়ে যায় মাত্র।

আগেই বলেছি, লেফটেন্যান্ট ড্রামণ্ড কীথ্‌-এর চেহারাটা বেশ ছিমছাম। আর তিনি বেশ কর্মক্ষমও বটে। তবে ঠিক যুবক বলতে যা বোঝায়—তা আর তিনি নন এখন, বয়েসে এখন ভাঁটা পড়ে এসেছে। অসম্ববিন্যস্ত চুলে মরচে-পড়া লোহার রঙ ধরেছে। গোঁফজোড়া কিন্তু কালো, কুচকুচে কালো। মুখে একটা ফুরফুরে প্রফুল্লতার আমেজ। লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে ওটা তাঁর মুখোস মাত্র। আসলে সে-মুখ চিন্তাবিষণ্ণ। মাঝ-বয়সে পৌঁছে তিনি চাকরীর থেকে অবসর নিলেন, ইতিমধ্যে লেফ্‌টেন্যান্টের বেশী আর একধাপও যে তিনি এগোতে পারেননি—এ বড় নৈরাশ্যপ্রদ ব্যাপার। আর এইজন্যেই বোধ হয় কেউ তাঁকে পাত্তা দেয় না।

তা ছাড়া আরো একটা মুশকিল হলো এই যে, যে-ধরণের অভিজ্ঞতার তিনি গল্প করেন তাতে শ্রোতারা সব বিস্ময়াবিষ্ট হয় বটে, তবে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয় না। ভাঁটিখানা জুয়োর আড্ডা—ইত্যাদি নিকৃষ্ট জায়গায় কতোবার কী নিদারুণ ফ্যাসাদে তিনি পড়েছিলেন, তাই নিয়েই তাঁর গল্প। শ্রোতাদের মনশ্চক্ষে একটা অদ্ভুত ছবি ফুটে ওঠে, তাঁদের গা-ঘিনঘিন করে। এ ধরণের গল্পে—তা সে সত্যিই হোক আর মিথ্যেই হোক—বক্তার বড় বিপদ। যদি মিথ্যে হয়, বক্তা তাহলে

মিথ্যেবাদী ; সত্যি হলেও লাভ নেই, শ্রোতারা সেক্ষেত্রে তাঁকে ছুতমিত্র হটিয়ে দেয়।

চারজনে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম এতক্ষণ ; আমি, বেসিল গ্র্যাণ্ট, বেসিলের ভাই শখের-গোয়েন্দা রুপার্ট গ্র্যাণ্ট এবং লেফ্‌টেন্যাণ্ট ড্রামণ্ড কীথ। এই মাত্তর লেফ্‌টেন্যাণ্ট বিদায় নিয়েছেন ; ফলে প্রায়ই যা হয়, সকলেই আমরা তাঁর সম্পর্কে তীব্র সমালোচনায় মত্ত হয়ে উঠেছি। রুপার্ট ছোকরা বেশ চালাক-চতুর। তবে এ বয়েসে একটু বেশী চালাক হয়ে পড়লে যা হয়—কোনও কিছুতেই তার বিশ্বাস নেই। সব কিছুতেই তার অবিশ্বাস, সবার ওপরেই তার সন্দেহ। এই অত্যধিক বাড়াবাড়িতে মাঝে মাঝে আমি চটে যাই অবিশ্যি, তবে এক্ষেত্রে তার সন্দেহকে আমার সত্যি বলেই মনে হ'ল। তাই বেসিল যখন তার অবিশ্বাসকে ঠাট্টা করে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল, আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। আমি এমন-কিছু সন্দেহবাতিকগ্রস্ত লোক নই, কিন্তু লেফ্‌টেন্যাণ্ট এতক্ষণ পর্যন্ত যে সমস্ত গাঁজাখুরী গল্প করে গেলেন—যে-কোনও সুস্থমস্তিষ্ক লোকের পক্ষেই তা বিশ্বাস করা অসম্ভব।

বেসিলকে তাই বললাম, "না না, ঠাট্টার কথা নয়। সত্যিই কি তুমি বিশ্বাস করো যে, ও-লোকটা ঐভাবে জাহাজের খোলের মধ্যে আত্মগোপন করে বসেছিল ? কিংবা ঐ যে বলল, কোথায় যেন একবার ওকে মোল্লা সাজতে হয়েছিল, সেটাও কি খুব একটা কিছু বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার ?"

বেসিল একটু চিন্তা করে বলল, "কি জানো, ভদ্রলোকের চরিত্রে একটা দোষ রয়েছে। তোমরা তাকে গুণও বলতে পার। সেটা হচ্ছে এই যে উনি বড্ডো বেশী সত্যি কথা বলেন এবং বড়ই সাদামাঠা ভাবে বলেন।"

রুপার্ট চটে গেল ; বলল, "কি বললে ? লেফটেন্যাণ্ট কীথ সত্যবাদী ? ও, তোমার হেঁয়ালী হচ্ছে বুঝি ? তা বাপু, হেঁয়ালীই যদি করতে চাও তো আরও এক ধাপ এগোতে পার ; বলতে পার যে, লেফটেন্যাণ্ট জীবনে কখনো তার বাড়ির বাঁধাধরা চৌহদ্দীর বাইরে পা-ই দেয়নি।"

নির্লিপ্তকণ্ঠে বেসিল বলল, "তা কেন হবে ? ঘুরে বেড়ানটা ওঁর একটা নেশা ;

যত অন্থানে গিয়ে উনি ভেলা বাঁধেন ততই ওঁর আনন্দ। তাতে করে কিন্তু কোনও মতেই একথা প্রমাণিত হয় না যে, লোকটা সোজা সরল নয়। আসল কথাটা কি জানো, সত্য-ঘটনাকে তুমি যতই খোলাখুলিভাবে শ্রোতাদের কাছে পেশ করবে ততই সেটা অদ্ভুত শোনাবে। এই সহজ কথাটাই তোমরা বোঝ না। কীথ্ যা বলেন, তার একবিন্দুও মিথ্যে নয়। ওঁর গল্প তোমরা শুনেছ। সে গল্পের স্থান-কাল-পাত্র যে অত্যন্ত বদখৎ এবং তা-যে তিনি গোপন করেন না—তাও তোমরা জানো। তার থেকেই বুঝতে পারা উচিত, ও-গল্প শুনিয়ে আর যাই হোক্ মহৎ সাজবার অভিপ্রায় ওঁর নেই। কেন তাহলে শোনান উনি? আসলে, শুনিয়েই ওঁর আনন্দ; তোমরা যে কী মনে করছ না করছ, তা নিয়ে উনি এতটুকুও মাথা ঘামান না।"

রুপার্ট, স্পষ্টই বোঝা গেল, নিদারুণ চটে গেছে। বলল, "অর্থাৎ বাস্তবের দৌড় কল্পনার থেকেও বেশী, এই তো? তা তুমিও কি ওই বস্তাপচা প্রবাদবাক্যে বিশ্বাস করো?"

বেসিল বলল, "কেন নয়? মনের অস্তিত্ব একটা বাস্তব ব্যাপার, কল্পনার সে জনক। বাস্তব তাই কল্পনার থেকে অনেক বড়, অনেক বেশী রহস্যময়। কল্পনা—তা সে যতই উদ্ভট হোক—মনে রেখো, বাস্তবের থেকেই তার উদ্ভব হয়েছে।"

রুপার্ট দেখল, যুক্তির পথে গিয়ে সুবিধে হবে না। তাই সে তৎক্ষণাৎ ব্যঙ্গের পথ ধরল। বলল, "হবেও বা। তা তোমার এই লেফটেন্যান্টের কাহিনী বাপু বাস্তবকেও হার মানায়। এই যে লোকটা সমুদ্রের তলায় হাঙরের ছবি তোলবার গল্প শুনিয়ে গেল—বুকে হাত দিয়ে বলো ত, ও-গল্প তুমি বিশ্বাস করো?"

বেসিল বলল, "করি। কীথ্ সৎ লোক, কখনই তিনি মিথ্যা কথা বলেন না।"

"ওকে যারা চেনে, তারা কিন্তু অন্য কথাই বলবে—"

ভেবে দেখলাম রুপার্টের কথাই ঠিক। বেসিল তবু নির্বিকার। অগত্যা বললাম, "ব্যাপারটা একটু ভেবে ছাখো বেসিল। লেফটেন্যান্টকে আর যা-ই হোক্ সৎ লোক বলা চলে না। যে-লোকটার চালচুলোর পর্যন্ত ঠিক নেই—"

আমার কথা তখনও শেষ হয়নি, দরজাটা হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল। দেখলাম, লেফ্‌টেন্যান্ট ড্রামণ্ড কীথ।

সিগারেটের ছাই ঝেড়ে তিনি বললেন, "ভাল কথা মিঃ গ্রান্ট, একটা জিনিস আপনাকে জানানো হয়নি, সেইজন্যেই আবার ফিরে আসতে হলো। আপাতত এপ্রিল মাস পর্যন্ত আমার বড়ো টানাটানি অবস্থা। শ'খানেক পাউণ্ড ধার পাওয়া যাবে আপনার কাছে? পেলে বড় ভাল হত—"

রুপার্ট এবং আমি নীরবে দৃষ্টিবিনিময় করলাম। বেসিল একটা ঘোরানো চেয়ারে বসে ছিল, টেবিলের দিকে ঘুরে গিয়ে সে একটা কলম তুলে নিল। তারপর চেক-বই খুলে বলল, "চেক্‌টা কি ক্রস্‌ করে দেব?"

লেফ্‌টেন্যান্টের আর উত্তর দেবার অবসর হলো না, রুপার্ট বলল, "একটা কথা। লেফ্‌টেন্যান্ট যখন আমাদের সামনেই টাকাটা ধার চাইলেন, তখন—"

"আঃ, কী ছেলেমানুষী হচ্ছে রুপার্ট—," বেসিল তাকে থামিয়ে দিল; তারপর লেফ্‌টেন্যান্টের দিকে চেক্‌টা এগিয়ে দিয়ে বলল, "এক্ষুনি আবার চলে যাবেন?"

"এক্ষুণি!" লেফ্‌টেন্যান্ট বললেন, "টাকাটা পেয়ে বড় উপকার হলো। এক্ষুণি আমাকে একবার আমার এজেন্টের কাছে দৌড়তে হবে।"

ব্যঙ্গের দৃষ্টিতে রুপার্ট তাঁর দিকে তাকাল। সে দৃষ্টির অর্থ, 'সবই জানি, বাপু, এজেন্ট মানে তো চোরাই মালের মজুতদার!' মুখে সে বলল, "এজেন্ট! কিসের এজেন্ট?"

লেফ্‌টেন্যান্ট যেন একটু চটে গেলেন এই আকস্মিক প্রশ্নাঘাতে; তারপর একটু সামলে নিয়ে রুক্ষকণ্ঠে বললেন, "কিসের আবার, বাড়ির এজেন্ট।"

রুপার্ট বলল, "তাই নাকি? তা বেশতো, চলুন—আমরাও আপনার সঙ্গে যাব।"

বেসিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, নীরব হাস্যে সে কেঁপে কেঁপে উঠছে। লেফ্‌টেন্যান্ট কীথ্‌ চুপ করে রইলেন একটুক্ষণ; রুপার্টের প্রশ্নে যে অবিশ্বাসের আভাষ ছিল তাতে তিনি অপমান বোধ করেছেন বুঝলাম। বললেন, "কী বললেন আপনি, কী বললেন মিঃ রুপার্ট গ্রান্ট?"

রুপার্টের দিকে চাইলাম, মুখেচোখে তার একটা হিংস্র বিদ্রূপ ফুটে উঠেছে। বলল, "এই বলছিলাম, আমরাও আপনার সঙ্গে একটু ঘুরে আসি চলুন না? আপনার ওই এজেন্টটিকেও দেখে আসা যাবে—"

রাগে ফেটে পড়লেন লেফ্‌টেন্যান্ট স্ক্রামও কীথ্‌। হাতের ছড়িটাকে সশব্দে আন্দোলিত করে বললেন, "তার মানে আপনি আমাকে অবিশ্বাস করছেন এইতো? বেশ তো, চলুন আমার এজেন্টের কাছে। তাতেও যদি আপনার সন্দেহ না মেটে তো আমার ঘরদোর, বিছানা-বালিশ যা আপনার খুশী তছ্‌নছ্‌ করে দেখে আসবেন। চলুন—" বলে তিনি বিদ্যুদ্বেগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

রুপার্ট দেখলাম উত্তেজনায় অস্থির হ'য়ে উঠেছে। সে আর এতটুকুও সময় নষ্ট করল না; আমাদের নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সে লেফ্‌টেন্যান্টের সঙ্গ নিল, আমি আর বেসিল পিছু পিছু চলতে লাগলাম। একটু বাদেই দেখলাম, রুপার্ট বেশ জমিয়ে নিয়েছে। ছদ্মবেশী গোয়েন্দারা যেভাবে ছদ্মবেশী গুণ্ডাদের সঙ্গে কথা বলে, সেইভাবেই কথাবার্তা চালাচ্ছে সে। লেফ্‌টেন্যান্ট যে আসলে একটি বদমায়েস সে বিষয়ে আর আমার মনে তখন এতটুকুও সন্দেহ নেই। ভদ্রলোক দেখলাম রীতিমত অস্বস্তি বোধ করছেন। আমি এবং বেসিল, দুজনেই সেটা টের পেলাম।

বাড়ির এজেন্টের সন্ধানে চলেছি আমরা, লেফ্‌টেন্যান্ট আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। অসাধারণ নোংরা জায়গা, বেসিল এবং রুপার্ট দুজনেই সেটা লক্ষ্য করল। পথগুলি সব ক্রমশই সরু হয়ে আসছে, বাড়ির ছাদ অস্বাভাবিক নিচু, রাস্তায় প্যাচপেচে কাদা। বেসিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, মুখেচোখে তার তীক্ষ্ণ কৌতূহল ফুটে উঠেছে, আর রুপার্টকে বেশ খুশী-খুশী বলেই মনে হলো। তার কারণ, তার অনুমান সত্যি হতে চলেছে; লেফ্‌টেন্যান্ট যে আসলে একটি নিতান্তই ওঁছা লোক, তাতে আর তার সন্দেহ নেই তখন। এই জঘন্য পল্লী—এখানে কোনও ভদ্রলোক আসে!

ঠিক কতগুলি গলি যে আমরা পার হয়ে এসেছি জানি না। চারটেও হতে পারে, পাঁচটাও হতে পারে, পনেরোটা হওয়াও অসম্ভব নয়। লেফ্‌টেন্যান্ট হঠাৎ

থমকে থামলেন, মরীয়া হয়ে এদিক ওদিক তাকালেন একবার, তারপর সামনের দিকে অঙ্গুলী-নির্দেশ করলেন। দেখি, একটা ছোট্টমতন কুঠরি, নিতান্তই অপরিসর। আর তারই গায়ে নেম্‌প্লেট টাঙানো রয়েছে—'পি মণ্টমরেন্সী, হাউস-এজেন্ট'।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে মিঃ কীথ্‌ বললেন, "এইটেই তাঁর অফিস। আপনারা কি একটু বাইরে দাঁড়াবেন ? না-কি এতবড়ই আপনারা হিতৈষী আমার যে, আমাদের কথাবার্তাগুলোও আপনাদের না শুনলে চলবে না ?"

স্মার্ট ততক্ষণে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকবে সে ! পাগল ! এত সহজে সে তার শিকার ছেড়ে দেবে !

মুখে বলল, "তা, আপনি যদি কিছু মনে না করেন তো—"

লেফ্‌টেন্যাণ্ট একেবারে ফেটে পড়লেন, "এখনও অবিশ্বাস ? বেশ, ভেতরেই আসুন আপনারা।" আমি বুঝলাম, এ-ক্রোধ তাঁর ছদ্মবেশমাত্র ; ভদ্রলোক বেশ ভালভাবেই বুঝেছেন, এবারে আর তাঁর ধরা না দিয়ে উপায় নেই। নীরবে আমরা মিঃ কীথ-এর পেছনে পেছনে সেই কুঠরিতে গিয়ে ঢুকলাম।

মিঃ মণ্টমরেন্সীকে দেখলাম। বুড়ো ভদ্রলোক, নিরিবিলি একটি ধূসর কাউণ্টারের পেছনে তিনি বসে আছেন। অদ্ভুত চেহারা। মাথাটি ডিম্বাকৃতি, ব্যাঙের মতন চোয়াল, ছাঁটা সরু দাড়ি, সর্বোপরি সুতীক্ষ্ণ ঈগলচঞ্চু নাসিকা। পরনে অপরিচ্ছন্ন ফ্রক-কোট, শ্লথবদ্ধ টাই। চেহারা দেখে, আর যাই হোক, বাড়ির দালাল বলে মনে হয় না। এর চাইতে কেউ যদি বলত যে, ইনি একটি স্কচ্‌-হাইল্যাণ্ডার তো তাও আমি বিশ্বাস করতাম।

ঝাড়া চল্লিশটি সেকেণ্ড আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম, ভদ্রলোক তবু মুখ তুলে চাইলেন না। আমরাও যে অবশ্য ঠিক তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম তাও নয়, তাকাতে কেমন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। আসলে তিনি যেদিকে তাকিয়ে ছিলেন, আমরাও ঠিক সেই একই দিকে তাকিয়েছিলাম ; আমাদের সকলের দৃষ্টিই তখন তাঁর কাউণ্টারের ওপর নিবদ্ধ। অদ্ভুত একটি প্রাণী সেখানে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে ; ছোট্ট একটি বেজী।

স্মার্ট স্ম্যার্টই কথা কইল সর্বপ্রথম। কণ্ঠস্বরে যেন সে মধু ঢেলে দিল।

ক্ষেত্রবিশেষে সে এই ধরণের কথা কয় এবং তার জন্যে অবসর-মুহূর্তে সে রীতিমত রিহার্স্যাল দিয়ে থাকে। মধুমাখা গলায় সে শুধোল, "আপনিই তো মিঃ মণ্টমরেন্সী?"

অন্যমনস্কভাবে বসেছিলেন ভদ্রলোক, রূপার্টের কথায় তিনি চমকে উঠলেন; তারপর একসঙ্গে এতগুলি লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু-বা নার্ভাস হয়ে পড়লেন যেন। কাউণ্টারের ওপর থেকে বেজীর বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে সেটিকে তিনি তাঁর ট্রাউজারের পকেটে চালান করে দিলেন; অতঃপর বিনীত ভঙ্গীতে বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"আপনি তো একজন বাড়ির এজেন্ট, তাই না?" রূপার্ট শুধোল।

এই আকস্মিক প্রশ্নাঘাতে মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী খানিকটা বিহ্বল হয়ে পড়লেন, বিব্রতভাবে লেফ্‌টেন্যাণ্ট কীথ্‌-এর দিকে তাকালেন তিনি। তাঁর এই অস্বস্তি দেখে রূপার্ট খুশীই হলো।

"জবাব দিন, আপনি বাড়ির এজেন্ট?" চেঁচিয়ে উঠল রূপার্ট। 'বাড়ির এজেন্ট' কথাটাকে সে এমন ধিক্কারভরা গলায় উচ্চারণ করল যেন সে বলতে চাইছিল 'জোচ্চোর'।

লজ্জিতভাবে একটু হাসলেন মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী, তারপর কাঁপাকাঁপা গলায় বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

রূপার্ট বলল, "তা বেশ। লেফ্‌টেন্যাণ্ট কীথ্‌ আপনার সঙ্গে কথা কইতে চান; তাঁরই অনুরোধে আমরা এখানে এসেছি।"

লেফ্‌টেন্যাণ্ট কীথ্‌ এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসছিলেন। এই প্রথম তিনি কথা কইলেন, "মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী, সেই নতুন বাসাটার জন্যেই আমি এসেছি। সব ঠিকঠাক আছে তো?"

কাউণ্টারের ওপর রাখা হাতের চেটোটাকে বিব্রতভাবে একটু টান-টান করে মেলে ধরলেন মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী, তারপর বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, সবই ঠিক আছে। তবে কিনা ওই—"

লেফ্‌টেন্যাণ্ট কীথ্‌ তাঁকে মাঝপথেই থামিয়ে দিলেন, "ব্যস্‌ ব্যস্‌, ওতেই হবে।

আর যা-যা আপনাকে করতে বলে গিয়েছিলাম, সেগুলো সব করা হয়েছে তো? তাহলেই যথেষ্ট।"

কথা শেষ করে তিনি দরজার দিকে পা বাড়ালেন।

মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সীর দিকে তাকিয়ে দেখি, ভদ্রলোকের প্রায় কাঁদো কাঁদো অবস্থা। আমতা আমতা করে তিনি বললেন, "মাপ করবেন, আমার কথা এখনো শেষ হয় নি। ঐ আপনার জল গরম রাখবার ব্যবস্থাটা, মানে ওটা আর ঠিক হয়ে উঠল না শেষ পর্যন্ত। একে তো শীতকাল, তারপর উঁচুও তো কম নয়—"

পুনশ্চ তাঁর বক্তব্যে বাধা পড়ল, লেফ্‌টেন্যান্ট বললেন, "আচ্ছা আচ্ছা, ওতেই হবে। অন্য কোনও গণ্ডগোল না হলেই হলো। চলি তাহলে—" বলে তিনি দরজার হাতলে হাত দিলেন।

রুপার্ট আর সময় নষ্ট করল না, তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, "একটু দাঁড়ান লেফ্‌টেন্যান্ট, মিঃ মণ্টমরেন্সী বোধ হয় আরও কিছু বলবেন আপনাকে—"

মিঃ মণ্টমরেন্সীও বললেন, "হ্যাঁ লেফ্‌টেন্যান্ট, একটু দাঁড়ান। পাখিগুলোর কী ব্যবস্থা করবেন?"

রুপার্টের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠল; অস্ফুটস্বরে বলল, "পাখি! তার মানে?"

মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী বললেন, "হ্যাঁ পাখি। পাখিগুলোর কি ব্যবস্থা হবে লেফ্‌টেন্যান্ট?"

বেসিল এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। সত্যি বলতে কি, একটু যেন বোকাবোকাই দেখাচ্ছিল তাকে। এতক্ষণে সে মাথা তুলে চাইল; বলল, "লেফ্‌টেন্যান্ট কীথ, মিঃ মণ্টমরেন্সীর প্রশ্নের একটা জবাব দিয়ে যান। সত্যিই তো, পাখিগুলোর কি করবেন?"

ফিরে না তাকিয়ে জবাব দিলেন লেফ্‌টেন্যান্ট, "সে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, পাখিদের কোনও কষ্ট হবে না।"

"ধন্যবাদ আপনাকে," আনন্দের আবেগে মিঃ মণ্টমরেন্সী যেন গলে পড়লেন, "জানেন তো, পশুপাখিদের জন্যে আমি প্রায় পাগল বললেও চলে। পাখিদের

তাহলে কোনও কষ্ট হবে না, কেমন? ধন্যবাদ আপনাকে, অজস্র ধন্যবাদ। তবে হ্যাঁ, আরও একটা কথা—"

লেফটেন্যান্ট এবারে সশব্দ হাস্যে ফেটে পড়লেন; তারপর ফিরে দাঁড়ালেন মিঃ মণ্টমরেন্সীর দিকে। সে হাসির অর্থ অতি পরিষ্কার; তার অর্থ, 'নাঃ আপনার জ্বালায় আর পারা গেল না, ব্যাপারটা আপনি গোপন রাখতে দেবেন না দেখছি।'

দুর্বল গলায় মিঃ মণ্টমরেন্সী বললেন, "হ্যাঁ, আরও একটা কথা। নিরিবিলি অজ্ঞাতবাসই যদি আপনার কাম্য হয় তো বাড়িটার আমরা সবুজ রং করিয়ে দেব; আর নয়তো আপনার যদি—"

মিঃ কীথ যেন গর্জে উঠলেন, "সবুজ! হ্যাঁ, সবুজ রংই আমার চাই। এ নিয়ে আবার প্রশ্ন কেন? সবুজ রংই করিয়ে দেবেন।"

ব্যাপারটা তখনও আমরা বুঝে উঠতে পারি নি, সশব্দে দরজা খুলে লেফটেন্যান্ট রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন।

রুপার্টও যেন প্রথমটায় তাঁর এই আকস্মিক নিষ্ক্রমণে বিব্রত হয়ে উঠল; পরক্ষণেই সে সামলে উঠে প্রশ্ন করল, "ব্যাপারটা কি মিঃ মণ্টমরেন্সী? লেফ্‌টেন্যান্টকে যেন একটু উত্তেজিত মনে হলো, তাই না? ব্যাপারটা কি? উনি কি অসুস্থ?"

মিঃ মণ্টমরেন্সী বললেন, "না না, অসুস্থ হবেন কেন? বাড়িভাড়ার ব্যাপার তো, সাত ঝঞ্ঝাট দেখা দিয়েছে। বাড়িটাও আবার—"

রুপার্ট তাঁকে বাধা দিয়ে বলল, "সবুজ হওয়া চাই, কেমন? সবুজ রংএর ওপর লেফটেন্যান্টের দেখছি ভারী ঝোঁক; যে করেই হোক বাড়ির রং তাঁর সবুজ হওয়া চাই! অদ্ভুত! তা সে যাই হোক, লেফ্‌টেন্যান্ট আমাদের জন্যে বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন; এক্ষুনি আমরা উঠব। তার আগে আপনাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছি। আপনার খদ্দেররা কি সব এইভাবে রং দেখে বাড়ি পছন্দ করেন? ব্যাপারটা আমার একটু অস্বাভাবিক ঠেকছে। ভাড়াটেদের বুঝি এখানে রঙের উপরেই ঝোঁক? এই ধরুন, কারুর বা লাল-বাড়ি চাই,

কারুর বা নীল-বাড়ি, আবার কারুর বা সবুজ-বাড়ি না হলে চলবে না—কেমন ?"

কাঁপা-কাঁপা গলায় মিঃ মণ্টমরেন্সী বললেন, "তা যা বলেছেন। তবে কি জানেন, বাড়ির ব্যাপারে রংই হচ্ছে আসল কথা। কেউ যদি লোকচক্ষুর অন্তরালে একটু নিরিবিলি থাকতে চান তো সবুজ-বাড়ি তাঁকে নিতেই হবে। লেফ্‌টেন্যাণ্টও তাই সবুজ-বাড়ি নিচ্ছেন। ভদ্রলোক একটু নিরিবিলি থাকতে চান ; চট্‌ করে তাঁর বাড়িটা কারুর নজরে পড়ুক—এ তিনি চান না।"

যুক্তি শুনে রুপার্ট খুশী হলো না। বলল, "সবুজ-বাড়িই বরং চট্‌ করে সকলের চোখে পড়বে। এমন কোন্‌ জায়গা আছে মিঃ মণ্টমরেন্সী সবুজ-রঙা বাড়ি যেখানে সকলের নজর এড়িয়ে যায় ?"

মিঃ মণ্টমরেন্সী বিব্রত অস্বস্তিতে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে কি যেন হাতড়াতে লাগলেন। একটু বাদে ছোট্ট দুটো গিরগিটিকে টেনে বার করলেন সেখান থেকে ; সে দুটোকে কাউণ্টারের ওপর ছেড়ে দিলেন। তারপর বললেন, "মাপ করবেন, এ প্রশ্নের জবাব দেবার উপায় নেই।"

"একটা ইঙ্গিত দিন অন্তত ?"

"তারও উপায় নেই," চেয়ার ছেড়ে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ মণ্টমরেন্সী, "কোনই উপায় নেই। ও-কথা থাক্‌। তার থেকে বলুন, আপনাদের কি বাড়ির দরকার আছে ? থাকলে আমাকে দয়া করে জানাবেন একবার। কী ধরনের বাড়ি আপনাদের পছন্দ ?"

নীলাভ দুটি চক্ষু মেলে তিনি রুপার্টের দিকে তাকিয়ে রইলেন ; রুপার্ট, মনে হলো, অপ্রস্তুত হয়েছে। যাই হোক্‌ তক্ষুনি সে সামলে উঠে বলল, "ওঃ হো, লেফ্‌টেন্যাণ্ট আবার বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন, খেয়ালই ছিল না আমার। আচ্ছা মিঃ মণ্টমরেন্সী, আজ তাহলে উঠি। আমার কৌতূহলে যদি কিছু অশোভনতা প্রকাশ পেয়ে থাকে, ক্ষমা করবেন।"

"না না, সে কি," মিঃ মণ্টমরেন্সী তাঁর পকেট থেকে ধীরে ধীরে একটা মাকড়সা টেনে বার করলেন ; ডেস্কের গায়ে সেটাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন,

"না না, তাতে কি হয়েছে? যদি কখনও বাড়ির দরকার হয় তো অনুগ্রহ করে একবার পায়ের ধূলো দেবেন ; তাহলেই যথেষ্ট।"

রাগে যেন ফেটে পড়ছিল রুপার্ট, সবেগে সে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপরেই আমাদের চক্ষুস্থির। কোথায় লেফ্‌টেন্যান্ট! তাঁর টিকিটিরও চিহ্ন নেই। রাস্তা নির্জন, আকাশে নক্ষত্রের চোখ-মিটিমিটি। বোকার মতো আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম।

বোঝা গেল, লেফটেন্যান্ট সরে পড়েছেন। এবং এর অর্থও অত্যন্ত প্রাঞ্জল। বেসিলের দিকে ফিরে তাকাল রুপার্ট ; তারপর চেঁচিয়ে উঠল, "এবার? বিশ্বাস হলো এতক্ষণে?"

বেসিল কোনও উত্তর দিল না।

নীরবে আমরা এগিয়ে চললাম। রুপার্ট ক্রুদ্ধ, আমি বিস্মিত, বেসিল নির্বিকার। রাস্তার পর রাস্তা আমরা পার হয়ে যাচ্ছি। মাঝে মাঝে দুটো-একটা ছোট্ট মোড়, এক-আধটা বিরলতৃণ পার্ক। নির্জন রাস্তা, লোকজনের চলাচল নেই। যাও-বা এক-আধটা লোক চোখে পড়ে, বোঝা যায় তারা বেসামাল হয়ে মদ টেনেছে।

হঠাৎ একটা বাঁক ঘুরে দেখি, লোকজনের সংখ্যা হঠাৎ বেড়ে চলেছে। এক-আধজন, দু-একজন, দু-তিনজন, দু-পাঁচজন। আরো এগিয়ে দেখি, ইতস্তত ছোটখাটো জটলা। জটলা শেষ পর্যন্ত জনতায় পর্যবসিত হলো। বিরাট ভিড়, অস্থিরতায় চঞ্চল। ভিড়ের শুধু বাইরের দিকের লোকগুলোই আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো। কখনো তারা এগোয়, কখনো পেছোয়। বোঝা গেল কিছু-একটা ঘটেছে। কনুই দিয়ে পথ করে নিয়ে সেই বিরাট ভিড়ের মধ্যস্থলে আমরা এগিয়ে গেলাম। সেখানে পৌঁছে ব্যাপারটা বোঝা গেল। জন পাঁচেক পথচারীতে একটা দাঙ্গা হয়েছিল ; তাদের মধ্যে একজন দেখি মড়ার মতো রাস্তায় পড়ে আছে। তারপরেই এক বিস্ময়ের ধাক্কা। বাকী চারজনের মধ্যে একজন হলেন আমাদের লেফটেন্যান্ট কীথ! কিন্তু একি অবস্থা তাঁর! জামাকাপড় ছিন্নবিচ্ছিন্ন, দৃষ্টি ক্রুদ্ধ, হাঁটু বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। আর-একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে বিস্মিত হলাম। লেফটেন্যান্টের ঠিক সামনেই রাস্তার ওপরে একখানা তলোয়ার পড়ে রয়েছে।

লেফটেন্যান্টের সেই প্রসিদ্ধ তরোয়াল। অন্ধকারে অবশ্য রক্তের দাগ দেখলাম না।

ততক্ষণে পুলিশ এসে গেছে। পুলিশ আসতেই রুপার্ট গ্র্যান্ট ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেল; লেফটেন্যান্টের দিকে আঙুল উচিয়ে বলল, "কনস্টেবল, ওই লোকটাই হচ্ছে অপরাধী; গতিবিধি অত্যন্ত সন্দেহজনক, ও-ই খুন করেছে।"

কনস্টেবলটি একটু বিস্মিত হলো, তারপর নম্রকণ্ঠে বলল, "কই, কেউই তো এখানে খুন হয়নি; একজন একটু জখম হয়েছে শুধু। এদের সব আমি নাম ঠিকানা নিয়ে যাচ্ছি, ও-একটু নজর রাখলেই চলবে।"

নিরস্ত না হয়ে রুপার্ট বলল, "না না, ও-লোকটা ভারী পাজি; ওর ওপর একটু ভালো করে নজর রাখা দরকার। কিছুই বলা যায় না—"

কনস্টেবলটি তবু নির্বিকার; মাথা নেড়ে বলল, "আচ্ছা, তা-ই হবে।" তারপর সে নাম ঠিকানা টুকে নিতে লাগল সকলের। কনস্টেবল-এর যখন কাজ শেষ হয়েছে, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ। রাস্তায় অন্ধকার। যারা সব মজা দেখতে এসেছিল, একে একে সরে পড়েছে। একজনের তবু কৌতূহল মেটেনি তখনও, সে রুপার্ট গ্র্যান্ট।

কনস্টেবল-এর কাছে এগিয়ে সে বলল, "একটা জিজ্ঞাসা আছে আমার। যে লোকটাকে আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম, ঐ যে তলোয়ারওয়ালা লোকটা, সে কি তার ঠিকানা দিয়ে গেছে?"

কনস্টেবল একটুখানি ভেবে নিল, তারপর বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁর ঠিকানাটাও আমি লিখে নিয়েছি।"

রুপার্ট একটু গম্ভীরভাবে বলল, "আমার নাম রুপার্ট গ্র্যান্ট। এসব খুনজখমের তদন্তে বহুক্ষেত্রে পুলিশ আমার সহায়তা নিয়েছে। সেই অধিকারেই আমি একটা অনুরোধ জানাচ্ছি। ও লোকটার ঠিকানা আমার জানা দরকার; ঠিকানাটা কি পাওয়া যাবে?"

বিমূঢ়ভাবে কনস্টেবলটি রুপার্টের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ; তারপর বলল,

"নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। ওঁর ঠিকানা হচ্ছে 'এল্‌ম্‌ নিবাস, বারটন কমন, সারে।' জায়গাটা হচ্ছে পার্কের কাছে।"

রুপার্ট বলল, "ধন্যবাদ।" তারপর ঠিকানাটা মুখস্থ করতে করতে বাড়ির দিকে পা চালিয়ে দিল। শহরে তখন রাত্রি নেমে এসেছে।

* * *

রুপার্ট একটু মেজাজী লোক, সহজে তার ঘুম ভাঙতে চায় না; সচরাচর তাই সে বেশ দেরি করেই ব্রেকফাস্ট খেতে নামত। বড় ভাইয়ের কাছে বরাবর অত্যধিক আদর পেয়েছে, তার ফলেই তার এই একগুঁয়েপণা। অথচ, আশ্চর্য, পরদিন সকালে যখন আমি আর বেসিল নীচে নামলাম, দেখি সে আগের থেকেই ব্রেকফাস্ট টেবিলে বসে অস্থিরভাবে আমাদের প্রতীক্ষা করছে।

তখনো আমরা চেয়ার টেনে সুস্থির হয়ে বসিনি, রুপার্ট একেবারে সরাসরি তার ব্যঙ্গভরা গলায় প্রশ্ন করল, "তাহলে বেসিল, লেফটেন্যান্টের সম্পর্কে তোমার ধারণা পালটেছে আশা করি? এখনো নিশ্চয় তুমি মনে করোনা যে তিনি একজন মহাপুরুষ ব্যক্তি?"

শান্তকণ্ঠে বেসিল বলল, "কিছুই আমি মনে করি না।"

উৎসাহভরে রুপার্ট তার টোস্টের গায়ে মাখন লাগাতে লাগাতে বলল, "তাই বলো। জানতাম, শেষ পর্যন্ত আমার কথাটাকেই তুমি মেনে নেবে। আসলে ও একটি জোচ্চোর, প্রথম থেকেই তোমার সেটা বোঝা উচিত ছিল। যা হোক, দেরিতে যে বুঝেছ তাতেই আমি খুশী।"

সেই ধীরস্থির শান্তকণ্ঠে বেসিল বলল, "না, তোমার খুশী হবার কোনও কারণ ঘটেনি। আমার কথাটা তুমি ঠিক বুঝতে পারনি রুপার্ট। আমি বলেছি, লেফটেন্যান্টের সম্পর্কে আমি কিছুই মনে করি না। ও-কথাটা আমি একেবারে আক্ষরিক অর্থেই বলেছি। ওর মানে এই নয় যে, লেফটেন্যান্টকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি না। আসলে আমার বলবার উদ্দেশ্য ছিল, বর্তমান মুহূর্তে আমি অন্য চিন্তায় নিমগ্ন। সে যাই হোক, তুমি দেখছি এখনো তাঁকে একটি পাষণ্ড মিথ্যাবাদী

বলেই মনে করো। সে-ক্ষেত্রে জেনে রাখো, আমার ধারণাও অপরিবর্তিত। আমি মনে করি, তিনি সৎ,—সত্যবাদী।"

বেসিলের কথায়, স্পষ্টই বোঝা গেল, রুপার্ট একটু চটে গেছে। অস্থিরভাবে একটা ভিন্ন ভেঙে নিতে নিতে সে বলল "অবশ্য এসব হেঁয়ালী করবার কোনও মানে হয় না বেসিল। যা বলবে একটু ভেবেচিন্তে বলো। ভেবে দেখা যাক, লেফটেন্যান্টের সম্পর্কে কতোখানি আমরা জানি। প্রথমত, তার অতীত ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত; দ্বিতীয়ত, সে একজন ভবঘুরে; তৃতীয়ত, সে লম্বাচওড়া কথা বলে; চতুর্থত, যুক্তরাজ্যের বদখৎ জায়গা—যেমন ধরো ভাঁটিখানা কি জুয়ার আড্ডা—এসব জায়গায় গতায়াতের কথাও সে নিজমুখে বেশ গর্ব ভরেই বলে থাকে। এর যে-কোনও একটাতেই প্রমাণ হচ্ছে যে, লেফটেন্যান্ট একটি তৃতীয় শ্রেণীর লোক। সর্বোপরি গতরাত্রের কথাটাও একবার স্মরণ করো। ওই যে মিঃ মন্ট্‌মরেন্সী, সত্যিসত্যিই কি তোমার ধারণা উনি একজন হাউস এজেন্ট? অসম্ভব। লেফটেন্যান্টের সঙ্গে ওঁর কেমন হেঁয়ালীভরা কথাবার্তা চলল, সেটাও লক্ষ্য করলে তো? সবুজ-বাড়ি! ভাবতেই তো অস্বাভাবিক লাগে। আসলে কি জানো, এর মধ্যে একটা মারাত্মক-রকম চক্রান্তের সঙ্কেত রয়েছে। তারপর, রাস্তার সেই হাঙ্গামার কথাটাও একবার স্মরণ করো। মনে রেখো একমাত্র লেফটেন্যান্টই ছিল সশস্ত্র। সুতরাং সে-ই যে মারপিট বাধিয়েছিল তাতে আর কারুর এতটুকুও সন্দেহ থাকা উচিত নয়। সবকটা প্রমাণই তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। তা সত্ত্বেও তোমার ধারণা লেফটেন্যান্ট অতিশয় সৎ লোক! কাকে যে তোমরা সৎ বলো বুঝি না বাপু।"

রুপার্টের এই অকাট্য যুক্তিতে বেসিলের কোনও ভাবান্তর হলো না। মৃদুস্বরে সে বলল, "লেফটেন্যান্ট জোচ্চোর নন, তিনি অত্যন্তই সৎ। তবে সেটা একটা বিশেষ-ধরনের সততা, সে তুমি ঠিক বুঝবে না রুপার্ট। বাসা-বদলানোটা ওঁর একটা শখ, তার জন্যে ওঁকে ভবঘুরে বলাটা তোমার ঠিক হয়নি। আর ওঁর বিরুদ্ধে এই-মাত্র যে তুমি একগাদা প্রমাণ উপস্থিত করলে ওগুলো সব প্রমাণ নয়, স্বাভাবিক ঘটনামাত্র। যথা আমাদের সামনে মিঃ মন্ট্‌মরেন্সীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে

ভদ্রলোক একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন। তা হ্যাঁ, পড়েছিলেনই তো; তাতে কি হয়েছে? যে কোনও লোকই অন্য কারুর সামনে ব্যক্তিগত কথা বলতে গিয়ে বিব্রত হয়ে পড়তে পারেন। তারপর ওই তরোয়ালের ব্যাপারটা। লেফটেন্যান্ট সর্বক্ষণ তাঁর ওই তরোয়ালখানা সঙ্গে নিয়ে হাঁটেন, তাতে তোমার আপত্তি দেখা যাচ্ছে। আসলে, ওখানা তরোয়াল নয়, গুপ্তী। তা, বহুলোকই তো গুপ্তী নিয়ে পথ হাঁটে, কী-এমন মহাভারত তাতে অশুদ্ধ হয়েছে? তৃতীয়ত, রাস্তায় একটা দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটতে দেখে আত্মরক্ষার তাগিদেই তিনি তাঁর গুপ্তীখানাকে খাপ থেকে টেনে বার করেছিলেন। তাতেই বা তাঁর অপরাধ কোথায়? যে কটি ব্যাপারের তুমি উল্লেখ করেছ, তার প্রত্যেকটিই আমার মতে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। কোনওক্রমেই এতে করে প্রমাণিত হয় না যে—"

বেসিলের কথা তখনও শেষ হয়নি, দরজা খুলে বেসিলের ল্যাণ্ডলেডী হঠাৎ ঘরে এসে ঢুকলেন।

ভদ্রমহিলার মুখচোখ ভয়ত্রস্ত। ভাঙাভাঙা উত্তেজিত গলায় তিনি বললেন, "মিঃ গ্র্যান্ট, নীচে একজন পুলিশের লোক এসেছে; আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।"

পুলিশ! সকলেই আমরা নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে বেসিলের গলা শোনা গেল, "বেশ তো, তাকে উপরে পাঠিয়ে দিন।"

অল্পক্ষণের মধ্যেই গতরাত্রের সেই স্থূলাঙ্গ কনস্টেবলটি এসে হাজির হলো। ব্যস্তভাবে সে বলল, "বিরক্ত করলাম বলে মাপ করবেন। একটা জরুরী ব্যাপারে আমি এসেছি। কাল রাত্রে কপার স্ট্রীটে যে হাঙ্গামা হয়ে গেছে, আপনাদেরই মধ্যে কেউ একজন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। এবং বিশেষ একটি ব্যক্তির দিকে তিনি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।"

রুপার্টের দিকে চেয়ে দেখলাম, চোখদুটি তার উৎসাহে জ্বলজ্বল করছে। একটুকরো কাগজে লেখা কী-একটা বিবরণের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে কনস্টেবলটি বলে যেতে লাগল, "যে ব্যক্তির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল, তার চুল শাদা, পরণে শাদা ট্রাউজার আর শাদা শার্ট। দামী পোষাক, তবে হাঙ্গামায়

হিজিবিজির। আর হ্যাঁ, এই যে, ভদ্রলোকের নামটাও এখানে লেখা রয়েছে ; নাম হলো লেফটেন্যান্ট ড্রামণ্ড কীথ।"

হাসতে হাসতে বেসিল বলল, "ভারী মজার ব্যাপার তো। আমি যে এদিকে ওঁর দোষস্খালনের চেষ্টা করছিলাম। তা লেফটেন্যান্টের হয়েছে কি ?"

"সেই কথাই বলছি" কনস্টেবলটি বলল, "হাঙ্গামার ব্যাপারে যাদের সন্দেহ করা হয়েছিল তাদের সকলের কাছ থেকেই তৎক্ষণাৎ আমি নাম-ঠিকানা নিয়ে নিয়েছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, পুলিশের থেকে তাদের গতিবিধির ওপর দিনকতক কড়া নজর রাখা হবে। তা এখন দেখা যাচ্ছে যে এই ড্রামণ্ড কীথ একটা জাল-ঠিকানা দিয়েছেন। যে বাড়ির কথা তিনি বলেছেন, সেরকম কোনও বাড়ি সেখানে নেই।"

হাঁটু চাপড়ে উঠে দাঁড়াল রুপার্ট। বেসিলের দিকে তাকিয়ে বলল, "কী, এখনো তোমার ধারণা পালটায়নি ? এখন তুমি মনে কর যে লেফটেন্যান্ট একজন সত্যবাদী মহাপুরুষ ?"

ভ্রূকুঞ্চন করে বেসিল বলল, "জাল-ঠিকানা ! ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকছে। লোকটা সম্পূর্ণ নির্দোষ, তা সত্ত্বেও সে জাল-ঠিকানা—"

"থামো তুমি," রুপার্ট একেবারে খেঁকিয়ে উঠল, "যা তোমার বুদ্ধি দেখছি, কি করে যে এককালে তুমি জজ্-এর চাকরি করতে ঈশ্বর জানেন। নিজে তুমি নেহাৎ ভালমানুষ, তাই তোমার ধারণা হয়েছে যে, পৃথিবীশুদ্ধ সকলেই সৎলোক। এখনো কি তোমার মোহ কাটেনি লেফ্টেন্যান্টের সম্পর্কে ? বাপু হে, পরপর সব সাজিয়ে যাও। অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তি, যতরাজ্যের গাঁজাখুরি গল্প, সন্দেহজনক কথোপকথন, খিড়কি গলি, গুণ্ডামারি, দাঙ্গাহাঙ্গামা—এবং সর্বোপরি এই জাল-ঠিকানা। আর, এই লোকটিকেই কিনা তুমি সৎলোক ভাবছ ! বলিহারী বুদ্ধি তোমার !"

বেসিল তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, চিন্তামগ্নভাবে পদচারণা করতে করতে বলল, "ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকছে।" তারপর কনস্টেবলটির দিকে তাকিয়ে বলল, "ঠিকানাটা আপনি ঠিক্‌ঠাক টুকেছিলেন তো ? তারপর সত্যিসত্যিই বাড়িটাকে গিয়ে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেছিলেন আপনারা ?"

মৃদু হেসে কনস্টেবলটি বলল, "কিছুমাত্রও সন্দেহ নেই। জায়গাটা হল গিয়ে লণ্ডনেরই উপকণ্ঠে, আর শেষরাত্রে পুলিশ সেখানে ড্রামণ্ড কীথ্-এর সন্ধানে গিয়েছিল। গিয়ে তাদের চক্ষুস্থির, 'এল্‌ম্‌-নিবাস' বলে কোনও বাড়ি সেখানে নেই। ওটা একটা ফাঁকা জলা জায়গা, সামান্য কিছু গাছপালা আছে শুধু। ওর ধারেকাছেও কোনও জনমনিষ্যির সন্ধান পাওয়া গেল না। আগাগোড়াই ব্যাপারটা একটা মস্ত চালাকি; ওই ড্রামণ্ড কীথ্‌টি একটি বাস্তুঘুঘু। বেছে বেছে এমন একটা কিম্ভূত জায়গার ঠিকানা দিয়েছে যে, চট্‌ করে কিছু বুঝে ওঠাও অসম্ভব। সে যাই হোক, বাড়িঘরদুয়োর ও-অঞ্চলে কিছুই নেই; 'এল্‌ম্‌-নিবাস'-এর নামগন্ধও ওখানে খুঁজে পাওয়া গেল না।"

বেসিলের দিকে তাকিয়ে দেখি, সারামুখ তার অন্ধকার। জীবনে এই প্রথম তাকে অসহায় বলে মনে হ'ল। লেফ্‌টেন্যান্ট যে আসলে একটি ধাপ্পাবাজ সে বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ নেই। একথা আমরা গোড়ার থেকেই বুঝতে পেরেছিলাম। শুধু বেসিলই যে কেন তা বুঝতে চাইছেনা ঈশ্বর জানেন। অস্ফুটস্বরে সে বলল, "সত্যিই তাহলে আপনারা খুঁজে দেখেছিলেন, কেমন? তা সত্ত্বেও ঠিকানাটার কোনও পাত্তা পাওয়া গেল না? অদ্ভুত ব্যাপার! ও হ্যাঁ, কী যেন ঠিকানাটা?"

কনস্টেবলটি তার কাগজপত্রের ওপর চোখ বুলতে লাগল। রুপার্ট ওদিকে একটা জানলায় ঠেস্ দিয়ে গোয়েন্দাসুলভ কায়দায় মৃদু মৃদু হাসছে। কনস্টেবলটিকে বাধা দিয়ে সে বলল, "বেসিল, তোমার সেই জাল-ঠিকানাটা চাইতো?" তারপর নিস্পৃহভঙ্গীতে টবের ফুলগাছটার একটা পাতা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, "আমিই বলছি শোনো; ঠিকানাটা আমি মুখস্ত করে রেখেছি।"

বেসিল বলল, "উত্তম করেছ। এখন ভনিতা রেখে ঠিকানাটা দাও তো—"

নির্বিকারভাবে কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে রুপার্ট বলল, "হ্যাঁ দিচ্ছি, ভুল হলে কনস্টেবলটিই আমাকে শুধ্‌রে দেবেন। ঠিকানাটা হল 'এল্‌ম্‌-নিবাস', বাক্‌টন কমন, সারে। জায়গাটা পার্কের কাছে।"

যন্ত্রণায় গোঙাতে গোঙাতে কনস্টেবলটি বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, এই ঠিকানাই বটে।"

বিস্ফারিত চোখে বেসিল খানিকক্ষণ স্তব্ধভাবে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ দেখি সে চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে বসেছে, মাথাটা তার অস্বাভাবিকভাবে পিছনে হেলে পড়ছে। ব্যাপার কি? বেসিল কি অসুস্থ বোধ করছে? তাড়াতাড়ি তার দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। তারপরেই আমি স্তম্ভিত। দেখি তার ঠোঁটদুটি বিস্ফারিত, ঈষৎ কাঁপছে। তারপরেই সে এক অট্টহাসি হেসে উঠল। সে কী হাসি! বাড়িঘরদোর যেন কাঁপতে লাগল। হাসি আর হাসি।

ঝাড়া দুটি মিনিট সে হাসল, তবু তার থামবার লক্ষণ নেই। আমরা ততক্ষণে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছি।

আমাদের সেই কাহিল অবস্থা দেখেই বোধ হয় তার করুণা হল শেষপর্যন্ত, হাসি থামিয়ে বলল, "অত্যন্তই দুঃখিত আমি, এমন অভদ্রভাবে হাসবার জন্যে আমি অত্যন্তই লজ্জিত। আর তা ছাড়া এটা এখন হাসবার সময় নয়। লেফটেন্যান্ট ড্রামণ্ড কীথ্-এর সন্ধানে যদি যেতে হয় তো এখুনি আমাদের বেরিয়ে পড়া দরকার। একটু বাদেই ট্রেণ ছাড়বে।"

বোকার মতো শুধোলাম, "ট্রেণ! কোথাকার ট্রেণ?"

"সেই কথাই বলছি," ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বেসিল গ্রাণ্ট উঠে দাঁড়াল, "কি যেন ঠিকানাটা? বাক্সটন, না কি যেন? এক্ষুনি তার ট্রেণ ধরতে হবে। কারুর কাছে টাইম-টেবল্ আছে?"

হতভম্ব হয়ে রুপার্ট বলল, "তার মানে? আমাদের কি এখন বাক্সটন কমন্-এ যেতে হবে নাকি?"

"কেন যাব না বল?" সহাস্যমুখে বেসিল শুধোল।

টব-এ রাখা ফুলগাছটাকে অস্থিরভাবে আঁকড়ে ধরল রুপার্ট, বলল, "কিন্তু যাবেই বা কেন?"

"লেফটেন্যান্ট ড্রামণ্ড্ কীথ্-এর সন্ধানে;" বেসিল বলল, "কেন, তোমাদের তাতে কোনও আপত্তি আছে?"

ফুলগাছটার থেকে নির্দয় হাতে একটা ডাল ভেঙে নিল বেসিল, অস্থিরভাবে সেটাকে মেঝের ওপর নিক্ষেপ করল ; তারপর বলল, "কিন্তু ওটা যে জাল-ঠিকানা ; ওখানে যে তার টিকিটিরও সন্ধান পাওয়া যাবে না তাও কি তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে ?"

খাঁটি কথা। আমি এবং কনস্টেবলটি অনুমোদনের ভঙ্গীতে হাসলাম। রুপার্ট তাতে উৎসাহিত হয়ে গড়গড় করে বলে যেতে লাগল, "যদি বলো, তোমার ওই লেফটেন্যান্টটি এখন বাকিংহাম প্রাসাদে রয়েছেন তো সেকথায় আমি প্রতিবাদ করব না ; এমনও হতে পারে যে, সে এখন সেণ্ট পলস্ গীর্জার ছাতের ওপরকার মস্ত ক্রুশখানাতে তার ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে আছে ; যদি ব'ল, সে এখন হাজতে পচছে (সেইটে হওয়াই সম্ভব) তো তাও আমি মেনে নেব ; কিংবা এমনও হতে পারে যে, সে এখন আমাদের রান্নাঘরেই ঘাপ্‌টি মেরে বসে রয়েছে, কিংবা তোমার ভাঁড়ার ঘরের আলমারিতে। এর যে-কোনও জায়গাতেই সে এখন থাকতে পারে হয়তো। শুধু একটি জায়গাতে যে সে নেই সে-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ ; যে-ঠিকানায় তুমি আমাদের নিয়ে যেতে চাইছ—সেখানে তার টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

"তাই নাকি ?" বেসিল তার ঝুল-কোটটাকে গায়ের ওপর চড়াতে চড়াতে শান্ত স্বরে বলল, "নিশ্চিন্ত থাকতে পার, যে-ঠিকানা লেফটেন্যান্ট দিয়েছেন সেইখানেই তাঁকে পাওয়া যাবে। সুতরাং এলে তোমরা ভালই করতে। তা বাপু একান্তই যদি না যেতে চাও তো তাতেও আমার আপত্তি নেই ; সেক্ষেত্রে আমি একলাই বাক্সটন কমন্-এ যাব।" বলে সে দরজার দিকে পা বাড়াল।

মানুষের ধর্মই হলো এই যে, কোনও কিছুকেই সে তার নাগালের বাইরে যেতে দিতে চায় না। বেসিলও তাই আমাদের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে আমরা চঞ্চল হয়ে উঠলাম, এবং তিলমাত্রও সময় নষ্ট না করে তার অনুসরণ করলাম। দৌড়তে দৌড়তেই রুপার্ট তাকে বলল, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে বেসিল ? যেখানে আমরা চলেছি সেটা যে একটা ফাঁকা জায়গা, জনমনিষ্যির চিহ্নও যে সেখানে নেই। গোটাকতক গাছ আছে শুধু। আজেবাজে জাল-ঠিকানা একটা, তার

পেছনে দৌড়ে এখন আমাদের সময় নষ্ট করতে হবে এইভাবে? এর কি কোনও মানে হয়?"

"হুঁ," পকেট থেকে ঘড়ি বার করে সময় দেখল বেসিল, তারপর বলল, "কিন্তু, এ-ট্রেনটা আমরা মিস্ করলাম।" তারপর একটু থেমে থেকে বলল, "সে যাক্, একটু পরে গেলেও চলবে। আমার আবার একটু লেখার কাজ আছে, সেটাও ইতিমধ্যে সেরে নেওয়া যাবে। রুপার্ট, তুমিও তো বলেছিলে আজ ডালউইচ্ গ্যালারীতে যাবে, তাই না? তা বেশ, তুমিও সেখান থেকে ঘুরে আসতে পারো ইচ্ছে করলে। অবশ্য আমি ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম, এত তাড়াহুড়োর কোনও দরকার নেই। তা ছাড়া, এখন গেলে তাঁকে হয়তো পাওয়াও যেত না। তার চাইতে পাঁচটা পনেরোর গাড়িতে যাবো, ছ'টার সময় সেটা পার্লে পৌঁছবে। লেফটেন্যান্ট তখন বাড়িতেই থাকবেন খুব সম্ভব।"

"বাড়িতেই থাকবেন—?" রুপার্ট একেবারে চেঁচিয়ে উঠল "কে বাড়িতে থাকবেন? তোমার ওই লেফটেন্যান্ট? কোথায় তাঁর বাড়ি?"

ফুল-কোটটার বোতাম আঁটতে আঁটতে বেসিল বলল, "কোথায় আবার, যে-ঠিকানা তিনি দিয়েছেন—সেইখানেই। কি যেন ঠিকানাটা। ও হ্যাঁ, এল্ম্-নিবাস, বাক্সটন কমন। তা সেইখানেই তাঁকে পাওয়া যাবে।"

হতাশায় ভেঙে পড়ল রুপার্ট, "কে বলল সেখানে তাকে পাওয়া যাবে? অসম্ভব। ওটা একটা জাল-ঠিকানা। ওরকম কোনও বাড়িই সেখানে নেই—"

সে কথা আমিও জানি। তা সত্ত্বেও আমরা বেসিলের সঙ্গ নিলাম। স্ট্যাণ্ড-এর থেকে টুপি এবং লাঠিটি হাতে তুলে নিয়ে তার সঙ্গেই চললাম আমরা। কিন্তু কেন যে চললাম তা জানি না। বেসিলকে সদাসর্বদা, সর্বরকম অবস্থায়, বিনা বাক্যব্যয়ে অনুসরণ করাই আমাদের স্বভাব। সে-অনুসরণ মূর্খতারই নামান্তর, সেকথা জেনেও। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। যদি সে আজ ব্রেকফাস্ট টেব্‌ল্ থেকে আচম্বিতে উঠে দাঁড়িয়ে নিমীলিতনেত্রে বলত, 'চলো যাই, একবার ভগবানের সঙ্গে দেখা করে আসি'—তো সেক্ষেত্রেও আমরা অন্ধভাবেই তাকে অনুসরণ করতাম।

সেদিনকার সেই সান্ধ্য-অভিযানের কথা চিরদিন আমার মনে থাকবে। পার্লে নেমে আমরা দক্ষিণমুখো যাত্রা করলাম; লণ্ডনের সেই নির্জন উপকণ্ঠে তখন গোধূলি নেমে এসেছে। এ-কী ভয়াবহ নির্জনতা। ইয়র্কশায়ারের জলাভূমি কি স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলের থেকেও যে এ-জায়গাটা আরো বেশী নিস্তব্ধ। অথচ কোলাহলমুখর লণ্ডনেরই এটা উপকণ্ঠ; ভাবতেও আমার কষ্ট হলো। সর্বত্র এক নিষ্প্রাণ স্তব্ধতা, এক ভৌতিক প্রশান্তি। বাক্সটন কমন্-এর বিরাট প্রান্তর যেন একটা প্রাগৈতিহাসিক পশুর মতো গা-হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। যেদিকে চাই, শুধু মাঠ আর মাঠ।

মাঠ তো নয়, যেন মূর্তিমান হতাশা; তখন আমার যা মানসিক অবস্থা তাতে অন্তত এই কথাটাই মনে হলো। এই মেঠোপথ, এই উর্ধবাহু এলম্-গাছ, এই বিরলতৃণ প্রান্তর—এর কোনও কিছুরই যেন কোনও অর্থ নেই। এবং সবচাইতে নিরর্থক আমাদের এই সান্ধ্য-অভিযাত্রা। ভূতগ্রস্ত মূর্খের মতো এক মিথ্যা-আলেয়ার পিছনে আমরা দৌড়ে মরছি। তাও আবার এক উন্মাদের নেতৃত্বে। যে-ঠিকানার কোনও অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই সেই জাল-ঠিকানায় এক জোচ্চোরের সন্ধানে এসেছি আমরা। সমস্ত ব্যাপারটাই একটা মর্মান্তিক প্রহসন। পশ্চিম দিগন্তে তখন সূর্য ডুবছে, সমস্ত আকাশে সে যেন একটা বিদ্রূপের হাসি ছড়িয়ে দিয়ে গেল।

সর্বাগ্রে বেসিল গ্রাণ্ট, কোটের কলারে গলা ঢেকে নিয়ে সে নীরবে পথ হাটছে। পিছনে আমরা। সূর্য ডুবে গেছে, রাত্রি নামছে, চারদিক অন্ধকার। বেসিল হঠাৎ থমকে থামল; ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল সে। সেই অন্ধকারের মধ্যে নজর চালিয়ে দেখলাম, সারা মুখে তার সাফল্যের হাসি ফুটে উঠেছে।

হাততালি দিয়ে সে বলল, "ব্যস। আমরা আমাদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছি।"

সেই নিষ্ফলা বন্ধ্যা প্রান্তরে তখন কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে; সামনে দুটি বিরাট এলম্-গাছ, আকাশে ডালপালা ছড়িয়ে দিয়ে স্তব্ধ প্রহরীর মতো

দাঁড়িয়ে রয়েছে যেন। লোকালয়ের নামগন্ধও নেই কোনোখানে। চেয়ে দেখি, কী-এক দুর্জ্ঞেয় আনন্দে বেসিল গ্র্যান্টের সারা মুখ যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

"আঃ, কী আনন্দ," বেসিল বলল, "আবার আমরা লোকালয়ে ফিরে এসেছি; ভাবতেই আমার আনন্দ হচ্ছে। শান্তির সন্ধানে যারা অরণ্যের শরণ নেয়, তারা মূর্খ। প্রকৃতির প্রলয়ঙ্কর রূপটিকে তারা দেখেনি, দেখলে তাদের ভুল ভাঙত। বুঝতে পারত যে, গৃহের তুল্য শান্তি আর অন্য কোথাও নেই; আকাশে নেই, বাতাসে নেই, কোথাও নেই। এই কনকনে হাওয়ার দিনে চুপচাপ একটি আগুনের চুল্লীর পাশে বসে' বসে' নিঃসীম আনন্দের স্পর্শে উষ্ণ হয়ে ওঠা—আহা, অরণ্যের নির্জন শান্তি তার কাছে তুচ্ছ। কিংবা ক'জন বন্ধুবান্ধব মিলে এই সন্ধ্যায় বসে' মনের স্রোত বইয়ে দেওয়া—তার সঙ্গে কি নদীর স্রোতের তুলনা হয়? তুচ্ছ, নদী সেখানে তুচ্ছ। এবং শোন হে রুপার্ট গ্র্যান্ট, আর মাত্র এক-মিনিটের মামলা,—তারপরেই তুমি চমৎকার এক ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় বসে' বোতল বোতল মদ ওড়াতে পারবে—এ আশ্বাস তোমাকে আমি দিলাম। শুনে খুশী হলে তো?"

বেসিল বলে কী! রুপার্ট এবং আমি ভয়ে ভয়ে একবার দৃষ্টি বিনিময় করলাম। এল্ম্-গাছের বুকে বাতাসের একটানা হাহাকার। বেসিল বলেই চলল, "দেখে নিও তোমরা, সত্যিসত্যিই লেফ্‌টেন্যান্ট বেশ সজ্জন ব্যক্তি, রীতিমত অতিথিবৎসল। আগে যখন ইয়ারমুথ্-এর চোরকুঠরিতে থাকতেন, খুব খাইয়েছিলেন আমাকে একদিন। আরো একদিন খুব খাতিরযত্ন করেছিলেন, তখন তিনি লণ্ডনের এক গুদামঘরে থাকতেন। খুবই ভদ্রলোক। তা ছাড়া তাঁর আরও একটা বড় গুণ আছে, আগেই সেকথা বলেছি।"

"বড় গুণ?" আমি শুধোলাম, "কী তার বড় গুণ?"

বেসিল জবাব দিল, "লেফ্‌টেন্যান্টের সবচাইতে বড় গুণ হলো তাঁর সত্যবাদিতা।"

রুপার্ট একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। রাগের চোটে মাটিতে পা

ভুঁজিয়ে বলল, "তাই নাকি! তা এই বুঝি তাঁর সত্যবাদিতার নমুনা? আর তোমারও বলিহারী বুদ্ধি; খেয়েদেয়ে কাজ নেই, নাহক খানিকক্ষণ আমাদের ছুটি করিয়ে মারলে।

পাছে ঠেসান দিয়ে বেসিল বলল, "এ তোমার অন্যায় রাগ রুপার্ট। সত্যিই তিনি সত্যবাদী, বড্ডো-বেশী সত্যবাদী; এতটা সত্যবাদী তাঁর না হলেও চলত। মুশকিল কি জানো, আমাদের মতো তিনি রং চড়িয়ে কথা বলতে শেখেন নি, আর সেইখানেই যতো গোল বেধেছে। তা সে যাই হোক, চলো—এবারে ঘরে ঢোকা যাক; নইলে আবার খেতে বসতে দেরি হয়ে যাবে।"

রুপার্টের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সারা মুখ তার ভয়ে শাদা হয়ে গিয়েছে। ফিস্‌-ফিস্‌ করে সে আমার কানে কানে বলল, "ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছেন? ঘর কোথায় এখানে? বেসিল কি স্বপ্ন দেখছে নাকি?"

তা-ই হবে বোধহয়; বেসিল বোধহয় তার সম্বিৎ হারিয়েছে। চিৎকার করে বলে উঠলাম, "কোথায় যেতে বলছ হে, ঘর কোথায় এখানে?" সেই নির্জন ধূ ধূ প্রান্তরে দাঁড়িয়ে প্রশ্নটাকে যেন নিজের কানেই কেমন অবাস্তব শোনাল।

"কেন, এই তো"—বলে একলাফে বেসিল সেই বিরাট গাছে চড়ে বসল। দেখলাম তরতর করে সে উপরে উঠে যাচ্ছে। একটু বাদেই সে শাখাপ্রশাখা আর নিবিড় পত্রগুচ্ছের আড়ালে মিলিয়ে গেল। দূর থেকে তার আহ্বান শুনতে পেলাম; অনেক উঁচু থেকে সে বলছে, "এসো হে, উঠে এসো সব। শীগগির এসো, নইলে আবার খেতে বসতে দেরি হয়ে যাবে।"

বিরাট দুটি এল্‌ম্‌-গাছ, একেবারে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে তারা আকাশে উঠে গেছে। ডালপালা দিয়ে এমনভাবে জড়িয়ে ধরেছে পরস্পরকে যে, সহজেই পা রেখে রেখে ওপরে উঠে যাওয়া যায়।

আমরাও বোধহয় পাগল হয়ে গিয়েছিলাম; তাই যদি না হবে তো কী দরকার ছিল বেসিলের আহ্বানে সাড়া দেবার? ডালপালার সিঁড়িতে পা রেখে রেখে আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। উপরে, উপরে, আরো উপরে। মনে হলো,

এ-সিঁড়ি বোধহয় আকাশে গিয়ে ঠেকেছে; আর সেখানে স্বর্গের দরজায় দাঁড়িয়ে বেসিল গ্রান্ট বোধ হয় সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছে আমাদের।

তখন বোধহয় মাঝবরাবর গিয়ে পৌঁচেছি। গায়ে হঠাৎ কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ার স্পর্শ লাগতেই আমার সম্বিৎ ফিরে এল। এ কী করছি আমরা! এ কী পাগলামি করছি! সমস্ত ব্যাপারটার নিদারুণ হাস্যকরতা যেন একমুহূর্তে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। এক মিথ্যাবাদী ধাপ্পাবাজ, তার সন্ধানে বেরিয়ে কিনা শেষ পর্যন্ত ক'জন সুস্থ মানুষে মিলে গাছে চড়ে বসে আছি! আর সেই হতভাগা হয়তো এতক্ষণে সোহোর কোনও নোংরা রেস্তোরাঁয় বসে' প্রাণপণে হাসছে আমাদের ঠকাতে পেরে। তবু তো সে আমাদের এই বৃক্ষারোহণ-পর্বের কথা জানে না। জানলে বোধহয় হাসতে হাসতে তার দম আটকে যেত। নিজেদের এই মূর্খতার কথা আর-একবার ভাবতেই আমার মাথা ঘুরে গেল। গাছ থেকে প্রায় পড়েই যাচ্ছিলাম, হাত বাড়িয়ে একটা ডাল আঁকড়ে ধরে কোনও-ক্রমে আত্মরক্ষা করলাম।

আমার ঠিক ওপরেই চলো রুপার্ট; আর-কয়েক ধাপ সে এগিয়ে রয়েছে। হঠাৎ তার গলা শুনতে পেলাম, "মিঃ সুইনবার্ণ, এ কী পাগলামি করছি আমরা, চলুন—নীচে নামা যাক।" প্রস্তাব শুনে বুঝলাম, তারও সম্বিৎ ফিরে এসেছে।

বললাম, "কিন্তু বেসিলের কি হবে? তাকে ফেলে তো আর চলে যাওয়া যায় না"—

"বেসিল?" রুপার্ট জবাব দিল, "সে এতক্ষণে ঢের উঁচুতে উঠে গেছে। শকুনের বাসার মধ্যে লেফ্‌টেন্যান্ট কীথ্‌কে তালাশ করছে হয়তো। যতো সব ছেলেমানুষী!"

বলতে কি, আমরাও ততক্ষণে অনেক উঁচুতে উঠে এসেছি। গাছের গুঁড়ি-গুলো তখন তীব্র বাতাসে মৃদু মৃদু আন্দোলিত হচ্ছে। নীচের দিকে তাকিয়ে আমি স্থির হয়ে গেলাম; দেখলাম, এল্‌ম্‌-গাছ দু'টি একেবারে সরাসরি মাটিতে গিয়ে মিশেছে। ঠিক এ-ধরণের দৃশ্য দেখতে আমরা অভ্যস্ত নই। সাধারণত নীচে দাঁড়িয়ে দেখে থাকি যে, উঁচু উঁচু গাছগুলি সব আকাশে গিয়ে মিশেছে।

এই প্রথম ব্যাপারটাকে আমি উল্টো-দিক থেকে দেখলাম। উপরে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, সেই দীর্ঘ এল্ম্-গাছ দুটি একেবারে মাটিতে গিয়ে মিশেছে। আবার আমার মাথা ঘুরে গেল।

সামলে উঠে ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, "কোনও মতেই কি বেসিলকে এখন ফিরিয়ে আনা যায় না ?"

"না," রুপার্ট জবাব দিল, "সে এতক্ষণে ঢের উপরে উঠে গেছে। তাই যাক্; একেবারে মগডালে গিয়ে পৌছুক। সেখানে গিয়ে যখন দেখবে যে সবকিছু ফক্কিকার তখন হয়তো তার জ্ঞান ফিরে আসতে পারে।" এখন সে উন্মাদ; ঐ শুনুন, আপন মনে কী যেন সে বলছে।"

বললাম, "আমাদের উদ্দেশ্যেই কিছু বলছে না তো ?"

রুপার্ট বলল "না, সেক্ষেত্রে সে চেঁচিয়ে কথা বলত। কিন্তু, এই বা কি রকম ! মাঝে মাঝেই অবশ্য ও পাগল হয়ে যায়, কিন্তু আগে আর কখনো এভাবে নিজের সঙ্গে কথা কইতে শুনি নি। নাঃ, লক্ষণ বড় খারাপ; আজ বোধ হয় একেবারেই খেপে গেছে।"

বললাম, "তাই হবে হয়তো।" তারপর কান পেতে কথাগুলি শুনতে লাগলাম। অনেক উঁচু থেকে ভেসে আসছে বেসিলের গলা; মৃদু, অস্পষ্ট। নিবিড় পত্রগুচ্ছের আড়ালে বসে আপনমনে সে কথা কইছে, আবার হাসছেও মাঝে মাঝে।

কিছুক্ষণ আমরা স্তব্ধ হয়ে শুনলাম। তারপর রুপার্ট হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, "হা ঈশ্বর ! এ কী কাণ্ড !"

বললাম, "কেন, কেন—কী হয়েছে ? খোঁচাটোচা লাগল নাকি ?"

"না," ভয়ত্রস্ত অদ্ভুত গলায় রুপার্ট বলল, "ভাল করে একবার বেসিলের কথাগুলি শুনুন। কিছু বুঝতে পারছেন না ? বুঝতে পারছেন না যে আর-কারুর সঙ্গে ও কথা বলছে ?"

বললাম, "তাই নাকি ? তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলছে।"

"না, তাও না। অন্য কারুর সঙ্গে কথা বলছে নিশ্চয়ই।"

হঠাৎ একটা দমকা-হাওয়ায় আমাদের মাথার ওপর থেকে ডালপালাগুলি একটু

সরে গেল একপাশে ; তারপর বাতাসের বেগটা একটু সরে আসতেই ফের বেসিলের গলা শুনতে পেলাম। এবারে আর আমার কোনও সন্দেহ রইল না। ঠিকই বলেছে রুপার্ট—শুধু বেসিলেরই গলা নয়, আরেকজনের গলাও শুনতে পেলাম আমি।"

আর হঠাৎ সেই উঁচু ডাল থেকে আমাদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠল বেসিল, "এসো হে, উপরে এসো সবাই। দেখবে এসো, লেফটেন্যান্ট কীথ তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন।"

একটু পরে লেফ্‌টেন্যান্টের গলাও শুনতে পেলাম, "আসুন, আসুন। বড়োই খুশী হলাম আপনাদের দেখে। তা বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, ভেতরে আসুন।"

উপরে তাকিয়ে দেখি ডালপালার ভিড় সরিয়ে দিয়ে লেফ্‌টেন্যান্ট তাঁর মুখ বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই বিবর্ণ তবু সহাস্য মুখ,—সেই কুচকুচে কালো সযত্ন-বিন্যস্ত গোঁফ। চিনতে আমাদের কষ্ট হলো না।

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমরা, মনে হলো আমাদের বাক্‌শক্তি কেউ হরণ করে নিয়েছে। মোহাবিষ্টের মতো আমরা উপরে উঠতে লাগলাম। উপরে, আরো উপরে। উঠে দেখি, তাজ্জব ব্যাপার। গাছের ওপরেই ছোট্ট একখানা গোল-মতন ঘর। দেয়াল বৃত্তাকার, মেঝেতে গদি আঁটা। টিমটিমে একটা বাতি জ্বলছে একপাশে। দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো তাক, বই সাজানো। আসবাব-পত্রের মধ্যে একটা গোলটেবিল, টেবিল ঘিরে বসবার আসন। ঘরের মধ্যে সবশুদ্ধ তিনজন লোক। প্রথমজন বেসিল। বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে। মুখে একটা নির্লিপ্ত প্রশান্তি। মৌজ করে সে সিগারেট টানছে, ধীরেসুস্থে ধোঁয়া ছাড়ছে। দ্বিতীয় ব্যক্তি লেফ্‌টেন্যান্ট ড্রামণ্ড্‌ কীথ্‌। লেফ্‌টেন্যান্টকেও বেশ খুশী-খুশীই দেখাচ্ছে, তবে বেসিলের মতো তাঁকে ঠিক অতোটা নিশ্চিন্ত মনে হলো না। আর তৃতীয়জন হলেন মিঃ মন্টমরেন্সী, সেই গুঁকো হাউস-এজেন্ট। লেফটেন্যান্টের বর্ষা, তাঁর সবুজ ছাতা, তাঁর তরোয়াল—সেগুলোও বাদ পড়েনি—দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে। আর তাঁর সেই মেনোমদের বোতলটা, সযত্নে সেটা ম্যান্টলপীসের ওপর রক্ষিত। ঘরের কোণে সেই বাইস্কেলটাও রয়েছে দেখলাম।

টেবিলটার ঠিক মাঝখানে বড় একবোতল শ্যাম্পেন। গ্লাসগুলি সব পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। এবারে আমাদের বসে পড়লেই হয়।

আর আমাদের অনেক অনেক নীচে বাতাসের সেই অবিশ্রান্ত একটানা গর্জন। গাছটাকে একটা আলোকস্তম্ভ বলে মনে হলো, তার পায়ের তলায় যেন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা এসে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। নাকি আমরা জাহাজে বসে আছি? ঘরখানা যেন তার ছোট্ট-একটা কেবিন; ঢেউয়ে ঢেউয়ে আন্দোলিত হচ্ছে।

গ্লাসে গ্লাসে স্থাম্পেন ঢালা হলো, তবু আমাদের উঠবার নাম নেই। বোকার মত আমরা বসে আছি, আমি আর রুপার্ট। বিস্ময়ের জের আমাদের এতটুকুও কাটে নি। বেসিলই কথা কইল সর্বপ্রথম। মৃদু হেসে বলল, "কি হে রুপার্ট, এখনো তোমার অবিশ্বাস? লেফটেন্যান্ট অবশ্য একটু বিশ্রীরকমেরই সত্যবাদী, কিন্তু তাই বলে—"

বোকার মতো আমতা আমতা করতে লাগল রুপার্ট, "কিছুই আমি বুঝতে পারছি না বেসিল। লেফটেন্যান্ট তো তাঁর ঠিকানা বলেছিলেন—"

সহাস্যে জবাব দিলেন লেফটেন্যান্ট, "ঠিকই বলেছিলাম। কনস্টেবলটি আমাকে জিজ্ঞেস করল, আমি থাকি কোথায়। আমি বললাম, 'এল্ম্-নিবাস, বাক্সটন কমন।' তা আমি কিছু অন্যায় বলেছি? এইটেই তো আমার ঠিকানা, এইখানেই তো আমি থাকি। মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সীর সঙ্গে তো আপনাদের আগেই আলাপ হয়ে গেছে; এই ধরণের যতো বাড়ি রয়েছে—ইনি হচ্ছেন তারই এজেন্ট। এ ব্যাপারে ইনি একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। এসব বাড়ি আবার চট্ করে কাউকে ভাড়া দেওয়া হয় না, ব্যাপারটার বৈশিষ্ট্য তাতে নষ্ট হতে পারে। তবে আমাকে তো আপনারা জানেন, বাসাবদল আমার একটা নেশা বললেও চলে। আমার কি আর এসব অজানা থাকে?"

রুপার্ট ততক্ষণে একটু চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সাগ্রহে সে জিজ্ঞেস করল, "তাই নাকি মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী? আপনি বুঝি গোছো-বাড়ির এজেন্ট?"

মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী তার এই আকস্মিক প্রশ্নাঘাতে একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন।

অপ্রস্তুতভাবে পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে আঙুলে জড়িয়ে ছোট্ট একটা নির্বিষ সাপকে তিনি টেনে বার করে আনলেন, তারপর অন্যমনস্কভাবে সেটাকে টেবিলের ওপরে ছেড়ে দিয়ে বললেন, "তা, হ্যাঁ—তাও বলতে পারেন। মানে হচ্ছে আমার বাবা-মা চেয়েছিলেন আমি বাড়ির এজেন্ট হই। তা আমার আবার ছোটবেলা থেকেই জীবজন্তু, গাছপালা এই সব নিয়ে নাড়াচাড়া করবার শখ্। বাবা-মা—কেউ আর আজ বেঁচে নেই। এখন, তাঁদের ইচ্ছেটাকেও তো অসম্মান করা যায় না;—তাই আমি এই গেছো-বাড়ির এজেন্সী খুলেছি। এতে করে' আমার ভূমিকাই বজায় রইল। তাঁদের কথাও রাখা হলো, সেইসঙ্গে আমার নিজের শখটাও মিটল। মানে এও তো একহিসেবে উদ্ভিদতত্ত্বেরই ব্যাপার; কেমন তাই না?"

রুপার্ট আর হাসি চেপে রাখতে পারলনা; হাসতে হাসতে বলল, "নিশ্চয়; তাতে আর সন্দেহ কি। তা মিঃ মণ্ট্‌মরেন্সী, ভাড়াটে জোটে তো আপনার?"

"জোটে, তবে খুব কম। তা ছাড়া সব লোককে আবার ভাড়া দেওয়া হয় না।" জবাব দিয়ে তিনি লেফটেন্যান্টের দিকে তাকালেন। সত্যি বলতে কি, আমার মনে হলো—লেফটেন্যান্ট ড্রামণ্ড্ . কীথ্ই আপাতত তাঁর একমাত্র ভাড়াটে।

সিগারেটে টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়ল বেসিল। তারপর বলল, "দুটি কথা তোমাদের স্মরণ রাখা দরকার। প্রথমটি হ'ল এই যে, কারুর সম্ভাব্য আচরণ সম্পর্কে কোনও অনুমান করতে গিয়ে কক্ষণো যেন তালগোল পাকিয়ে ফেলো না। মনে রাখবে, যাঁরা হিসেবী লোক—তাঁরা সব ব্যাপারেই হিসেবী; আর যাঁরা পাগলাটে—তাঁরা সব ব্যাপারেই পাগলাটে। দ্বিতীয় কথাটি হলো এই যে, সব চাইতে যেটা স্বাভাবিক সত্য, সেইটেকেই আমাদের সব-চাইতে অদ্ভুত বলে' মনে হয়। এই লেফটেন্যান্টের কথাই ধরোনা কেন। লেফটেন্যান্ট যদি আজ শহরের এক ঘিঞ্জিপাড়ার মধ্যে একটা পাকাবাড়ি কিনতেন, আর তার নাম দিতেন 'এল্ম্-নিবাস', তো তোমাদের কাছে সেটা একটুকুও অদ্ভুত ঠেকত না। লেফটেন্যান্টের পক্ষে সেই অস্বাভাবিক নামকরণ মিথ্যাচরণেরই শামিল

হতো এবং সেই বিদ্যাটাকেই তোমরা সহজ মনে গ্রহণ করতে। বর্তমান ক্ষেত্রে লেফটেন্যান্ট তাঁর বাড়ির একটা সত্যি-নাম দিয়েছেন, তা সত্ত্বেও তার অর্থ তোমরা বুঝতে পারো নি।"

লেফটেন্যান্ট ভ্রামণ্ড কীথ-এর মুখে একটা স্মিতহাস্য ফুটে উঠল; তিনি বললেন, "থাক থাক, ওকথা এখন থাক। নিন, শ্যাম্পেনের গ্লাশ তুলে নিন সবাই; যা হাওয়া বইছে সব নইলে উল্টে যাবে।"

মদের গ্লাশে চুমুক দিলাম আমরা। বাইরে তখন ঝড়ো হাওয়া বইছে; হাওয়ায় হাওয়ায় 'এল্‌ম্‌-নিবাস' মৃদুমন্দ আন্দোলিত হতে লাগল।

পঞ্চম পর্ব : নৃত্যের তালে তালে

বেসিল গ্র্যান্টের বন্ধুবান্ধব খুব অল্প। তা-বলে কেউ তাকে অসামাজিক ঠাউরে নেবেন না। যে-কোনও লোকের সঙ্গেই হোক, যে-কোনও জায়গাতেই হোক, দিল খুলে সে আড্ডা জমাবে। কুশলপ্রশ্নাদি জিজ্ঞেস করবে। পৃথিবীকে সে যেন স্টেশনের ওয়েটিং রুম কি একটা চলন্ত ওমনিবাসের মত গ্রহণ করেছে। একটু বাদেই কে কোথায় চলে যাব ঠিক নেই; সুতরাং, যে দু-পাঁচজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হচ্ছে, নাও—আশ মিটিয়ে তাঁদের সঙ্গে আড্ডা জমিয়ে নাও।

সত্যিই তাই। এই আজ কিছুক্ষণের জন্যে যাদের সঙ্গে সে গল্পগুজবে মত্ত হয়ে উঠল, আগামীকাল তার জীবন থেকে তারা মুছে যাবে একেবারে। এক-আধজন শুধু লেপটে থাকবে শেষ পর্যন্ত; বেসিলের তারা আমৃত্যু সহচর।

বেসিলের বন্ধুগোষ্ঠী সঙ্কীর্ণ; তারা সব বিচিত্র লোক; পরস্পরের সঙ্গে তাদের এতটুকুও মিল নেই। একবার যদি দেখেন তাদের, মনে হবে বেসিল যেন ইচ্ছে করেই উল্টোপাল্টা সব 'টাইপ্‌' জুটিয়ে রেখেছে। মনে হবে, মানুষ নয়, মালগাড়ি-থেকে-খসে-পড়া এক-একটি মাল যেন। জনকয়েকের একটু পরিচয় দিই। একজন

হচ্ছেন ঘোড়ার ডাক্তার, চেহারাটা তাঁর জকীর মতো। অন্যজনের মুখে পাকা ধপধপে দাড়ি; কথাবার্তা ধোঁয়াটে। কী তার অর্থ—ঈশ্বর জানেন। তৃতীয়জন এক ছোকরা-ক্যাপ্টেন, চেহারায় কোনও উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য নেই। চতুর্থজন এক ডেন্টিস্ট, দাড়ি কামানো। এঁর চেহারাও নিতান্তই বৈশিষ্ট্যহীন; ডেন্টিস্টদের সব যে-ধরণের চেহারা হয়ে থাকে ঠিক সেইধরণেরই আর কি। বেসিলের আর-এক বন্ধু হচ্ছেন মেজর ব্রাউন। তাঁকে আপনারা চেনেন; হ্যাঁ—সেই বেঁটেখাটো কিটকাট ভদ্রলোক। বেসিলের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপ এক হোটেলে। টুপি নিয়ে কথা হচ্ছিল; বেসিল এক-একটা মন্তব্য ঝাড়ে আর তিনি হেসে গড়াগড়ি যান। ব্যস্, বন্ধুত্ব জমে গেল। একসঙ্গে একই গাড়ীতে তাঁরা বাড়ি ফিরলেন। তারপর, যদ্দিন পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন, হপ্তায় দুদিন তাঁরা এ-ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়েছেন। এ-ব্যবস্থার আর কোনও নড়চড় হয়নি। আর আমার সঙ্গে যখন ওর প্রথম দেখা, তখনো ও জজ্-এর চাকরি করছে। ন্যাশনাল লাইব্রেরী ক্লাবের গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে আলাপ হলো। প্রথমে আরম্ভ হয়েছিল আবহাওয়া নিয়ে, শেষপর্যন্ত তা রাজনীতি এবং ঈশ্বরের অস্তিত্বে গিয়ে ঠেকল। তা এতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। মনে রাখবেন, অচেনা লোকদের সঙ্গেই আমরা সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলাপ করে থাকি। এ আমাদের মজ্জাগত স্বভাব।

এবং এর কতকটা যুক্তিসঙ্গত হেতুও বর্তমান। কেউ যখন আমাদের চেনা হয়ে যায়, তখন বড় মুশকিল। একবার মনে হয়, এঁর চেহারাটা বোধ হয় আমার এক দূরসম্পর্কের কাকার মতো, পরক্ষণেই আবার তার গোঁফের দিকে নজর পড়ে। মন উচাটন হয়, দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে যায়। ফলে আর উচ্চস্তরের আলাপ জমাবার উপায় থাকে না। অপরপক্ষে যে-লোক আমাদের সম্পূর্ণ অচেনা, একমাত্র তারই মধ্যে বোধ হয় মানুষের শাশ্বত রূপটিকে অবলোকন করা সম্ভব। সেইজন্যেই তার সঙ্গে কথা কয়ে সুখ, সেইজন্যেই বুঝি ঈশ্বর সম্পর্কেও তার সঙ্গে আলাপ করতে সাধ যায়।

সে যাক্। বেসিলের বন্ধুগোষ্ঠী নিয়ে কথা হচ্ছিল। তার মধ্যে প্রফেসর চ্যাড লোকটি বড় মজার। নৃতাত্ত্বিক মহলে (এ মহল আমাদের ধরাছোঁয়ার

বাইরে, তবে শুনেছি পরিবেশটা নাকি বিচিত্র) খুব নাম-ডাক তাঁর। অসভ্য আরণ্য বর্বরদের সঙ্গে ভাষার কি সম্পর্ক—সে সম্পর্কে তাঁর মতামতকে সেখানে প্রামাণ্য বলে ধরে নেওয়া হয়। তবে ব্লুমসবেরীর হার্ট স্ট্রীট অঞ্চলের বাসিন্দারা তাঁকে শুধু নিছক একজন দাড়িওয়ালা চশমাধারী গোবেচারা টেকো ভদ্রলোক বলেই জানে। মুখ দেখে মনে হয়, ভদ্রলোক বোধহয় জীবনে কারুর ওপর চটেননি, কি করে চটতে হয় তাও ভুলে গেছেন। মাঝে মাঝে তাঁকে ব্রিটিশ মিউজিয়ম, আর নয়তো শাদামাঠা দু-একটা চায়ের দোকানে দেখা যায়। হাতে একগাদা বই এবং একটি ছাতা। বই কিংবা ছাতাবিহীন অবস্থায় কেউই তাঁকে কখনো দেখেনি। মিউজিয়মের পারসিক-বিভাগের চ্যাংড়া গবেষকদের ধারণা, ও-দুটি জিনিসকে তিনি তাঁর শয্যাসঙ্গী হিসেবেও গ্রহণ করেছেন। অধ্যাপক থাকেন শেফার্ডস্ বুশ্ অঞ্চলে। ছোট্ট একটি বাড়িতে তাঁর আস্তানা। সঙ্গে থাকেন তাঁর তিন বোন। সবকটি বোনের দিল্ ভালো, চেহারা খারাপ। অধ্যাপক সুখী লোক। ছাত্র-জীবনে পড়ুয়া-ছেলে ছিলেন; আর পড়ুয়ারা দেখবেন জীবনে কখনো অসুখী হয় না। তবে হ্যাঁ, একটা কথা। এ-জীবনে সুখ আছে, শান্তি আছে,—তবে বৈচিত্র্য নেই। প্রফেসর চ্যাড-এর জীবনেও নেই। মাঝে মাঝে রাত্তিরবেলায় যখন বেসিল এসে ঢুঁ মারে তাঁর বাড়িতে, একমাত্র তখনই শুধু কথায়-বার্তায় আর হাসিঠাট্টার আমেজী উত্তেজনায় সারা বাড়িটা যেন সরগরম হয়ে ওঠে।

বেসিলের বয়েস তা প্রায় বছর ষাটেক হবে। তা সত্বেও তার মনের একটি শিশু-সত্তা বর্তমান; সুযোগ পেলেই সেটি খলবলিয়ে ওঠে। এটা আবার বেশীর ভাগ ঘটে চ্যাড-এর বাড়িতেই। সেই সন্ধ্যাটির কথা, প্রফেসরের জীবনের সেই চরম বিপর্যয়ের মুহূর্ত, এখনো আমার স্পষ্ট মনে আছে। বেসিল এবং চ্যাড—দুজনেই আমার বন্ধু-লোক। মাঝে মাঝে তাই আমারও নেমন্তন্ন হতো প্রফেসরের ওখানে। সেদিনও আমি উপস্থিত, সেদিনও বেসিলের খুশ-দিল্। প্রচুর হাসছিল সে।

কথা উঠেছিল প্রফেসরেরই একটি প্রবন্ধ নিয়ে। প্রফেসর পণ্ডিতলোক, সেইসঙ্গে মধ্যবিত্ত। ফলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যা হয়, তিনি র‍্যাডিক্যাল

মতাবলম্বী। তবে একটু গুরুগম্ভীর পুরনো ধাঁচের। বেসিলও র‍্যাডিক্যালপন্থী; সেই দলের র‍্যাডিক্যাল, অধিকাংশ সময়েই যারা র‍্যাডিক্যাল পার্টিরই কঠোর সমালোচনায় মগ্ন থাকে। এমন লোক দেখবেন আকছার আপনার চোখে পড়বে। যা যে-কথা হচ্ছিল। সম্প্রতি এক পত্রিকায় প্রফেসরের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। প্রবন্ধের নাম, 'জুলু স্বার্থ ও নয়া ম্যাকাস্লো সীমান্ত'। এতে তিনি ওখানকার অধিবাসীদের আচার-অনুষ্ঠান সম্পর্কে তাঁর গবেষণালব্ধ তথ্যাদির একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। সেইসঙ্গে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন ইংরেজ এবং জার্মান কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। বলেছেন যে, এতে করে স্থানীয় অধিবাসীদের আচার-অনুষ্ঠানের ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে।

প্রফেসর বসে আছেন। সামনে সেই পত্রিকাখানি। আলো লেগে তাঁর চশমার কাচ চিকচিক্ করছে। কপাল কোঁচকানো। রাগে নয়, বিমূঢ় বিস্ময়ে। আর ওদিকে ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে বেসিল গ্র্যান্ট; চেঁচিয়ে কথা কইছে, মেঝেতে পা ঠুকছে। খুশি তার উপচে পড়ছে যেন। প্রফেসর তাতে আরো বিস্মিত।

বেসিল বলছিল, "না হে চ্যাড, তোমার ওই গবেষণা সম্পর্কে আমার একবিন্দুও আপত্তি নেই,—আপত্তিটা হচ্ছে তোমার সম্পর্কে। জুলু-স্বার্থের তুমি একজন ধ্বজাধারী তা আমি জানি। এ-ও জানি যে, কাজটা তুমি ভালই করছ। তবে সেইসঙ্গে এ-কথাও আমি বলব, জুলুদের প্রতি তোমার অন্তরের কোনও টান নেই। তুমি নিজেও সে কথা জানো। জুলুরা কিভাবে টম্যাটো রান্না করে, নাক ফোঁড়বার আগে কী-মন্ত্র তারা আউড়ে নেয়—সেসব তথ্য সম্পর্কে তুমি একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। তা সত্ত্বেও তুমি তাদের মন বোঝ না। আমি অনেক বেশী বুঝি। তুমি তথ্যবিদ্, আমি কর্মবিদ্। তুমি বেশী-পণ্ডিত, আমি বেশী-জুলু। মজাটা কি জানো? তোমার মতো সব বোসপুকুর ভদ্রলোকরাই দেখা যায় পৃথিবীর এই আদিম আরণ্য বর্বরদের জন্যে সবচাইতে বেশী আকুল! কী এর অর্থ? কেন এরকমটা হয়? চ্যাড, তুমি উদার, তুমি বিদ্বান, তুমি বুদ্ধিমান। সবই মানলাম। কিন্তু বাপু, আর যা-ই হও, নিজে তুমি বর্বর নও। সুতরাং বর্বরদের প্রতি তোমার একটা অন্তরের টান রয়েছে—এরকম কোনও ভ্রান্ত ধারণা তোমার না থাকাই

তাকো। যাও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের চেহারাখানাকে বেশ ভালোভাবে অবলোকন করো। তাহলেই আমার কথাটা তুমি বুঝতে পারবে। তাতেও বিশ্বাস না হয় তো তোমার বোনদের সব একে-একে জিজ্ঞেস করো। ইচ্ছে হলে ব্রিটিশ মিউজিয়মের লাইব্রেরীয়ানের সঙ্গেও আলোচনা করতে পারো এ-নিয়ে। অতোরই বা দরকার কি, তোমার এই ছাতাটার কথাই ধরোনা কেন—বলে সে নিরীহনির্জীব সেই ছাতাটিকে তুলে ধরে বলল, "চ্যাড, তোমার এই ছাতাটার কথাই ধরো। গত দশ বছর ধরে তোমাকে আমি নিত্যনিয়মিত এই ছাতাটি ব্যবহার করে আসতে দেখছি। দেখে মনে হয়, আটমাস বয়েস থেকেই তুমি এই ভদ্র পদার্থটিকে হাতে করে ঘুরে বেড়াচ্ছ। অথচ আজ পর্যন্ত কি তোমার একবারও দুর্বোধ্য আদিম উল্লাসে চেঁচিয়ে উঠে এটাকে একটা বর্শার মতো এইভাবে ছুঁড়ে মারতে ইচ্ছে হয়েছে?"

বলেই সে সাঁ করে সেই ছাতাটাকে ছুঁড়ে মারল। প্রফেসরের টাকের ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল সেটা, স্তূপীকৃত একগাদা বইয়ের ওপর গিয়ে পড়ল। ধাক্কা লেগে থরথর করে কাঁপতে লাগল একটা ফুলদানি।

প্রফেসরের মধ্যে কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। একাগ্র দৃষ্টিতে আলোর দিকে তাকিয়ে তিনি বসে আছেন, কপালে চিন্তার কুঞ্চন। মৃদুস্বরে তিনি বললেন, "বেসিল, হুট করে কোনও সিদ্ধান্ত করে বসাটা ঠিক নয়, তাকে হঠকারিতা বলে। যা বলবে একটু ভেবেচিন্তে বলো। মনে রেখো, পৃথিবীর এই আদিম অধিবাসীরা বিবর্তনের একটা বিশেষ স্তরে এখন আটকা পড়ে আছে। জীবনধারণের পক্ষে যদি অনুকূল হয় তো সেখানেই তাদের বেশ কিছুদিন আরো কেটে যেতে পারে। এখন এই যে একটি বিশেষ স্তরকে আঁকড়ে ধরে থাকার প্রয়োজনীয়তা—এরও যথার্থ মূল্যায়ন প্রয়োজন। প্রয়োজনের সেই মূল্যায়ন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পন্থা অবলম্বন—প্রকৃতপক্ষে এ-দুয়ের মধ্যে কিছুমাত্র অসামঞ্জস্য নেই।" প্রফেসর চ্যাড একটু থেমে থেমে, কাটাকাটাভাবে কথা বলছিলেন। প্রসঙ্গের জের টেনে তিনি বললেন, "কিছুমাত্রও নেই। এ কথাগুলো তাদের স্বপক্ষেই বলা হলো। কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও আমাদের মনে রাখা দরকার যে, বিবর্তনের সেই যে

একটি বিশেষ স্তরে তারা এখনও বাঁধা পড়ে রয়েছে, মহাজাগতিক জীবনযাত্রার ক্রম-অগ্রগতির সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করে দেখতে গেলে তাকে একটি নিতান্তই অনুন্নত স্তর বলে ধরে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

প্রফেসর থামলেন। স্থিরভাবে তিনি কথা বলছিলেন, ঠোঁটদুখানাই একটু নড়ছিল শুধু। তা-ও স্থির হয়ে এল। আলোর দুটি প্রতিবিম্বিত বিন্দু শুধু তাঁর চশমার কাঁচে চিক্‌চিক করতে লাগল।

গ্র্যান্ট তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারলাম হাসির দমকে সে কেঁপে কেঁপে উঠছে। হাসি চেপে সে বলল, "নাঃ, কোনই অসামঞ্জস্য নেই। যে-দুটি দিক তুমি দেখালে, তার মধ্যে অন্তত নেই। কিন্তু বৎস, মেজাজের মধ্যে অসামঞ্জস্য রয়েছে। ক্রম-বিবর্তনের যে বিশেষ-স্তরটিতে জুলুরা এখন রয়েছে, কোনমতেই তাকে আমি অনুন্নত বলতে রাজী নই। জুলুরা শুনেছি চাঁদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে, শুনেছি অন্ধকারে তারা ভূতের ভয় পায়। তা তাতে বোকামিটা কি হলো? আমি অন্তত এর মধ্যে কিছুমাত্র নির্বুদ্ধিতা দেখতে পাচ্ছি না। আমার তো বরং একে রীতিমত একটা তাত্ত্বিক ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। জীবনের রহস্য কিংবা তার অনিশ্চয়তাকে উপলব্ধি করেছে বলেই কি তাদের নির্বোধ ঠাউরে নিতে হবে? অন্ধকারে আমরা ভূতের ভয় পাই না। খুবই সত্যি কথা। কিন্তু এমনও তো হতে পারে যে, ভূতের ভয় না-পাওয়াটাই আমাদের বোকামি?"

হাতের তৈরী একটি পেপার-নাইফ দিয়ে কাগজখানির পাতা কাটছিলেন প্রফেসর। ভঙ্গীতে পাণ্ডিত্যের অগাধ নিষ্ঠা। মুখ না তুলেই তিনি বললেন, "গোড়াতেই তুমি ভুল করেছ। এমন একটা যুক্তির ওপর নির্ভর করে তুমি তোমার সিদ্ধান্তে গিয়ে উপনীত হচ্ছ যেটা সত্যিও হতে পারে, মিথ্যেও হতে পারে। যতটুকু আমি বুঝতে পারছি তাতে তোমার যুক্তিটা হচ্ছে এই যে, মানব-সভ্যতার যে-স্তরে আমরা এখন উপনীত হয়েছি জুলু-সভ্যতার থেকে সেটা কিছুমাত্রও উন্নত নয়, এমন কি অনুন্নতও হতে পারে। কেমন, তাই নয়? তা, সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ের ব্যাপারে সর্বক্ষেত্রেই কতকগুলি মৌলিক যুক্তি থাকে। যেমন ধরো নৈয়ায়িকবাদের অস্তিত্বস্বীকার, কিংবা পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার। এগুলো এক-

একটা মৌলিক যুক্তি। যে ব্যক্তি যে-ধরণের যুক্তিকে মৌলিক যুক্তি হিসেবে গ্রহণ করবে তার সিদ্ধান্তও ঠিক সেইরকমই হবে। তোমার যুক্তিটাও ঠিক তেমনি একটা মৌলিক যুক্তি। এ নিয়ে কোনও তর্কাতর্কি চলে না, কিন্তু সেইসঙ্গে একথাও আমি বলব যে, মৌলিক যুক্তি তোমার যা-ই হোক না কেন, সে-যুক্তিকে তুমি নিঃসংশয়ে গ্রহণযোগ্য বলে প্রমাণ করতে পারোনি। বড়জোর যুক্তিটা স্ব-বিরোধী নয়; কিন্তু ব্যস, ওই পর্যন্তই।"

বেসিল তাঁর মাথা লক্ষ্য করে একখানা বই ছুঁড়ে মারল; তারপর একটা চুরুট ধরিয়ে বলল, "ব্যাপারটা তুমি বুঝতেই পারোনি। বুঝিয়ে বলছি। এই ধরো চুরুট খাওয়া নিয়ে তোমার কোনও আপত্তি নেই, কেমন? নিজে যদিও ধূমপায়ী, তা সত্ত্বেও ধূমপান জিনিসটাকে আমি একটা জঘন্য বর্বর ব্যাপার বলেই মনে করি। আসলে এটা তা-ই। অথচ এ-নিয়ে তোমার আপত্তি নেই কিছুমাত্র। তাতেই আমি অবাক হচ্ছি। আমার কথা অবিশ্যি আলাদা। বছর দশেক বয়েস থেকেই আমি চুরুট খাওয়া সুরু করেছি। তখন থেকেই আমার জুলু-জীবনের সূচনা। আসলে আমি বলতে চেয়েছিলাম যে, তুমি একজন বৈজ্ঞানিক; এবং সেইসূত্রে জুলুদের সম্পর্কে অনেক তথ্যই হয়তো তুমি জানো। কিন্তু বাপু আমিও কিছু কম জানি না। হয়তো তোমার থেকে বেশীই জানি। তার কারণ, আমি নিজেই একটি জুলু। মেজাজের দিক থেকে তাদেরই আমি স্বগোত্র। এবং এই কারণেই ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কে তোমার অভিমতটাকে এখনো আমি মেনে নিতে পারছি না। তুমি বলছ, গোড়ার দিকে কোনও ব্যক্তিবিশেষের একার চেষ্টায় একটা ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল; পরে ধীরে ধীরে তার বিকাশ হয়েছে। তোমার এই অদ্ভুত ধারণার সমর্থনে হরেকরকমের তথ্য-প্রমাণ তুমি হাজির করেছ। তথ্যগুলো পাণ্ডিত্যপূর্ণ, তাতে আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই। তা সত্ত্বেও তোমার ধারণাটা আমি মেনে নিতে অপারগ। তার কারণ আমার মন তাতে সায় দিচ্ছে না। মন বলছে, ভাষার সৃষ্টি হয়েছে অন্যভাবে—এভাবে নয়। যদি শুধোও কেন আমার মন একথা বলে তো তার উত্তরে আমি বলব, আমি নিজেই একটি জুলু। আমার মন তাই জুলুরই মন। যদি শুধোও জুলু বলতে আমি কী বুঝি তো সে-প্রশ্নেরও আমি

উত্তর দেয়। সাত বছর বয়সেই সে-ছেলে তন্নতন্ন করে সাদেক্সের একটি আপেলগাছে চড়তে পেরেছে, শহরের গলিঘুঁজির মধ্যেও যে বৃক্ষের স্বাদ পেয়েছে, সে-ই কুলু।"

"তোমার চিন্তাধারাটা দেখছি—" প্রফেসর চ্যাণ্ড সবেমাত্র তাঁর মুখ খুলেছিলেন, কথাটা তিনি শেষ করে উঠতে পারলেন না ; তাঁর এক বোন এসে ঘরে ঢুকলেন। ভদ্রমহিলার হাবভাব একটু পুরুষালি, এ-সব সংসারে এমনিই হয়। অনভ্যস্তভাবে দরজার একটা পাল্লার ওপর হাত রেখে প্রফেসরের উদ্দেশে তিনি বললেন, "জেম্‌স্‌, ব্রিটিশ মিউজিয়মের থেকে মিঃ বিংহ্যাম এসেছেন। আরেকবার তিনি দেখা করতে চান।"

বিহ্বল দৃষ্টিতে প্রফেসর তাঁর চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। দার্শনিক লোক, দর্শনটাই ভালো বোঝেন ; বাস্তবের সংস্পর্শে এলেই যেন কেমন থতমত খেয়ে যান। ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

বেসিল তাঁর বোনকে বলল, "মিস্‌. চ্যাণ্ড, যদি কিছু মনে না করেন তো একটা কথা বলি। শুনছি, ব্রিটিশ মিউজিয়ম নাকি গুণীকে এবারে তাঁর উপযুক্ত সম্মান দিতে এসেছে। সত্যি নাকি ? প্রফেসর চ্যাণ্ড তাহলে সত্যিই এবারে 'এশিয়াটিক ম্যানাস্‌ক্রিপ্‌ট্‌স্‌' বিভাগের কীপার হতে চললেন, কেমন ?"

ভদ্রমহিলার রুক্ষ-কঠিন মুখে আনন্দের আভা ছড়িয়ে পড়ল ; সেইসঙ্গে একটু বিষাদ। বললেন, "খুব সম্ভব। ভালোয়-ভালোয় চাকরিটা এখন হয়ে গেলে বাঁচি। সেইটেই এখন বড় কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জেম্‌স্‌-এর স্বাস্থ্য তেমন ভালো যাচ্ছে না, ওদিকে রোজগারের ধান্দায় অসম্ভবরকম খাটতে হচ্ছে। এখানে-ওখানে লেখা ছাপায়, ছাত্র পড়ায়। তার ওপর আবার রিসার্চের কাজ তো রয়েইছে। মাঝে মাঝে আমার ভয় হয়, শেষ পর্যন্ত ওর মাথাটাই না খারাপ হয়ে যায়। তা এতদিনে বোধ হয় সুদিন এল আমাদের, ঈশ্বর মুখ তুলে চাইলেন। কথাবার্তা একরকম পাকাপাকি হয়ে গেছে।"

"শুনে খুশী হলাম ;" চিন্তিত মুখে বেসিল বলল, "তবে কি জানেন, সরকারী ব্যাপার তো—সব কাজেই ওদের গড়িমসি ; নড়তে চড়তেই ওদের ছ' মাস কেটে

যায়। তাই বলছিলাম, খুব বেশী আশা করাটা কিছু ঠিক নয়। বলুন, চাকরিটা যদি না-ই হয় শেষ পর্যন্ত? নৈরাশ্যের ব্যথাটা তাহলে বড় তীব্র হয়েই বাজবে, তাই না? তার চাইতে বরং হলো-হলো না-হলো না-হলো, জিনিসটাকে এইভাবে নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ। অনেককেই আমি জানি, চাকরির ব্যাপারে তাঁরা এর থেকেও বেশী আশা পেয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তাঁরা নিরাশ হয়েছেন। অবশ্য চাকরিটা একবার যদি হয়ে যায় তো—"

তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে মিস্ চ্যাড বললেন, "তাহলেই সর্বরক্ষে। ঈশ্বর করুন, এবারে যেন একটু সুদিনের মুখ দেখি।"

মিস্ চ্যাড-এর কথা তখনও শেষ হয়নি, প্রফেসর এসে ঘরে ঢুকলেন; দৃষ্টি বিহ্বল।

সাগ্রহ কণ্ঠে বেসিল শুধোল, "কি হে চ্যাড, সত্যি?"

একটুখানি থতমত খেয়ে গেলেন প্রফেসর; তারপর দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, "না, এক-বিন্দুও সত্যি নয়। তোমার ঐ উক্তির মধ্যে তিন তিনটি মারাত্মক ভুল রয়েছে।"

"তার মানে?"

ধীরে ধীরে প্রফেসর বললেন, "মানে অতি সোজা। ঐ যে তুমি বলছিলে, জুলুজীবনের সারমর্ম তুমি উপলব্ধি করেছ, অথচ তার জন্যে তোমাকে—"

"ধুত্তোর জুলু-জীবন!" হো হো করে হেসে উঠল বেসিল, "বলি চাকরিটা পেলে তুমি?"

প্রফেসরের চোখেমুখে শিশুর বিস্ময় ফুটে উঠল যেন; বললেন, "ও, মিউজিয়মের ঐ কাঁপার-এর চাকরিটার কথা জিজ্ঞেস করছ বুঝি? হ্যাঁ, পেয়েছি। সে যাই হোক, তোমার যুক্তির যেটা প্রধান ত্রুটি—ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েই সেটা আমি ধরতে পেরেছি। সত্যনির্ণয়ে তথ্যের সাহায্য তো তুমি নাওইনি, তার ওপর আবার তোমার মনে একটা অদ্ভুত ধারণা জন্মেছে যে, তথ্যের সাহায্য নিতে গেলেই সত্য-নির্ণয় অসম্ভব হয়ে ওঠে।"

"যথেষ্ট হয়েছে, এবারে ক্ষ্যামা দাও বাপু!" বলে হাসতে লাগল বেসিল। অধ্যাপক-ভাই কক্ষান্তরে চলে গেলেন। হয়তো; হয়তো নয়।

প্রফেসর চ্যাড-এর বাড়ি থেকে যখন বেরুলাম, তখন অনেক রাত্তির। প্রফেসর থাকেন শেফার্ড বুশে, আমরা থাকি ল্যাম্বেথ। রাত্তিরটাও আমি বেসিলের ওখানেই কাটালাম। দীর্ঘ রাস্তা, যেতে-আসতে বেশ খানিকটা কষ্ট হয়। এমনিতেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম, শুয়ে পড়তেই দু-চোখ ঘুমে জড়িয়ে এল। ঘুম ভাঙল পরের দিন প্রায় দুপুরে। আলসেমি আমেজে আমরা ব্রেকফাস্ট টেবিলে এসে বসলাম। গ্র্যান্টকে কেমন যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন মনে হচ্ছিল। সকালের ডাকে যে চিঠিপত্তর এসেছিল সেদিকে সে ফিরেও তাকাল না। একখানা চিঠিও সে খুলে দেখত না বোধহয়, যদি না হঠাৎ ওপরকার চিঠিখানার ওপরে গিয়ে তার নজর পড়ত। আসলে সেটা চিঠি নয়, টেলিগ্রাম। তা সত্ত্বেও তার আচরণে তেমন কিছু বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। যেরকম ধীরমন্থর চালে সে ডিম ভেঙে নিচ্ছিল, চায়ে চুমুক দিচ্ছিল—টেলিগ্রামখানাকেও সেই একইভাবে খুলে নিল সে। পড়া শেষ হলো, তবু সে কথা কয় না। চাঞ্চল্যহীন শান্ত মূর্তি। অথচ তা সত্ত্বেও, কি জানি কেন, আমার মনে হলো, ভেতরে ভেতরে তার তোলপাড় চলছে ; ঢিলে স্নায়ুগুলো যেন টান-টান হয়ে উঠেছে হঠাৎ। তাই, হঠাৎ যখন সে তার চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, আমি খুব অবাক হলাম না। লাথি মেরে চেয়ারটাকে সে হটিয়ে দিল, তারপর লম্বা লম্বা পা ফেলে আমার পাশে এসে দাঁড়াল।

টেলিগ্রামখানাকে সে মেলে ধরল আমার সামনে : বলল, "কী এর মানে, বুঝতে পারছ কিছু?"

দেখলাম তাতে লেখা রয়েছে, "এক্ষুণি চলে আসুন। জেম্‌স্‌-এর মানসিক অবস্থা ভয়াবহ।—চ্যাড্‌।"

"কী বলতে চান ভদ্রমহিলা?" বিরক্তিভরে আমি পালটা প্রশ্ন করলাম, "এঁদের ধারণা প্রফেসর একটি বদ্ধ-উন্মাদ ; তাইনা?"

সংযতকণ্ঠে বেসিল বলল, "না হে চার্লি, ব্যাপারটা বোধহয় গুরুতরই হবে। বুদ্ধিমতী মেয়েমাত্রেই অবশ্য পণ্ডিতদের পাগল মনে করে। আর যাদের বুদ্ধি নেই তারা তো মনে করে পুরুষমাত্রেই পাগল। তাই বলে তো আর সে-ধারণাটাকে তারা টেলিগ্রামের মারফৎ ঘোষণা করতে যায় না? যাক সবুর, ঈশ্বর করুণাময়—

এসব কথা আমরা সকলেই জানি। তা বলে কি সেকথা আমরা টেলিগ্রাম করে আর-কাউকে জানাতে যাবো? মিস্ চ্যাড যে পোস্ট-অফিসে দৌড়ে গিয়ে সেখানকার অচেনা সব লোকদের সামনে জানিয়েছেন যে, তাঁর ভাইএর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে এবং সেইমর্মে যে তাঁদেরকে একখানা টেলিগ্রাম করে' দিতে বলেছেন আমাদের ঠিকানায়, তার থেকেই বোঝা যাচ্ছে ব্যাপারটা গুরুতর। আরও বোঝা যাচ্ছে যে, তাড়াতাড়ি আমাদের এখন বেকার্ড বুশে যাওয়া দরকার। অন্তত সেইটেই মিস্ চ্যাড-এর ইচ্ছে। তা নইলে তিনি টেলিগ্রাম করতেন না।"

সহাস্যে বললাম, "তাহলে যাবো নিশ্চয়ই?"

বেসিল বলল, "নিশ্চয়ই। চলো, একটা গাড়ি নেওয়া যাক্।"

সারা পথ সে একটিও কথা কইল না। ওয়েস্টমিনস্টার ব্রীজ, ট্রাফালগার স্কোয়্যার, পিকাডিলি ছাড়িয়ে আরব্রীজ রোড ধরে গাড়ি চলল আমাদের। বেসিল চুপ করে বসে রইল।

প্রফেসরের বাড়িতে এসে পৌঁছুলাম। গেট খুলবার সময় প্রথম কথা কইল বেসিল। গম্ভীরগলায় সে বলল, "নিশ্চিত জেনো চার্লি, এর আগে আর লণ্ডন শহরে এমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটে নি। কোনও সভ্যদেশেই ঘটে নি বোধহয়।"

বললাম, "বেসিল, সেক্ষেত্রে সবিনয়ে আমি স্বীকার করছি যে, এর মধ্যে অদ্ভুত কোনও কিছুই আমার চোখে পড়ছে না। অথব এক বৃদ্ধ অধ্যাপক—সারা জীবন তিনি অসম্ভবের স্বপ্ন দেখে কাটিয়েছেন, তাতে তাঁর দৈন্য ঘোচেনি; আজ যখন অপ্রত্যাশিতভাবে সৌভাগ্যের দরজা খুলে গেল, তখন সেই হঠাৎ-আনন্দের ধাক্কায় যে তিনি পাগল হয়ে যাবেন সেইটেই তো স্বাভাবিক। এর মধ্যে তুমি অদ্ভুত কি দেখলে? একে দুর্বল, তায় বৃদ্ধ—ধাক্কাটা তাই আর তিনি সামলে উঠতে পারেননি। জেম্স্ চ্যাড যে পাগল হয়ে যাবেন তাতে অবাক হবার কি আছে? কী এমন অদ্ভুত ব্যাপার এটা?"

"তাহলে তো কোনও কথাই ছিল না," বেসিল বলল, "প্রফেসর যদি পাগল হয়ে যেত তো কে তাতে অবাক হতো বলো? অবাক হচ্ছি অন্য কারণে।"

"কি কারণে?" অধৈর্য হয়ে আমি শুধোলাম।

কলিং বেলে হাত রাখল বেসিল, বোতাম টিপে বলল, "এই কারণে যে, প্রফেসর পাগল হয়ে যায় নি।"

দরজা খুলে গেল। সামনেই দেখলাম বড় বোন দাঁড়িয়ে আছেন। দীর্ঘ চোখা চেহারা। সবশুদ্ধ এঁরা তিন বোন। আর দুটি বোনও দরজার সামনেকার সরু প্যাসেজটিতে এসে দাঁড়িয়েছেন। কী যেন একটা বিশ্রী আশঙ্কাকে তাঁরা আড়াল করে রয়েছেন মনে হলো। মনে হলো, মেটারলিঙ্কের একটা রহস্যময় নাটকের আমরা নীরব দর্শক, সর্বাঙ্গ কালো পোষাকে আবৃত করে প্রেতায়িত তিন নারীমূর্তি যেন মঞ্চের ওপরে এসে আবির্ভূত হয়েছে; অপার্থিব যে সর্বনাশ ঘটে গেছে একটু আগে, গ্রীক কোরাসের ঢঙে তাকে যেন এরা দর্শকচক্ষুর অন্তরালেই রেখে দিতে চায়।

একজন বললেন, "বসুন আপনারা, কী হয়েছে বলছি।" কণ্ঠস্বর কঠিন, বেদনাবিদ্ধ।

তারপর অর্থহীন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ জানলার দিকে তাকিয়ে থেকে নিষ্প্রাণকণ্ঠে তিনি ফের বলতে শুরু করলেন, "যা যা ঘটেছে, পর পর বলে যাচ্ছি। সকালবেলা,—আমি তখন ব্রেকফাস্টের কাপডিশগুলো সব ধুয়েমুছে তুলে রাখছি। ছোটো বোনেরই শরীর খারাপ যাচ্ছে, তারা আর তাই নীচে নামে নি। জেম্‌স্ অন্য ঘরে গেছে, বোধহয় একখানা বই নিয়ে আসতে। একটু বাদে সে ফিরে এল। বই না নিয়েই। চুপচাপ খানিকক্ষণ চুল্লীটার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল; মনে হলো, কিছু একটা চায় হয়তো। বললাম, 'জেমস্, কিছু খুঁজছ নাকি?' জেম্‌স্ সে-কথার উত্তর দিল না। তাতে আমি খুব অবাক হইনি। জানেনইতো কি-রকম অন্যমনস্ক থাকে সব-সময়? আবার তাই জিজ্ঞেস করলাম, 'কিছু চাই নাকি জেম্‌স্?' তবু সে কথা কয় না। চিন্তায় এমন বিভোর হয়ে যায় এক-এক সময় যে, গায়ে হাত না দিলে ও আর তখন কিছু টেরই পায় না। ওর দিকে তাই এগিয়ে গেলাম। গায়ে হাত রাখতে যাব, এমন সময় হঠাৎ একটা অদ্ভুত জিনিস আমার চোখে পড়ল। কতখানি যে হতভম্ব হয়ে গেলাম

সে আর কী বলব। ব্যাপারটা আপনাদের কাছে অর্থহীন বলে মনে হবে; সেই অর্থহীন ব্যাপারে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার যেন মাথা-খারাপ হয়ে যাবার উপক্রম হলো। দেখি, জেম্‌স্‌ একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে।"

গ্র্যাণ্ট একটু হাসল শুধু। বিচিত্র স্মিতহাস্য! তারপর, কে জানে কেন, উৎসাহে সে হাত কচলাতে লাগল।

আমি বললাম, "একপায়ে দাঁড়িয়ে আছে! কী বলছেন আপনি?"

ভদ্রমহিলা নিজেও বোধ হয় বুঝতে পারেননি, কী হাস্যকর উক্তি তিনি করেছেন। নিষ্প্রাণ কাতরকণ্ঠে তিনি বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ, একপায়ে। দেখি, ও বাঁ-পায়ে ভর দিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে; ডান পা'খানা সামনে প্রসারিত,—বুড়ো আঙুলটা নীচের দিকে বাঁকানো। পায়ে কোনও চোট্‌ লেগেছে নাকি জিজ্ঞেস করলাম। তাতে সে তার ডান পা'খানাকেই শুধু আরও একটুখানি উপরে তুলে ধরল, বুড়ো আঙুলটা দেখলাম দেয়ালের দিকে নিবদ্ধ। তখনো সে একদৃষ্টিতে সেই চুল্লীটার দিকে তাকিয়ে আছে।

" 'জেম্‌স্‌, তোমার হয়েছে কী?' ভয় পেয়ে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। জেম্‌স্‌ তার কোনও উত্তর দিল না। ডান-পায়ে শূন্যে লাথি ছুঁড়ল তিনবার, তারপর বাঁ-পা'খানাকে তুলে ধরল। বাঁ-পায়েও সে তিনবার লাথি ছুঁড়ল দেখলাম, তারপর একটা চকীর মতো ঘুরে গিয়ে অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'জেম্‌স্‌, জেম্‌স্‌,—তুমি কি পাগল হয়ে গেলে? জবাব দিচ্ছ না কেন?' কপাল কুঁচকে স্থিরদৃষ্টিতে সে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর ধীরে ধীরে মেঝের থেকে সে তার বাঁ-পা শূন্যে তুলে ধরল, বৃত্তাকারে সেই পা'খানাকে সে ঘোরাল কয়েকবার। আমি আর থাকতে পারলাম না। দৌড়ে গিয়ে ক্রিস্টিনাকে ডেকে আনলাম। তারপর যে কী হলো, না বলাই ভালো। তিন বোন আমরা। কথা বলবার জন্যে তিনজনেই তাকে সাধ্য-সাধনা করতে লাগলাম। কান্নাকাটি করতে লাগলাম। সে কান্নায় পাথরেরও বোধ হয় চোখ ফেটে জল বেরুত। জেম্‌স্‌ তবু নির্বাক। একটা কথারও সে জবাব দিল না, নির্বিকার শান্তমুখে ঘরময় সে নেচে বেড়াতে লাগল। দেখে

মনে হলো, ও-পা যেন আর জেমস্-এর পা নয়। পা' দুটোকে যেন ভূতে পেয়েছে। একটিবারের জন্যেও সে মুখ খুলল না। এখনও পর্যন্ত খোলেনি।"

উত্তেজিত হয়ে আমি উঠে দাঁড়ালাম। শুধোলাম, "কোথায় তিনি? তাঁকে এখন একলা থাকতে দেওয়াটা ঠিক নয়।"

"ও এখন বাগানে," মিস্ চ্যাণ্ড বললেন, "ডাঃ কোলম্যান ওর সঙ্গে রয়েছেন। ডাক্তার বলছিলেন, ওর এখন একটু খোলা জায়গাতে থাকাই ভাল। তা এ-অবস্থায় তো আর রাস্তায় বেরুনো যায় না?"

বেসিল আর আমি গিয়ে জানালার পাশে দাঁড়ালাম; বাগান তার সামনে। ছোট্ট ছিমছাম বাগান, পরিপাটি ফুলের কেয়ারি। মনে হলো, ঝলমলে একখানা রঙিন কার্পেট যেন। এবং, বড্ড-বেশী সাজানো-গোছানো। তা হোক্। গ্রীষ্মের এই অপরূপ বিকেলে সেই অতি-প্রসাধনের উগ্রতার ওপরেও চঞ্চল প্রাণোচ্ছলতার ছোঁয়া এসে লেগেছে। একটু এগিয়েই একটা ঝক্‌ঝকে বৃত্তাকার লন, দুটি লোক সেখানে দাঁড়িয়ে। প্রথমজনের চেহারা বেঁটে এবং চোখা, গোঁফজোড়া কুচকুচে কালো, মাথায় একটি পরিচ্ছন্ন টুপি! বুঝলাম যে, ইনিই ডাঃ কোলম্যান। মৃদু পরিষ্কার গলায় তিনি কথা কইছেন। তবে, মুখ দেখে মনে হলো, একটু যেন বা নার্ভাস। অপরজন আমাদের বন্ধু প্রফেসর জেমস্ চ্যাণ্ড। স্থির হয়ে তিনি ডাক্তারের কথাগুলো সব শুনে যাচ্ছেন। দৃষ্টিতে একটা বিজ্ঞ গাম্ভীর্য। চশমার কাঁচের ওপর রোদ্দুর এসে পড়েছে, চিকচিক করছে। গত রাত্তিরের কথা মনে পড়ল। বেসিল যখন বড় বড় সব তত্ত্বকথা আওড়াচ্ছিল তখনও তিনি ঠিক এমনিভাবেই শান্ত হয়ে সব শুনছিলেন, আর আলোর ছটা লেগে চিকচিক করছিল তার চশমা। হুবহু সেই একই প্রশান্ত ভঙ্গী। একটুমাত্র তফাৎ শুধু। আজও তাঁর দৃষ্টি শান্ত বটে, তবে পা' দুটি চঞ্চল। দম-দেওয়া পুতুলের পা' যেন। অবিশ্রান্তভাবে তা নেচে চলেছে। ঋষির মতো শান্ত মুখ, নর্তকীর মত চঞ্চল পা'। চতুর্দিকে ফুলের সমারোহ, রোদ্দুরের সোনালী সম্ভার। সবকিছু মিলিয়ে একটা অবিশ্বাস্য দৃশ্য। একটা অলৌকিক ব্যাপার। মজা এই যে, অলৌকিক ব্যাপারগুলো সব দিনের বেলাতেই

ঘটে, মন তখন অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন। রাত্তিরের এমনই প্রভাব, মনে তখন বিশ্বাসের শান্তি নাবে। কোনও কিছুকেই আর তখন অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়না।

দ্বিতীয় ভগ্নীটি ইতিমধ্যে ঘরে এসেছেন, বিরসমুখে এসে জানালার কাছে দাঁড়িয়েছেন। জ্যেঠাকে সম্বোধন করে তিনি বললেন, "এডেলেড, মিউজিয়মের সেই মিঃ বিংহ্যাম কিন্তু আজও আসবেন। তিনটের সময় তাঁর আসবার কথা।"

তিক্তকণ্ঠে এডেলেড চ্যাড বললেন, "জানি। সব কথাই এখন তাঁকে খুলে বলতে হবে। পোড়া কপাল, অত সুখ আমাদের সইবে কেন?"

গ্র্যান্ট তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়াল। বলল, "কি বলবেন আপনি? কী বলবেন মিঃ বিংহ্যামকে?"

প্রফেসর-ভগ্নী তাঁর হতাশাকঠিন কণ্ঠে বললেন, "কী বলব তা কি আপনি জানেন না মিঃ গ্র্যান্ট? জেমস্‌কে তো দেখলেন, এই অবস্থায় কি আর ওকে কেউ চাকরি দিতে চাইবে? দেখুন, অবস্থাটা একবার দেখুন।" বলে তিনি বাগানের মধ্যে তাঁর ভাইয়ের দিকে অঙ্গুলীনির্দেশ করলেন। প্রফেসরের দিকে তাকালাম আমরা। মুখে তাঁর সৌম্য শান্তি, পা' দুখানা নৃত্যচঞ্চল।

বেসিল হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর বলল, "মিস চ্যাড, ব্রিটিশ মিউজিয়মের সেই ভদ্রলোক যেন কখন আসবেন?"

"তিনটের সময়।"

"বেশ, এখনো তাহলে ঘণ্টাখানেক সময় পাওয়া যাবে।"

বেসিল আর কালক্ষেপ করল না, জানলা টপকে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। সরাসরি সে প্রফেসরের দিকে এগোল। তারপর যখন প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে, থেমে পড়ল সে। কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে রইল। মুখে চোখে একটা নির্লিপ্ত ভঙ্গী। তা সত্বেও আমি বুঝতে পারছিলাম, টুপির নীচে থেকে চোরা দৃষ্টি হেনে প্রফেসরকে সে লক্ষ্য করছে।

হঠাৎ গিয়ে সে প্রফেসরের পাশে দাঁড়াল, চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কি হে প্রফেসর; এখনো কি তুমি মনে কর যে জুলুরা একটা নির্বোধ জাত?"

ডাঃ কোলম্যান তাঁর ভুরু কোঁচকালেন। মনে হলো, বেসিলের আচরণে

তিনি উচ্চারণ করছেন। কী যে তিনি বলতে যাচ্ছিলেন, প্রফেসর হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালেন বেসিলের দিকে। তবে তার কথার কোনও জবাব দিলেন না। বাঁ-পা'খানাকে শুধু সামনে এগিয়ে দিলেন।

"ডাঃ কোলম্যানকে তুমি মনে টানতে পেরেছ?" উচ্চকণ্ঠে বেসিল প্রশ্ন করল আবার।

প্রফেসর তাঁর ডান-পা'খানাকে তুলে ধরলেন, শূন্যে লাথি ছুঁড়লেন বারকয়েক। মুখে সেই বোকা হাসি।

ডাক্তার হঠাৎ বাধা দিলেন বেসিলকে। প্রফেসরকে বললেন, "চলুন প্রফেসর, বাগান তো দেখা হলো, এবার ভিতরে যাওয়া যাক। চমৎকার বাগানটি আপনার, চমৎকার। চলুন, এবারে ভিতরে যাই।" প্রফেসরের বাহুর ওপরে তিনি হাত রাখলেন, মৃদুভাবে আকর্ষণ করলেন তাঁকে। তারপর একটু নিচুগলায় বেসিলকে বললেন, "দয়া করে ওঁকে আর এখন ঘাঁটাবেন না, তাতে করে উনি আরো বিগড়ে যেতে পারেন।"

ঠাণ্ডা স্বরে বেসিল বলল, "ডাক্তার, প্রফেসর আপনার পেশেন্ট; আপনার নির্দেশ আমাকে তাই মানতেই হবে। তা সত্ত্বেও আপনাকে মিনতি জানাচ্ছি, দয়া করে ওঁকে ঘণ্টাখানেকের জন্যে আমার কাছে থাকতে দিন। কথা দিচ্ছি, কোনও ক্ষতিই ওঁর হবে না। ওঁকে আমি কিছুমাত্র ঘাঁটাব না, নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।"

ডাক্তার তাঁর চশমার কাঁচ মুছতে লাগলেন; মনে হলো, একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এক মুহূর্ত থেমে থেকে বললেন, "তা না হয় হলো, কিন্তু বড্ডোই রোদ্দুর এখানে। রোদ্দুরে দাঁড়ানোটা ওঁর ঠিক হবে না; বিশেষ ওঁর আবার টাকমাথা।"

"তার জন্যে ঘাবড়াবেন না।" বলে চটপট বেসিল তাঁর মস্ত টুপিটাকে খুলে নিয়ে প্রফেসরের ডিম্বাকার মাথার ওপরে বসিয়ে দিল। প্রফেসরের তাতে কোনও ভাবান্তর বোঝা গেল না। দিগন্তের দিকে দৃষ্টি মেলে দিয়ে একইভাবে তিনি নাচতে লাগলেন।

ডাক্তার ততক্ষণে চশমা পরে নিয়েছেন। ঘাড় বাঁকিয়ে কঠিন দৃষ্টিতে দু'জনের দিকে তিনি তাকালেন একবার, তারপর বললেন, "আচ্ছা, বেশ।"

আর একমুহূর্তও তিনি সেখানে দাঁড়ালেন না। বাড়ির ভেতর চলে এলেন। বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন তিন বোন, ডাক্তার এসে দাঁড়ালেন তাঁদের পাশে। তারপর পুরো একটি ঘণ্টা তাঁরা বাগানের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দুই বন্ধুর কীর্তিকলাপ দেখতে লাগলেন।

দেখলেন, বেসিল গ্র্যান্ট কী যেন কতকগুলো প্রশ্ন করল প্রফেসরকে। প্রফেসর তার কোনও জবাব দিলেন না, আপনমনেই নাচতে লাগলেন। বেসিল তখন তার এক পকেট থেকে একটা লাল নোটবই, আর অন্য পকেট থেকে একটা লম্বা পেনসিল বার করে আনল।

দ্রুতহাতে সেই নোটবইতে কী-যেন টুকে নিতে লাগল সে। নাচতে নাচতে প্রফেসর এক-একবার সরে যান, বেসিল তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করে, তারপরে আবার নোট নেয়। বাগানের মধ্যে সে এক অপূর্ব দৃশ্য। একজন তার নোটবইতে অবিশ্রান্তভাবে কী সব টুকে চলেছে, আরেকজন নাচছেন। কখনো বা শিশুর মত লাফাচ্ছেন।

এইভাবেই বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল, তা প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশেক হবে। গ্র্যান্ট হঠাৎ তাঁর পেনসিলটিকে পকেটে রেখে দিল দেখলাম, নোটবইখানা শুধু হাতে রইল তার। তারপর সরাসরি সে প্রফেসর চ্যাড-এর সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

তারপরেই ঘটল এক অদ্ভুত কাণ্ড। পাগলামিটা যে শেষতক এতদূর পর্যন্ত গড়াবে তা আমরা কেউ কল্পনাও করতে পারিনি। করুণাপ্রশান্ত দৃষ্টিতে প্রফেসর কিছুক্ষণ বেসিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন; তারপর বাঁ-পা'খানাকে সামনে তুলে নিয়ে, প্রফেসর-ভগ্নী আজ সকালে সর্বপ্রথম তাঁকে যে বঙ্কিম-ঠামে আবিষ্কার করেছিলেন, তেমনি কায়দায় তির্যকভাবে সেটাকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখলেন। বেসিলও তৎক্ষণাৎ, কী কাণ্ড, জুতোসমেত তার নিজের পা'খানাকে শূন্যে তুলে নিয়ে প্রফেসরের সামনে এগিয়ে ধরল। প্রফেসর তাতে বাঁ-পা

নামিয়ে নিলেন, নিয়ে ডান-পা'খানাকে পেছনে বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়াবার ভঙ্গীতে সামনে ঝুঁকে পড়লেন। বেসিলও দেখলাম সঙ্গেসঙ্গেই তার পা'দুখানাকে আড়াআড়ি করে দাঁড়িয়েছে। সেইভাবেই সে লাফ দিয়ে শূন্যে উঠল, তারপর আবার স্বাভাবিকভাবে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। কী যে ব্যাপার, ভালো করে সেটা বুঝে উঠবার আগেই দেখলাম দুজনেই তারা নাচতে সুরু করেছে। এতক্ষণ ছিল একটা পাগল, এবারে হলো দুটো।

উদ্দাম দুই নৃত্যপাগল ; কোনদিকেই তাদের লক্ষ্য নেই। সঙ্গে এক ভদ্রলোককে নিয়ে মিস্ চ্যাড যে একেবারে তাদের সামনে গিয়ে হাজির হয়েছেন, সেদিকে তাদের নজরই পড়ল না। সবেমাত্র প্রফেসর একটা নতুন কায়দায় তাঁর পা' তুলেছেন, ওদিকে বেসিল গ্র্যান্টও কার্ট-হুইলের তালে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তাঁর সামনাসামনি, মিস্ চ্যাড-এর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে তাদের তালভঙ্গ হলো। মিস্ চ্যাড বললেন, "মিঃ বিংহাম এসেছেন ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে ; কথা বলতে চান।"

মিঃ বিংহামের চেহারা ছিমছিম, পোষাক পরিপাটি। সাদা ছুঁচলো দাড়ি, হাতে দস্তানা। ব্যবহার ভদ্র, তবে বড্ডো-বেশী কেতাদুরস্ত ; প্রফেসরের ঠিক উল্টো। এক্ষেত্রে তাতে ভালই হলো। প্রচুর বইপত্তর ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন ভদ্রলোক ; নানান ধরণের মানুষের, নানান বিচিত্র কায়দাকানুনের সংস্পর্শে এসেছেন। তবে জীবনে বোধ হয় এমন অদ্ভুত দৃশ্য আর দেখেননি। বৃদ্ধ দুই ভদ্রলোক ; খেয়েদেয়ে কোথায় তাঁরা একটু দিবানিদ্রা দেবেন, তা নয়—বাগানে দাঁড়িয়ে নৃত্যচর্চা করছেন। নেহাৎই কেতাদুরস্ত লোক, চুপচাপ তাই তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রফেসর একেবারে মরীয়া। মিঃ বিংহামকে তিনি দেখেও দেখলেন না, সমানে নাচতে লাগলেন। বেসিল হঠাৎ থেমে পড়ল। ডাঃ কোলম্যানও ইতিমধ্যে বাগানে এসে হাজির হয়েছেন। চকচকে কালো টুপি, তার নীচে চকচকে একজোড়া চোখ। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তিনি প্রফেসর এবং বেসিল গ্র্যান্টকে নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

বেসিল তাঁর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, "ডাঃ কোলম্যান, আপনি এবারে প্রফেসরের কাছে থাকুন কিছুক্ষণ ; প্রফেসর তাতে খুশীই হবেন। আর হ্যাঁ,

মিঃ বিংহ্যাম, আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। কথাটা একটু নিরিবিলিতে হলেই ভাল। আমার নাম গ্র্যান্ট।"

মিঃ বিংহ্যাম মাথা নোয়ালেন। তাতে শ্রদ্ধাও ছিল, বিস্ময়ও ছিল।

সহজ গলায় বেসিল বলল, "মিস চ্যাড, এ-ভদ্রলোককে আমি একটু বাড়ির মধ্যে নিয়ে যাই, কেমন?" বলে সে আর দাঁড়াল না, চটপট সেই হতবুদ্ধি আগন্তুককে সঙ্গে নিয়ে খিড়কীর দরজা দিয়ে বাড়ির মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

মিঃ বিংহ্যামের সামনে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিল বেসিল, তারপর বলল, "বসুন। ব্যাপারটা সব শুনেছেন তো?"

মমতাকরুণ বিষণ্ণ ভঙ্গীতে মাথা নিচু করে মিঃ বিংহ্যাম বললেন, "হ্যাঁ, মিস চ্যাড-এর মুখে শুনলাম। এতে যে আমি কতখানি দুঃখিত হয়েছি তা আর কী বলব। যে চাকরি ওঁকে আমরা দিতে এসেছিলাম ওঁর গুণের তুলনায় সে অবশ্য কিছুই নয়। তা সত্ত্বেও ঠিক সেই মুহূর্তেই যে এমন একটা অঘটন ঘটল এও বড় আক্ষেপের কথা। কী-যে করা যায় এখন! প্রফেসরের অবশ্য বুদ্ধিভ্রংশ না-ও হতে পারে। কিন্তু তাতেও তো সমস্যার কোনও সুরাহা হচ্ছে না? যে অবস্থায় ওঁকে দেখে গেলাম তাতে, আর যাই হোক, চাকরি করা ওঁর পক্ষে অসম্ভব।"

"আমার একটা প্রস্তাব আছে—" চেয়ারে বসে পড়ল বেসিল, তারপর আরো একটু অন্তরঙ্গ হয়ে এল।

"বেশ তো, ভাল কথা।" বলে মিঃ বিংহ্যামও তাঁর চেয়ারখানাকে একটু কাছে টেনে নিয়ে বসলেন।

গলাটাকে পরিষ্কার করে নিল বেসিল, বক্তব্যটাকে একটু গুছিয়ে নিল। তারপর বলল, "প্রস্তাবটা তাহলে শুনুন। এটাকে অবিশ্যি ঠিক আপোষ বলা যায় না, তাহলেও খানিকটা ঐ ধরণেরই বটে। প্রস্তাবটা হচ্ছে এই যে, যতদিন পর্যন্ত না প্রফেসর চ্যাড তাঁর নৃত্য থামাচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত সরকারী তহবিল থেকে ব্রিটিশ মিউজিয়মের মারফৎ প্রতি বছর তাঁকে আটশো পাউণ্ড করে বেতন দিতে হবে।"

"আ-ট-শো পাউণ্ড!" মিঃ বিংহ্যামের আর বাক্‌স্ফূর্তি হলো না। বিস্ময়ে

বিস্ফারিত তাঁর নীলাভ চক্ষু দুটি। এই সর্বপ্রথম তিনি মুখ তুলে তাকালেন। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, "মিঃ গ্র্যান্ট, আপনার কথাটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। আপনি কি চান যে এই অবস্থাতেই প্রফেসর চ্যাঙকে বাৎসরিক আটশো পাউণ্ড বেতনে এশিয়াটিক ম্যানাসক্রীপ্‌টস্‌-এর কীপার নিযুক্ত করা হোক ?"

বেসিল গ্র্যান্ট মাথা নাড়ল, তারপর দৃঢ়স্বরে বলল, "না। মোটেই তা নয়। চ্যাঙ আমার বন্ধু, তাঁকে আমি অত্যন্তই ভালবাসি। কিন্তু তাই বলেই যে তাঁর এখন এশিয়াটিক ম্যানসক্রীপ্‌টস্‌-এর দায়িত্ব নেওয়া উচিত হবে—সেকথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। অতদূর আমি যাচ্ছি না। আমার কথা হচ্ছে, যতদিন না চ্যাঙ তাঁর এই নাচ থামাচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত মিউজিয়ম থেকে প্রতি বছরে তাঁকে আটশো পাউণ্ড করে দেওয়া হোক। গবেষণায় সাহায্য করবার জন্যে আলাদা কোনও ফাণ্ড নেই আপনাদের ? আছে নিশ্চয়ই ? সেইখান থেকেই দেবেন।"

মিঃ বিংহাম একেবারে হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। বললেন, "কী যা-তা বলছেন মিঃ গ্র্যান্ট ? কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। এই উন্মাদকে এমন আজীবন আটশো পাউণ্ড করে দিয়ে যেতে হবে ?"

উৎফুল্ল গলায় বেসিল বলল, "না-না আজীবন হবে কেন ? তা আমি বলিনি।"

মিঃ বিংহামকে দেখে মনে হলো, অতিকষ্টে তিনি আত্মসম্বরণ করলেন। বললেন, "তাহলে ? আজীবনেও বুঝি কুলোচ্ছে না ? কতদিন পর্যন্ত তাহলে দিতে হবে শুনি ? সৃষ্টির শেষ দিন পর্যন্ত ?"

সহাস্যে বেসিল বলল, "না। যতদিন না প্রফেসর তাঁর নাচ থামাচ্ছেন, ততদিন পর্যন্ত।" বলে সে বেশ আরাম করে তাঁর চেয়ারখানাতে হেলান দিয়ে বসল।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বেসিলের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিঃ বিংহাম। বেশ কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "মিঃ গ্র্যান্ট, কথাটা একটু খুলে বলুন। প্রফেসর চ্যাঙ-এর জন্যে আপনি বাৎসরিক আটশো পাউণ্ড করে বেতন চাইছেন ; কেমন, এই তো ? তা গভর্নমেন্ট এ-টাকাটা দেবে কেন ? প্রফেসর চ্যাঙ উন্মাদ হয়ে গেছেন, শুধুমাত্র

এই কারণে ? তিনি এখন তাঁর বাগানে দাঁড়িয়ে শূন্যে পা ছুঁড়ছেন, শুধুমাত্র এই হাস্যকর কারণে ?"

বেসিল বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"—এবং যতদিন পর্যন্ত তিনি নাচবেন, ততদিন পর্যন্ত টাকাটা তাঁকে দিয়ে যেতে হবে ? নাচ থামলেই টাকাও থামবে, এই তো ?"

"বিলক্ষণ", বেসিল বলল, "থামতে তো একদিন হবেই ?"

মিঃ বিংহ্যাম আর কথা বাড়ালেন না, ছড়ি এবং দস্তানা দুটিকে হাতিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, "মিঃ গ্র্যান্ট, অযথা আর বাক্যব্যয় করে লাভ নেই। বুঝতে পারছি, আপনি আমার সঙ্গে তামাসা করছেন। তামাসার এটা উপযুক্ত সময় নয়। আর প্রস্তাবটা যদি আপনি সিরিয়াস্‌লি-ই করে থাকেন তো মাপ করবেন আমাকে, ও-প্রস্তাব মেনে নেওয়া আমার পিতৃদেবেরও সাধ্যাতীত। প্রফেসর চ্যান্ড-এর মস্তিষ্কবিকৃতিতে আমি দুঃখিত। অত্যন্তই দুঃখিত। কিন্তু সবকিছুরই একটা সীমা আছে মনে রাখবেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ম, আর যাই হোক, পাগলা-গারদ নয়। প্রফেসর চ্যান্ড তো দূরের কথা, স্বয়ং ঈশ্বরেরও যদি মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে তো ব্রিটিশ মিউজিয়ম তাঁকে অনাবশ্যক বিবেচনায় পরিহার করতে বাধ্য হবে।"

দরজার দিকে এগোচ্ছিলেন মিঃ বিংহ্যাম, বেসিল তার পথরোধ করে দাঁড়াল। তারপর কঠিন কণ্ঠে বলল, "ধীরে মিঃ বিংহ্যাম, ধীরে। মনে রাখবেন, এখনো সময় আছে। যদি ইচ্ছে হয় তো এখনো আপনি একটা মহৎ কাজে সহায়তা করতে পারেন। মিঃ বিংহ্যাম, এ-কাজে ইউরোপের গৌরব, সমগ্র বিজ্ঞান-জগতের গৌরব। সে-গৌরবের কি আপনি অংশীদার হতে চান না ? একদিন আপনি বুড়ো হবেন, মাথার চুল সাদা হয়ে যাবে। কিন্তু যদি কথা শোনেন আমার, তখনো আপনি বুক ফুলিয়ে হাঁটতে পারবেন মিঃ বিংহ্যাম ; উঁচু-গলায় বলতে পারবেন, একটা বিরাট আবিষ্কারে আপনি সহায়তা করেছিলেন। সে-গৌরব কি আপনি চান না ?"

বাধা দিয়ে মিঃ বিংহ্যাম বললেন, "যদি চাই, সেক্ষেত্রে— ?"

হাল্কা গলায় বেসিল বলল, "সেক্ষেত্রে আপনার পন্থা অতি প্রাঞ্জল ; এক্ষুণি

দিয়ে প্রফেসর চ্যালকে আপনি বাৎসরিক আট'শ পাউণ্ড বেতন দেবার ব্যবস্থা করুন।"

অধৈর্য হয়ে দরজার দিকে পা বাড়ালেন মিঃ হিংহাম, কিন্তু এবারেও তিনি ব্যর্থ হলেন। দরজা আটকা, ডাঃ কোলম্যান ঘরে ঢুকছেন।

ডাক্তারের মুখে উদ্বেগের চিহ্ন; ফ্যাসফেসে নিচু গলায় তিনি বললেন, "তাজ্জব ব্যাপার মিঃ গ্র্যাণ্ট, প্রফেসরের সম্পর্কে একটা অদ্ভুত জিনিস আমি আবিষ্কার করেছি।"

বিংহাম যেন এই ধরণেরই একটা কিছু আশঙ্কা করেছিলেন; বললেন, "কি ব্যাপার ডাক্তার? প্রফেসর বুঝি মদ খাবার বায়না ধরেছেন?"

"মদ? ছ্‌!" এমনভাবে কথাটাকে উচ্চারণ করলেন ডাক্তার, যেন সে-তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার; তারপর বললেন, "না-না, মদ-টদ নয়।"

মিঃ বিংহাম তাতে আরো খানিকটা ঘাবড়ে গিয়ে অস্পষ্ট গলায় বললেন, "তবে কি উনি কাউকে খুন করতে চাইছেন নাকি?"

"না-না—" অসহিষ্ণুভাবে ডাক্তার তাঁর মাথা ঝাঁকালেন।

"তবে কি নিজেকে ঈশ্বর ঠাউরেছেন? নাকি—"

বাধা দিয়ে ডাক্তার কোলম্যান বললেন, "কী যা-তা সব বলছেন? সে-সব কিছু নয়; আমার আবিষ্কার একটু অন্য ধরণের। ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে—"

কাতর কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলেন মিঃ বিংহাম, "বলুন, বলুন, বলুন কী হয়েছে?"

কাটা-কাটা দৃঢ় গলায় ডাঃ কোলম্যান বললেন, "ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে, প্রফেসরের মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেনি।"

"ঘটেনি!!!"

'না, ঘটেনি। পাগলামির কতকগুলি অনিবার্য লক্ষণ থাকে। প্রফেসরের মধ্যে তা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত।"

হাল ছেড়ে দিয়ে মিঃ বিংহাম বললেন, "বলেন কি মশাই! পাগলই

যদি না হবেন তো উনি নাচছেন কেন অমনভাবে? কথাবার্তাই-বা বলছেন না কেন?"

ডাক্তার বললেন, "কি জানি। পাগলামির আমি চিকিৎসা করতে পারি, তাই বলে মূর্খতার নয়। আর যাই হোন, উনি পাগল নন। এ আমি একেবারে হলফ করে বলতে পারি।"

"কী এর অর্থ?" মিঃ বিংহ্যাম একেবারে চেঁচিয়ে উঠলেন, "কোনও রকমেই কি ওঁকে আমাদের বক্তব্যটা গিয়ে বলতে পারা যাবে না? কোনও রকমেই না?"

পরিষ্কার চাঁচাছোলা গলায় বেসিল বলল, "যাবে। আপনি কি কিছু বলতে চান ওঁকে? বেশতো, কি বলবেন বলুন; আমি গিয়ে আপনার বক্তব্য ওঁকে জানিয়ে আসছি।"

ডাঃ কোলম্যান এবং মিঃ বিংহ্যাম অবাক হয়ে বেসিলের দিকে তাকালেন, যুগপৎ প্রশ্ন করলেন, "সে কি! সে কী করে সম্ভব?"

বেসিলের মুখে একটি আয়ত হাসি ফুটে উঠল; বলল, "কীভাবে আপনাদের বক্তব্যটা ওঁকে আমি পৌঁছে দিয়ে আসব, এই কথাই তো আপনারা জানতে চান? কেমন, তাই না?"

"বিলক্ষণ, বিলক্ষণ—"

"দেখুন তাহলে", বেসিল বলল, "এইভাবে।" বলেই সে এক-পা' শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আরেক পায়ে ভর দিয়ে একঠেঙে হয়ে দাঁড়াল। বলল, "এইভাবে।"

বেসিলের মুখের দিকে তাকালাম। সে মুখ কঠিন, গম্ভীর। শূন্যস্থ নিরালম্ব পা'খানি ওদিকে বৃত্তাকারে ঘুরছে।

স্থিরকণ্ঠে সে বলল, "বন্ধুর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে আপনারা আমাকে বাধ্য করলেন। কি করব, আমি নিরুপায়। বাধ্য হয়েই তাঁকে ফাঁসাতে হচ্ছে। যা হোক, এতে তাঁর মঙ্গলই হবে।"

বিংহ্যাম-এর দিকে তাকিয়ে আমার দুঃখ হলো। ভদ্রলোকের মুখের অবস্থা ইতিমধ্যে আরও করুণ হয়ে উঠেছে। কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না; সেইসঙ্গে

সম্রস্ত হয়ে উঠেছেন, কী না জানি ঘটেছে হয় প্রফেসরের সম্পর্কে। আমতা-আমতা করে তিনি বললেন, "কি ব্যাপার মিঃ গ্র্যান্ট? কোনও কেলেঙ্কারি বোধ হয়?"

পা'খানিকে বেসিল এবার যথাস্থানে নামিয়ে আনল। জুতোয় জুতোয় খটাস্ করে শব্দ হল একটা, সকলে তাতে চমকে উঠলেন।

"মূর্খ!" চেঁচিয়ে উঠল বেসিল, "আপনারা সব মূর্খ। মানুষটাকে একবার আপনারা লক্ষ্য করেও দেখেননি? নিরীহ-নির্জীব এক অধ্যাপককেই শুধু দেখেছেন, দেখেছেন যে বই আর ছাতা বগলে তিনি লাইব্রেরীতে যান! চোখ-দুটিতে একবার নজর পড়েনি আপনাদের? দেখেননি কী-আগুন সেখানে ধক্ ধক্ করে জ্বলছে? চশমার পেছনে তাঁর মুখখানাকে একবার দেখেননি? সে মুখের সঙ্কল্পকঠিন দৃঢ়তা কি আপনাদের নজর এড়িয়ে গেছে? মনে রাখবেন, নিষ্ঠায় তিনি একনিষ্ঠ, প্রত্যয়ে তিনি প্রগাঢ়। আমারই দোষ হয়েছে, তাঁর সেই সঙ্কল্পের বারুদে আমিই আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি। প্রফেসরের দৃঢ় বিশ্বাস, ব্যক্তিবিশেষের একার চেষ্টায় একটা সাঙ্কেতিক ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল; আশপাশের লোক তার সেই সঙ্কেতগুলোকে অনুধাবনের চেষ্টা করেছে। এবং এমনিভাবেই হয়েছে তার পূর্ণবিকাশ। আমি তা নিয়ে তর্ক করেছিলাম, বলেছিলাম যে তা সম্ভব নয়। প্রফেসরকে আমি বিদ্রূপ করতেও ছাড়িনি। ব্যঙ্গ করে তাঁকে আমি বলেছি যে, পুঁথিপড়া বিদ্যে দিয়ে এ-তথ্য বোঝা যায় না। কি করেছেন তিনি তার উত্তরে? একেবারে মুখের মত জবাব দিয়ে দিয়েছেন। নিজেই তিনি একটি সাঙ্কেতিক ভাষার সৃষ্টি করেছেন। এবং প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছেন যে, যতদিন পর্যন্ত না আর-সবাই তাঁর এই নতুন ভাষা উপলব্ধি করতে পারছে ততদিন পর্যন্ত তিনি মুখ খুলবেন না। গভীর মনোযোগে তাঁর এই সঙ্কেতগুলোকে আমি পর্যবেক্ষণ করেছি, তাঁর ভাষা আমি উপলব্ধি করেছি! আগে হোক পরে হোক, অন্য সকলেও একদিন তা উপলব্ধি করতে পারবে। ভাষা নিয়ে প্রফেসরের এটা একটা অপূর্ব এক্সপেরিমেন্ট; এ-এক্সপেরিমেন্ট তাঁকে শেষ করতে দেয়া উচিত। তার জন্তে, যতদিন পর্যন্ত না তিনি তাঁর এই সাঙ্কেতিক

বৃত্তি পাবোজন, যে-করেই হোক বছরে তাঁকে আটশো পাউণ্ড করে যোগাড় করে দেওয়া দরকার। এখন যদি প্রফেসরকে থামিয়ে দিই তো সে আমাদের মহাপাপ। একটা মহান সম্ভাবনাকে সেক্ষেত্রে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা হবে।"

বেসিলের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন মিঃ বিংহ্যাম, তার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, "মিঃ গ্র্যাণ্ট, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। টাকাটা যাতে উনি পান তার জন্তে আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব। আর সেটা এমন কিছু কঠিন কাজও নয়। চলুন না, একসঙ্গেই বেরুন যাক্?"

"ধন্যবাদ মিঃ বিংহ্যাম," বেসিল বলল, "আমি একটু পরে বেরুব। প্রফেসরের সঙ্গে একটু আড্ডা মেরে যাই।"

বহুক্ষণ ধরে আড্ডা চলল তাদের। মনে হলো, দুজনেই বেশ খুশী-খুশী। আমি যখন উঠলাম, তখনও তারা দেখি সমানে নেচে চলেছে।

শেষ পর্ব: বৃদ্ধার নির্বাসন

রুপার্ট গ্র্যাণ্ট ছোকরা আলাপে-সালাপে চৌখস, গালগল্পে ওস্তাদ। তার কথা-বার্তায় দুটি জিনিস সবিশেষ লক্ষ্যনীয়। এক, তার গোয়েন্দাসুলভ বিশ্লেষণী ভঙ্গী; দুই, লণ্ডনের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তার বিশুদ্ধ রোমাণ্টিক মনোভাব। বেসিল বলত, "ছোকরার যুক্তিগুলো সব মোক্ষম। দুঃখের কথা, ওই যুক্তিবুদ্ধির বাড়াবাড়িই ওর বিচারবুদ্ধির মাথা ঘুলিয়ে দেয়। তার চাইতে বরং ওর কাব্যিভাবটা ভাল। হতে পারে, হুট করে সেটা ওর মাথায় চেপে বসে, —তা বসুক, শেষ পর্যন্ত ওই কাব্যিই ওকে ঠিকপথে চালিয়ে নেয়।" সত্যিসত্যিই রুপার্টের সম্পর্কে এ কথা খাটে কি না, খাটলেও বা ঠিক কতখানি খাটে, আপাতত সে-প্রসঙ্গে প্রবেশ করবার প্রয়োজন নেই। এখানে শুধু এইটুকুমাত্র বললেই যথেষ্ট হবে যে, একবার অন্তত কথাটা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে খেটে গিয়েছিল। সে-বড় বিচিত্র ব্যাপার। আপনারা সব অবধানপূর্বক শ্রবণ করুন।

রুপার্টনের এক নির্জন অঞ্চল। আমরা দুজনে পথ হাঁটছি, আমি এবং রুপার্ট। সন্ধ্যা হয়-হয়। গ্রীষ্মকালে, একটু লক্ষ্য করে দেখবেন, সাড়ে আটটা নাগাদ অদ্ভুত এক নীলচে আলোয় সারা আকাশ যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। গোধূলির সেই অপরূপ হাসিতে পথঘাট সব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সে হাসিকে, আর যাই হোক, আসন্ন রাত্রির পূর্বাভাষ বলে মনে হবে না। মনে হবে, মহাশূন্যে দাঁড়িয়ে কে যেন একটি নীলচে আলোর ঢাকনা খুলে দিয়েছে অকস্মাৎ, আর তার ঠাণ্ডা আভায় চতুর্দিক যেন আশ্চর্য স্নিগ্ধতায় ভরে উঠেছে।

আর ওদিকে গ্যাসের বাতিগুলোও সব একে একে জ্বলে উঠছে। নীলনির্জন পথ। দুজনে আমরা পথ হাঁটছি। রুপার্ট কথা কইছে, একটুবা উত্তেজিত। আঁকাবাঁকা রাস্তা, খানিক বাদেবাদেই এক একটা বাঁক। বাঁক পেরুচ্ছি, আর দৃষ্টির অন্তরাল থেকে একটি একটি করে ল্যাম্পপোস্টগুলি সব ভেসে উঠছে।

রুপার্ট উত্তেজিত। তার কারণ সে তখন আমাকে তার সর্বশেষ ডিটেকটিভ-থিয়োরীটা বোঝাবার জন্যে প্রাণান্তিক চেষ্টায় নিরত। ছোকরা একটু পাগলা-গোছের। তার ধারণা তার চতুর্দিকেই একটা-না-একটা চক্রান্ত চলছে। ধরুন একটা ছ্যাকরা গাড়ি উল্টে গেল, রুপার্টের অমনি মনে হবে এর পেছনে একটা চক্রান্ত বর্তমান। কিংবা ধরুন সিগারেট-লাইটারটা হঠাৎ হাত ফসকে পড়ে গেল কারুর,—রুপার্টের অমনি ভ্রূকুঞ্চন ঘটবে।

আপাতত তার সন্দেহ গিয়ে পড়েছে নিরীহ এক গোয়ালার ওপর; আমাদের ঠিক সামনেই সে পথ হাঁটছে। বেচারার অপরাধটা যে কোথায় সেইটেই রুপার্ট তখন বুঝিয়ে বলছিল আমাকে। কিন্তু তার পরে-পরেই উপর্যুপরি এমন কতকগুলি চমকপ্রদ ঘটনা ঘটে গেল যে, রুপার্টের সন্দেহের কারণগুলো আর আমার ছাই ভালভাবে ঠিক মনেও নেই। গোয়ালাটির হাতে একটিমাত্র দুধের পাত্র, তারও আবার ঢাকনা খোলা। হন হন করে সে পথ হাঁটছে, ওদিকে ঝাঁকুনির চোটে দুধটুকু যে চল্‌কে চল্‌কে রাস্তায় পড়ে যাচ্ছে সেদিকে তার ভ্রূক্ষেপও নেই। রুপার্টের মতে এর সমস্তকিছুই অত্যন্ত সন্দেহজনক। ব্যাটাচ্ছেলে যদি গোয়ালাই হবে তো দুধের দিকে ওর নজর নেই কেন? গোয়ালা না হাতি। ছদ্মবেশী

শয়তান কোথাকার! মনে মনে কিছু একটা মতলব আঁটছে নিশ্চয়ই! কে জানে কোথায় যাচ্ছে! আর হ্যাঁ, ওর জুতোজোড়াই বা অতো কাদামাখা কেন? সবকিছু মিলিয়ে কী-যেন একটা থিয়োরী জেগে উঠেছিল রুপার্টের মাথায়। আমার আর এখন সেটা মনে নেই।

দোষের মধ্যে রুপার্টের এই সন্দেহটাকে আমি হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলাম। আর যায় কোথায়, দপ করে সে জ্বলে উঠল। অতিশয় ভাল ছেলে রুপার্ট; তবে একটু ভাবপ্রবণ। বুঝলাম, আমার ঠাট্টায় সে ক্ষুব্ধ হয়েছে। রাগটাকে সামলে নিয়ে গোয়েন্দাজনোচিত গাম্ভীর্য সহকারে নিবন্ত চুরুটটাতেই সে মোক্ষম একটি টান দিল।

তারপর তিক্তকণ্ঠে বলল, "অতো কথায় কাজ কি মিঃ সুইনবার্ন, আধ ক্রাউন বাজি রাখছি। গোয়ালাটি যে গোয়ালা নয়, আসলে একটি শয়তান, এ বিষয়ে আমি একেবারে দৃঢ়নিশ্চিত। চলুন ওর পিছু নেওয়া যাক। ওর গন্তব্য জায়গায় গিয়ে যে শেষপর্যন্ত মারাত্মক কোনও একটা রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে তাতে আর আমার এতটুকুও সন্দেহ নেই।"

"বেশ," সহাস্যে বললাম, "আমিও আধ ক্রাউন বাজি রাখছি।"

"চলুন তবে।"

রহস্যময় সেই গোয়ালাটিকে চুপচাপ আমরা মিনিট পনেরো অনুসরণ করলাম। সে এক মহা যন্ত্রণাবিশেষ। ক্রমেই গতিবেগ বাড়ছে তার। রাস্তার ওপর দুধ চলকে পড়ছে, গ্যাসের আলোয় চক্‌চক করে উঠছে। তারপর, বলা নেই কওয়া নেই, হুট করে সে রাস্তার ধারের একটা বাড়ির উঠোনের মধ্যে গিয়ে নেমে পড়ল; হাওয়ার মতই মিলিয়ে গেল যেন। রুপার্টকে দেখে বুঝলাম, সে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেছে। সেকেণ্ডখানেক সে ঝিম্ মেরে রইল। তারপর দেখি সে-ও সেই উঠোনের ভেতরে নেমে পড়েছে! একটু বাদে তাকেও আর দেখা গেল না। যাবার আগে কী-যেন আমাকে বলে গেল সে, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি।

রাস্তার ধারে একটা ল্যাম্পপোষ্ট, তাতে ঠেস দিয়ে মিনিট পাঁচেক ঠায় বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর দেখি গোয়ালাটা ফের রাস্তায়

উঠে এল। হাতে সেই পাত্রটি নেই। রাস্তায় এসেই সে হনহন করে হাঁটতে শুরু করল এবং একটু বাদেই অদৃশ্য হয়ে গেল। আরও কয়েক মিনিট। তারপর রুপার্টও দেখি লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে আসছে। সারা মুখ তার উত্তেজনায় ফ্যাকাসে, তাতে অদ্ভুত একটু হাসির আভাস। রুপার্টকে আমি চিনি; বুঝলাম কিছু-একটা ঘটেছে।

হাতে হাত ঘষে হাঁফাতে হাঁফাতে সে বলল, "এবার? এবার কি হবে? এবারে আপনার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হবে বোধ হয়। লণ্ডনের কোথায় যে কী ঘটতে পারে, কতো কি-যে ঘটতে পারে, তার কিছুই আপনি জানেন না। নিন, আধ-ক্রাউন বার করুন দেখি?"

সন্দিগ্ধভাবে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তার মানে? কী বলতে চাও তুমি? সত্যিসত্যিই কি ওই গোয়ালাটা কিছু কাণ্ড বাধিয়েছে নাকি?"

মনে হলো রুপার্ট একটু ঘাবড়ে গিয়েছে।

"মানে ওই গোয়ালাটাই যে ঠিক কিছু করেছে তা নয়,—তবে—"

"তবেটবে ছেড়ে দাও," কঠিন কণ্ঠে আমি বললাম, "কাজের কথায় এসো। কি করেছে ও?"

রুপার্ট দেখলাম একটু অস্থির হয়ে উঠেছে। বলল, "সত্যি বলতে কি, গোয়ালাটার আচরণের মধ্যে আমি মারাত্মক তেমন কোনই রহস্যের সন্ধান পাইনি। দরজায় দাঁড়িয়ে ও বলল 'দুধ নিন মা', তারপর দুধের পাত্রটা ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে এল। তা এর মধ্যেও অবিশ্যি গোপন কোনও সঙ্কেত থাকা কিছু বিচিত্র নয়, কিংবা ধরুন এও হতে পারে—"

সশব্দে হেসে উঠলাম আমি। বললাম, "মূর্খ, এখনও তুমি তোমার ভুলটাকে স্বীকার করে নিতে লজ্জা পাচ্ছ? গোপন সঙ্কেত না হাতি! খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, সবাই খালি গোপন-সঙ্কেত করে বেড়াচ্ছে! যত সব ছেলেমানুষী! সে যাই হোক, গোয়ালাটার আচরণে তাহলে সন্দেহজনক তেমন কিছুর সন্ধান পাওয়া যায়নি; কেমন এই তো? লজ্জা কি বাপু, ভুলটাকে স্বীকার করে নাও—"

রুপার্ট একটু গম্ভীর হয়ে উঠল, "বেশ স্বীকার করে নিলাম। সত্যিই হয়তো লোকটা বদমাস নয়, আমারই হয়তো ভুল হয়েছে।"

কপট ক্রোধে আমি বললাম, "বাস বাস, যথেষ্ট হয়েছে। এবারে চলো খরের ছেলে ঘরে ফেরা যাক। তার আগে আর-একটা কথা তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিই ; মনে রেখো তুমি আধ-ক্রাউন বাজি হেরেছ আমার কাছে।"

রুপার্ট খুব ঠাণ্ডা গলায় বলল, "না, বাজি আমি হারিনি। গোয়ালাটার আচরণ অবশ্য নির্দোষ, সে নিজেও হয়তো নির্দোষ। কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। বাজির সর্ত কি ছিল, স্মরণ করুন। আমি বলেছিলাম, গোয়ালাটার গন্তব্য জায়গায় গিয়ে শেষ পর্যন্ত মারাত্মক কোনও একটা রহস্যের সন্ধান পাওয়া যাবে, ঠিক কিনা ?"

"বেশ তো, তাতে হয়েছে কি ?"

"এই হয়েছে যে সত্যিসত্যিই সে রহস্যের সন্ধান পাওয়া গেছে।" বলে সে আর বাক্যব্যয় করল না, তরতর করে আবার সেই উঠোনের অন্ধকারের মধ্যে নেমে পড়ল। ব্যাপারটা বুঝে উঠবার আগেই দেখি আমিও তার পিছু নিয়েছি।

উঠোনে নেমে নিজেকে আমার প্রকাণ্ড একটা মূর্খ বলে মনে হলো। উঠোন তো নয়, অন্ধকার একটা গর্ত যেন। সামনে একটা বন্ধ দরজা, খড়খড়ি নামানো জানালা গোটাকতক, এবং উঠোনে নামবার সেই সিঁড়ি—এ ছাড়া আর অন্য কিছু আমার নজর হলো না। সামনে দাঁড়িয়ে রুপার্ট, ভ্রূ-চোখ তার উৎসাহে উজ্জ্বল। রাস্তার দিকে পা বাড়িয়েছি, এমন সময় সে আমার কনুই চেপে ধরল।

"শুনতে পাচ্ছেন ?" ডান হাতে সে আমার কোট আঁকড়ে ধরে বাঁ-হাতে একটা জানালা দেখিয়ে দিল, "শুনতে পাচ্ছেন কিছু ?"

এমনভাবে সে প্রশ্ন করল যে আমি অবাক না হয়ে পারলাম না ! কী শুনব ? সামনের দিকে গলা বাড়িয়ে দিয়ে উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, যদি কিছু শ্রুতি-গোচর হয়। তারপরেই যেন কার একটা মৃদু কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম আমি। মানুষের গলা তাতে ভুল নেই। ভেতর থেকে থেকে-থেকে তার অস্পষ্ট আওয়াজ ভেসে আসছে।

রুপার্টের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে শুধোলাম, "ব্যাপার কি ? তুমি কি কারুর সঙ্গে কথা বলছিলে নাকি ?"

অদ্ভুতভাবে হাসল রুপার্ট ; বলল, "না, কারুর সঙ্গেই আমি কথা বলিনি। তবে বলতে পারলে খুশীই হতাম। কথাগুলোর অর্থ কিছু বুঝতে পারছেন ?"

"না তো—"

"বেশ, তাহলে একটু ভালভাবে শুনুন।"

পাড়াটি ভদ্র, সন্ধ্যার প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই চারদিক নিস্তব্ধ হয়ে উঠেছে। সেই নীরন্ধ্র নিস্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি ভিতরের কথাগুলো সব শুনবার চেষ্টা করলাম। আমার ঠিক সামনেই একটা কাঠের পার্টিশন, তার একজায়গায় একটা লম্বা ফাটল। ফাটলের পথে যে অস্ফুট গোঙানির শব্দ বেরিয়ে আসছে কয়েকমুহূর্তের চেষ্টাতেই তার অর্থোদ্ধার করা গেল। কে যেন কাঁদছে ; কেঁদে কেঁদে বলছে, "ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও,······হা ঈশ্বর, কখন এরা আমাকে ছেড়ে দেবে !"

রুপার্টের দিকে ফিরে দাঁড়ালাম আমি, তীক্ষ্ণকণ্ঠে শুধোলাম, "কী ব্যাপার এ সমস্ত ! তুমি জানো কিছু ?"

"কি করে জানবো !" ব্যঙ্গের গলায় রুপার্ট বলল, "আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাকেই আপনি সন্দেহ করছেন ; মনে রাখবেন আমি অপরাধী নই, আমি ডিটেকটিভ্। মিনিট দু-তিন আগেমাত্র এখানে এসেছি। প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে, কিছু একটা ব্যাপার চলছে। সে সন্দেহের কথা আপনাকে বলেওছিলাম। সে যাই হোক, প্রথম যখন এখানে আসি, খড়খড়ির ওদিককার মহিলাটি (কণ্ঠস্বর মহিলারই বটে, সে বিষয়ে কোনও ভুল নেই) তখন পাগলের মতন কাঁদছিলেন। ব্যস, এর বেশী আর কিছুই জানি না। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এ ব্যাপারের সঙ্গে আমার এতটুকু সম্পর্ক নেই। ভদ্রমহিলা আমার ত্যাজ্য কন্যাও নন, আমার বিশ্বাসঘাতিনী বিবিও নন। তবে হ্যাঁ, বন্দী হয়ে যদি কেউ কান্নাকাটি করে, কি ধরুন পাগলের মতো বিড়বিড় করে, কি ধরুন জানলা ভাঙে তবে তা আমার কাছে একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বলেই মনে হয়। এটাকেও ঐই একটা উল্লেখযোগ্য ব্যাপার বলেই আমার মনে হয়েছিল এবং

এই কারণেই ব্যাপারটা আপনাকে আমি জানানোর প্রয়োজন বোধ করেছিলাম। ব্যস, এর বেশী আর আমার কিছু বলবার নেই ; হলো ?"

বললাম "আহা-হা রুপার্ট, চটছ কেন ? যদি কিছু অন্যায় বলে থাকি তো আমি ক্ষমা চাইছি তার জন্যে। মনে রেখো, এটা এখন তর্কাতর্কির সময় নয়। আমাদের এখন কর্তব্য কি বলো ত ?"

কোমর থেকে রুপার্ট একখানা ঝকঝকে লম্বা ছুরি বার করে ফেলল।

তারপর বলল, "কর্তব্য অতি সহজ। সর্বাগ্রে দরজা ভাংতে হবে।" বলেই সে তার ছুরিখানাকে পার্টিশনের সেই ফাটলের মধ্যে ঢুকিয়ে আ্যায়সা এক চাড় দিল যে বিরাট একফালি কাঠ ছিটকে বেরিয়ে এল তৎক্ষণাৎ। গর্তটা দেখলাম বেশ বড় হয়েছে। উঁকি মারলাম। ঘরে আলো নেই, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। প্রথমটায় কিছুই আমার ঠাহর হল না। তারপর, দু-চোখে অন্ধকারটা একটু সয়ে আসতেই, এমন-একটা জিনিস আমার দৃষ্টিগোচর হল যে লাফ দিয়ে তিন পা পিছিয়ে এসে দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। সর্বনাশ ! পার্টিশনের ঠিক ওধারেই কাঁচের ফ্রেম, কে যেন সেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শীর্ণ চেহারা, ড্যাবডেবে একজোড়া চোখ। অদ্ভুত তার চাউনি। আবার সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম :

"ছেড়ে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও......"

ফিসফিস করে শুধোলাম, "ব্যাপার কি রুপার্ট ?"

রুপার্ট কোনও উত্তর দিল না, নীরবে তার ছড়িখানাকে সামনে এগিয়ে ধরল। তারপর তার ডগা দিয়ে কাঁচের ফ্রেমের ওপর গুঁতো মারতেই দেখি সেখানে একটা গর্ত হয়ে গেছে। ভিতরের ভদ্রমহিলার কণ্ঠস্বর এবারে স্পষ্টভাবে শোনা গেল। মুক্তিলাভের জন্যে তিনি সমানে কান্নাকাটি করছেন।

বিব্রতভাবে আমি সামনে এগোলাম, গর্তটার কাছে গিয়ে বললাম, "আপনার বুঝি বেরোবার উপায় নেই ?"

ভদ্রমহিলা একেবারে কঁকিয়ে কেঁদে উঠলেন, "বেরোব ! উপায় নেই আমার, উপায় নেই। ওরা আমাকে বেরোতে দেবে না। আমি ওদের ভয় দেখিয়েছি, চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব, আর নয়তো পুলিশ ডাকব ; কিছু ফল হয়নি তাতে।

কেউ আসে না, কেউই আসে না। জানতেই পারে না কেউ। যদ্দিন খুশি ওরা আমাকে আটকে রাখবে। শুধু—"

ধৈর্যের সমস্ত বাঁধ আমার তখন ভেঙে গেছে। জানালা ভেঙে ভদ্রমহিলাকে উদ্ধার করতে এগোব, রুপার্ট হঠাৎ আমায় হাত চেপে ধরল। তার সেই স্পর্শ থেকেই আমি বুঝলাম, সে ভয় পেয়েছে। বুঝলাম সে আমাকে ইঙ্গিতে থামিয়ে রাখতে চায়, কিন্তু সে-ইঙ্গিত আর কেউ বুঝে ফেলুক এমনটি তার অভিপ্রেত নয়। বিস্মিত হয়ে আমি ঘুরে দাঁড়ালাম। দাঁড়াতেই সামনের দেয়ালে আমার নজর পড়ল। এবং যা সেখানে দেখলাম তাতে সর্বাঙ্গ আমার ভয়ে অবশ হয়ে এল। দেখলাম দরজার পাল্লা খুলে কে যেন বাইরে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে। নিশ্চল অনড় মূর্তি। আমাদের দিকেই সে তাকিয়ে রয়েছে।

কে ও? অমন করে আমাদের দিকে ও তাকিয়েই বা রয়েছে কেন? লোকটার ঠিক পেছনেই একটা আলো, মুখখানাকে তাই সিলুয়েট-ছবির মত দেখাচ্ছে। ভাল করে তার রেখাগুলোকে পর্যন্ত বুঝবার উপায় নেই। এইটুকু শুধু বুঝতে পারছি যে আমাদের দিকেই সে তাকিয়ে রয়েছে। তাকিয়েই রয়েছে।

রীতিমত ঘাবড়ে গেলাম আমি। রুপার্ট ওদিকে শান্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার ধৈর্য দেখে আমার শ্রদ্ধা হলো। ধীরেসুস্থে কলিং বেল টিপল সে, তারপর ফের এটা-ওটা কথা কইতে লাগল। যেন কিছুই হয়নি। লোকটি দেখলাম দাঁড়িয়েই আছে; দেখে মনে হলো মানুষ নয়, নিষ্প্রাণ একটি স্ট্যাচু।

উঠোনের ওপরে এক ঝলক আলো এসে পড়ল হঠাৎ, চেয়ে দেখি দরজা খুলে গেছে। সামনে একটি পরিচারিকা দাঁড়িয়ে।

রুপার্টের অভিনয়ক্ষমতা অদ্ভুত। চট্ করে সে তার কণ্ঠস্বরে এমন একটা চটুল মাই-ডিয়ারী ভাব ফুটিয়ে তুলল যে আমি অবাক হয়ে গেলাম। বলল, "এইটেই তো ওয়েম্স্ অ্যাণ্ড স্ক্রেজ্ কোম্পানীর আপিস? তা বাপু—"

বাপু-বাছা বলে বিশেষ সুবিধে হলো না। যে-সমস্ত লোক একটু অসামাজিক, তাদের পরিচারিকারাও দেখবেন বড্ড গম্ভীর হয়। এটিও তার ব্যতিক্রম নয়। কঠিন গলায় সে বলল, "না, আপনারা ভুল ঠিকানায় এসেছেন।" বলে সে আর

বাক্যব্যয় করল না, বড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। আমাদের একেবারে নাকের ডগাতেই।

অগত্যা আমরা রাস্তাতেই উঠে এলাম আবার। রুপার্ট একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে বুঝলাম। মৃদুকণ্ঠে সে বলল, "নাঃ, এরা বড্ডই অভদ্র। বড্ডই অভদ্র।" পেছন ফিরে দেখলাম, দরজার আড়ালের সেই আবছায়া মূর্তিটিও ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

দু-হাত একত্র করে আমার দিকে তাকাল রুপার্ট ; বলল, "বুঝলেন কিছু ?"

কিচ্ছু না। আসলে আমি একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। সেকথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা হলোনা। আমার মাথায় আবার তখন আর একটা কথার উদয় হলো।

আমতা আমতা করে বললাম, "ছ্যাখো হে রুপার্ট, বেসিলকে একবার ব্যাপারটা জানান দরকার। তুমি কি বল ?"

উদাত্তকণ্ঠে রুপার্ট বলল, "হ্যাঁ—তা ক্ষতি কি। একটু বাদেই গ্লস্টার রোড স্টেশনে বেসিলের সঙ্গে আমার দেখা করবার কথা। চলুন একটা গাড়ি নেওয়া যাক। ও অবশ্য এসব কথা হেসেই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করতে পারে। তা করুক, তাতে আমাদের বয়েই গেল।"

গ্লস্টার রোড স্টেশনে গিয়ে দেখি চতুর্দিক ধূ ধূ। লোকজন প্রায় নেই বললেই চলে। কোথায় বেসিল! কোথায় আবার, ঐ তো। কাউন্টারের সামনে সে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় তার শাদা একটা মস্তবড় টুপি। প্রথমে ভেবেছিলাম বুঝি সে ট্রেনের টিকিট কাটছে, কোথাও হয়তো যাবে। কিন্তু টিকিট কাটতে তো অতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার কথা নয়। কাছে গিয়ে দেখি ওয়েবব্লাস্, বুকিং ক্লার্কের সঙ্গে মহানন্দে সে ধর্মতত্ত্ব নিয়ে আলাপ জুড়ে দিয়েছে। সে-একখানা দেখবার মত ব্যাপার। ক্লার্কটি তো মহা-উত্তেজিত, পারে তো সে কাউন্টারের ঘুলঘুলি দিয়ে বাইরে মাথা গলিয়ে দেয়। অদৃষ্টবাদ নিয়ে তর্ক চলছে তখন। ক্লার্কটি অদৃষ্টবাদী ; এমন কিছু সে বলে থাকবে বেসিলের যা আদৌ মনঃপূত নয়। সবেমাত্র একটা উল্টোপ্যাচ কষে বেসিল তাকে ঘায়েল করবার তালে আছে, এমন সময় আমরা গিয়ে

উপস্থিত। বেসিলকে একরকম টেনে-হিঁচড়েই আমরা বার করে নিয়ে এলাম। অতঃপর তাকে খুলে বললাম সমস্ত ব্যাপারটা। গোয়ালা, সন্দেহজনক বাড়ি, বন্দী-মহিলা, আবছায়া-মূর্তি—কোন কথাই বাদ দিলাম না।

বেসিল বেশ মনোযোগ সহকারে সব শুনল। তারপর বলল, "যা শুনছি, তাতে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করে এগোনো দরকার। তোমরা কি আর-একবার সেখানে যেতে চাও? কি অজুহাতে যাবে? একই অজুহাতে যদি একই জায়গায় তোমরা দু-দুবার যাও তো সেটা নিতান্তই খারাপ দেখায়। ভিন্ন অজুহাতে যাওয়াও মুশকিল। সেক্ষেত্রে তাদের সন্দেহটা আরো বেড়ে যাবে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে যিনি তোমাদের লক্ষ্য করছিলেন, নিশ্চিত থাকতে পার, তিনি তোমাদের বেশ ভালভাবেই চিনে রেখেছেন। সুতরাং, দ্বিতীয়বার গেলে তোমরা ফ্যাসাদে পড়বে। পুলিশের সাহায্য নেওয়াটাও বোধহয় খুব বুদ্ধির কাজ হবে না। তার চাইতে একটা কাজ করা যাক্। তোমরা বরং রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবে, আমি গিয়ে ভিতরে ঢুকব। কেমন, রাজী?"

অগত্যা। বেসিল একটু ধীরেসুস্থে হাঁটে। তারপর আবার সে আজ চিন্তাগ্রস্ত। বাড়িটার কাছে গিয়ে পৌঁছুতে তাই বেশ দেরি হয়ে গেল। বিরাট বাড়ি। আসন্ন রাত্রির ম্লানরক্ত আকাশের পটভূমিকায় তাকে যেন একটি রহস্যময় প্রাসাদের মত দেখাচ্ছে। রহস্যময়,—তাতে আর সন্দেহ কি!

রুপার্ট একটু ধরা-ধরা গলায় বলল, "বেসিল, একা-যাওয়াটা তোমার ঠিক্ হচ্ছে তো? বেশ ভেবেচিন্তে ত্যাখো। আমরা অবিশ্যি কাছেই রইলাম। কিন্তু কি জানো, এসব বদমাসদের তো আমি চিনি, হঠাৎ কখন ছুরি চালিয়ে বসবে টেরই পাবে না। কাজটা বোধহয় ভাল হচ্ছে না। আরেকবার ভেবে ত্যাখো বরং—"

"ভাববার কিছু নেই," বেসিলের গলাটাকে যেন অদ্ভুত শান্ত শোনাল, "বিপদের ভয় বৃথা। তার কারণ, একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর কোনও কিছুই নিরাপদ নয়।"

সামনের দিকে এগিয়ে গেল সে, দরজার সামনে গিয়ে কলিং বেল বাজাল। দরজা খুলল, বেসিল ভিতরে ঢুকল, দরজা বন্ধ হল। আর তাকে দেখতে পেলাম না। শিরদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা একটা স্রোত নেমে গেল আমাদের। মনে হল,

বিরাট ওই বাড়িখানা যেন তার প্রকাণ্ড হাঁ মেলে দিয়ে বেসিলকে তার ক্ষুধার্ত গহ্বরে গ্রাস করে নিয়েছে।

শীত-শীত হাওয়া দিচ্ছে রাস্তায়, কোটের কলারে গলা ঢেকে নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে রইলাম। দাঁড়িয়েই রইলাম। মুখে আমাদের কথা নেই, কী-এক অদ্ভুত আশঙ্কায় আমরা স্তব্ধ হয়ে গেছি। মিনিট কুড়ি কাটল, বেসিলের তবু দেখা নেই। রুপার্ট আর থাকতে পারলনা; বলল, "নাঃ এ আর সহ্য করা যায়না; বেসিলের খোঁজে চললাম আমি।"

এক-পা' মাত্র এগিয়েছিল সে, হঠাৎ আবার লাফ দিয়ে পিছিয়ে এল। চেয়ে দেখি দরজা খুলে গেছে, বেসিল গ্র্যাণ্ট বেরিয়ে আসছে। দূরের থেকেই তার হাস্যরোল শুনতে পেলাম। হো-হো করে হাসছে, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কথা কইছে। দূরে দাঁড়িয়ে আমি তার প্রত্যেকটি কথা শুনতে পেলাম। বাড়ির ভেতরে যেন দাঁড়িয়ে আছে কারা, তাদের সঙ্গেই আলাপ করছে বেসিল। তাদের কথাও স্পষ্ট শোনা গেল।

বেসিল বলছে, "না না, অসম্ভব। ও-সব হচ্ছে নাস্তিকদের যুক্তি। আত্মাই হচ্ছে আসল, মহাজাগতিক সমস্তকিছু শক্তিরই সে নিয়ন্তা। কিন্তু না, আজ আর নয়। এবারে আমি চলি, কেমন?"

ভেতর থেকে সহাস্যে কে বলল, "আবার আসবেন। আসবেন কিন্তু। মনে রাখবেন এখনো আমাদের তর্ক শেষ হয়নি।"

বেসিল ততক্ষণে রাস্তায় এসে উঠেছে। সেইখান থেকেই সে চিৎকার করে বলল, "নিশ্চয়ই আসব, নিশ্চয়ই। শুভরাত্রি।"

দরজা বন্ধ হবার আগে ওদিক থেকেও তার উত্তর এল, "শুভরাত্রি।"

"বেসিল", ফ্যাসফেসে করাত-কাটা গলায় রুপার্ট বলল, "এবারে তবে কি করা যায় বলো?"

প্রশ্ন শুনে বেসিল মনে হ'ল একটু বিস্মিত হয়েছে।

তাতে আমিও বিস্মিত হলাম। বললাম, "হাঁ করে অমন দেখছ কি? বলো, কি করব এখন?"

আমতা আমতা করে বেসিল বলল, "কি আর করবার আছে। চল, একটা রেস্তোর্যাঁয় ঢুকে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক বরং, তারপর একটা থিয়েটারে গেলেই চলবে। ও দুটি ছোকরাকেও আসতে বলেছিলাম ; ওরা বলল, কাজ আছে।"

বোকার মত আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। থিয়েটারে যাবে! বেসিল বলে কি!

রুপার্ট বলল, "থিয়েটার! তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? থিয়েটারে যাব কেন?"

রুপার্টের কথায় বেসিল অবাক হয়ে গেল। "বলল, তার মানে? থিয়েটারে যাব কেন মানে? রুপার্ট, রাতারাতি কি তুমি পিউরিটান হয়ে উঠলে নাকি? থিয়েটারে যাব কেন! যে জন্যে সবাই যায়। এই একটু ফুর্তির জন্যে। কেন, ফুর্তিতে তোমার আপত্তি আছে নাকি?"

অধৈর্য হয়ে চেঁচিয়ে উঠল রুপার্ট, "ধুত্তোর থিয়েটার! ওদিকে যে অসহায় এক ভদ্রমহিলা আটকা পড়ে আছেন সেদিকে তোমার খেয়ালই নেই? আশ্চর্য তোমার শখ বেসিল। থিয়েটারের কথা তুমি ভাবতে পারলে এখন? ছিঃ। ভদ্রমহিলাকে উদ্ধার করবার কথা কিছু ভাবলে? আমার মনে হয়, পুলিশে খবর দেওয়াই ভাল। কি বলো তুমি?"

বেসিল যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল ; যাক, রুপার্ট তাহলে পিউরিটান হয়ে যায়নি। হেসে বলল, "ওঃ, সেই ভদ্রমহিলা? তাঁর কথা বলছ? ভুলেই গিয়েছিলাম। তা হ্যাঁ, ঠিক আছে, ও নিয়ে আর মাথা না ঘামালেও চলবে। খুব সম্ভব ঘরোয়া ব্যাপার। সে যাই হোক, ছেলে দুটি যদি আসত তো বড় খুশী হতাম আমি। ওই যে একটা বাস আসছে দেখছি। স্লোন স্কোয়্যারের ওদিকে ভাল একটা রেস্তোরাঁ খুলেছে ; চল তবে, সেখানেই যাওয়া যাক।"

কথা বলার ঢঙে আমার গা জলে গেল। বললাম, "ইয়ারকি রাখো। ও অবস্থায় একজন ভদ্রমহিলাকে ফেলে রেখে যাওয়া অসম্ভব। কাকে তুমি ঘরোয়া ব্যাপার বলো? গুণ্ডামি, মানুষ-গুম, খুনজখম—এগুলি কি কারুর ঘরোয়া ব্যাপার? কারুর বাড়ি গিয়ে যদি তুমি ভাখো যে তার ড্রয়িং-রুমে একটা লাশ পড়ে আছে তো

তা নিয়ে তাকে কোনও প্রশ্ন করাটাকেও বুঝি তুমি অভদ্রতা বলে মনে করো? বলিহারী ভদ্রতাজ্ঞান!"

ঠা-ঠা করে হাসল বেসিল। বলল, "শাবাশ ভাই, জবর একখানা উপমা ঝেড়েছ। তবে, এক্ষেত্রে ব্যাপারটা একটু আলাদা। এই যে, বাস এসে গেছে।"

রাগতস্বরে রুপার্ট বলল, "এক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা অন্যরকম—তাই বা তুমি কি করে জানলে?"

"আরে বাবা, ও আমি দেখলেই বুঝতে পারি।" রিটার্ন টিকিটটাকে দাঁতে চেপে ধরে বেসিল তার ওয়েস্টকোটের পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, "ছেলে দুটি একেবারে যাকে বলে হীরেরটুকরো। জীবনে ওরা কখনো কোনও অন্যায় কাজ করেনি, করতে পারে না। এ আমি লিখে দিতে পারি। সে যাকগে, তোমাদের কারুর কাছে একটা আধ-পেনি হবে? দাও তো, বাসে উঠবার আগে একটা কাগজ কেনা যাক।"

"ধুত্তোর কাগজ!" রাগে খেঁকিয়ে উঠল রুপার্ট "বেসিল, কোন্ যুক্তিতে এক মহিলাকে তুমি ও-অবস্থায় ফেলে যেতে চাইছ? ছেলে দুটির সঙ্গে তোমার দু-চার মিনিট মাত্র আলাপ হয়েছে, তাতে তোমার মনে হয়েছে যে তারা ভাল ছেলে,—শুধুমাত্র এই যুক্তিতেই?"

দাঁত থেকে টিকিটখানাকে সরিয়ে নিয়ে বেসিল বলল, "না। ভাল ছেলেরাও যে অবস্থাবিশেষে অন্যায় অপরাধ করে তা আমি জানি। তবে সেই সঙ্গে এও জানি যে ও-ধরণের ভাল ছেলেরা ও-ধরণের অপরাধ করে না।"

বাস ততক্ষণে এসে পড়েছে। উঠব কি উঠব না—এই নিয়ে একটা ঝুলোঝুলি চলল। বেসিলের কলার চেপে ধরে দৃঢ়স্বরে আমি বললাম, "অসম্ভব। এখান থেকে চলে যাওয়া এখন অসম্ভব। আমি অন্তত যাব না।"

রুপার্ট বলল, "আমিও না। এটা যে একটা জঘন্য ষড়যন্ত্রের ব্যাপার তাতে আর আমার একটুকুও সন্দেহ নেই। এখন যদি চলে যাই তো রাত্তিরে আমার ঘুম হবে না।"

বেসিল বলল, "বেশ, তোমাদের ইচ্ছাই তাহলে পূর্ণ হোক। যতো পারো তদন্ত

করো। তবে আগে থাকতেই তোমাদের জানিয়ে রাখছি যে এ তোমাদের পণ্ডশ্রম। ও-দুটি ছেলে অত্যন্তই সৎ। অক্সফোর্ড থেকে ডিগ্রী নিয়ে বেরিয়েছে, ব্যবহারও চমৎকার। দোষের মধ্যে চরম ডারউইন-ভক্ত। ঐ যে বিবর্তনবাদ না কি-সব কথা উঠেছে আজকাল—ওইগুলো সব মাথায় ঢুকেছে আর কি।"

ততক্ষণে আমরা আবার সেই রহস্যময় বাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়েছি। কলিং বেলের বোতাম টিপে রুপার্ট বলল, "আমরা এবারে ভেতরে ঢুকি, তুমি বাইরে দাঁড়াও। ফিরে এসে বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ওঁদের মতামতটা বেশ বিশদভাবেই তোমাকে জানানো যাবে, কেমন?"

ক্রুদ্ধকণ্ঠে বেসিল বলল, "তোমাদের উদ্দেশ্যটা জানতে পাই?"

"উদ্দেশ্য?" রুপার্ট বলল, "উদ্দেশ্য অতি সরল। প্রথমত বাড়ির মধ্যে ঢুকব; দ্বিতীয়ত তোমার ওই অক্সফোর্ডের ডিগ্রীওয়ালা যুবক দুটিকে একবার আপাদমস্তক অবলোকন করব; তৃতীয়ত এক ঘুঁষিতে তাদের মাটিতে শুইয়ে ফেলব; অতঃপর তাদের পিছমোড়া করে বাঁধব, মুখের মধ্যে কাপড় গুঁজে দেব এবং সারাবাড়িতে তল্লাসি চালাব।"

বেসিলের মুখে আর কথা সরল না কিছুক্ষণ। তারপর দেখি, নিঃশব্দে সে হাসতে সুরু করেছে। হাসি থামিয়ে বলল, "আহা, নিরীহ ব্যাচারা! তোমাদের হাতে তাদের অশেষ লাঞ্ছনা আছে দেখছি। যা হোক, ভালই হবে। অতো বেশী ডারউইন-ভক্ত হলে এক-আধটু মারধোর খাওয়া দরকার। যা তোমাদের উদ্দেশ্য শুনলাম তার মধ্যেও বেশ খানিকটা ডারউইন-ডারউইন গন্ধ আছে কিনা, তাই এ-কথা বলছি। ভালই হবে।"

"তুমিও আসছ তো?" রুপার্ট শুধোল।

বেসিল বলল, "নিশ্চয়ই আসছি। তবে তোমাদের সাহায্য করবার জন্যে নয়, তোমাদের হাত থেকে ওদের রক্ষা করবার জন্যে।"

উদাসীনভাবে একধারে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল, চোখেমুখে নিস্পৃহ অনাসক্ত ভাব। কিন্তু, যেইনা দরজা খুলেছে, লাফ দিয়ে সে সর্বাগ্রে গিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

বাইরে দাঁড়িয়ে বেসিলের গলা শুনতে পেলাম : "বারংবার আপনাদের বিরক্ত করতে হচ্ছে, তার জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন। এখান থেকে বেরিয়েই আমার পুরনো দুই বন্ধুর সঙ্গে দেখা, তারা আপনাদের সঙ্গে আলাপ করতে চায়। অনুমতি করেন তো ভিতরে নিয়ে আসি।"

"বিলক্ষণ, বিলক্ষণ।" যুবককণ্ঠের সাগ্রহ অনুমোদন শোনা গেল। বুঝলাম এবারে আর ঝি নয়, কর্তাদেরই কেউ এসে দরজা খুলেছেন। ভিতরে ঢুকে তাঁকে দেখলাম। দোহারা চেহারা, ছোকরা বয়েসী, কোঁকড়া চুল। নাকটা একটু চ্যাপ্টামতোন। পায়ে চটি, গায়ে কলেজী ব্লেজার। পথ দেখিয়ে আমাদের তিনি ওপরে নিয়ে চললেন। যেতে যেতে বললেন, "দয়া করে একটু সাবধানে আসবেন, সিঁড়িটার আবার অবস্থা কাহিল। বাইরে থেকে বোঝা যায় না, বাড়িটা আসলে ভারী পুরনো। ভিতরের দিকে আবার তেমনি গলিঘুঁজি, প্রায় একটা গোলকধাঁধার মতো।"

রুপার্টের মুখে একটা নিষ্ঠুর হাসি ফুটে উঠল ; বলল, "সে বিষয়ে আমাদের এতটুকু সন্দেহ নেই।"

বাড়িটার পেছন দিককার যে ঘরটিতে গিয়ে আমরা পৌঁছুলাম, দেখে মনে হলো সেটি পড়বার ঘর। এঁরা সেটিকে দিয়ে একাধারে পড়বার এবং বসবার ঘরের কাজ চালাচ্ছেন। চতুর্দিকে বইপত্তরের ছড়াছড়ি। সর্বরকমের বই। দান্তের কাব্যগ্রন্থ থেকে শুরু করে সুলভ গোয়েন্দা-কাহিনী—কোনও কিছুরই অভাব নেই।

দ্বিতীয় যুবকটিকেও দেখলাম। বিরাট জোয়ান, মরচে-পড়া আলুথালু চুল, গায়ে নরফোক্ জ্যাকেট, চুল্লীর দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে তিনি হেস্ হেস্ করে একটি পাইপ টানছেন। চেহারার মধ্যে একরত্তিও মিহিভাবের বালাই নেই, তা সত্ত্বেও—কি জানি কেন—দেখলেই তাঁকে অসাধারণ ভদ্র বলে মনে হয়। নাম শুনলাম বারোজ।

পরিচয়ের প্রাথমিক পালা সাঙ্গ হতেই তিনি বেসিলের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "হ্যাঁ, যে কথা হচ্ছিল। মিঃ গ্র্যান্ট, বৈজ্ঞানিকদের ওপর আপনি যেন বড্ডোবেশী চটা। তাদের আপনি একেবারে নস্যাৎ করে ফেলতে চান। সত্যি

বলতে কি, আপনার কথাবার্তা শুনে তো এক-একসময় আমার মনে হচ্ছিল যে, ক্রিকেটের মোহ ছেড়ে দিয়ে এবার কাব্যচর্চা শুরু করলেই পারি।"

বেসিল বলল, "আরে ছিঃ, বৈজ্ঞানিকদের ওপর আমার কিছুমাত্র রাগ নেই। থাকার কোন মানেও হয় না। ব্যাপারটা কি জানেন, সমাজে আজকাল একটা ভুঁইফোঁড় শস্তা-মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। গায়ে তার বিজ্ঞানের লেবেল আঁটা। আসলে কিন্তু সেটা একটা অন্ধ ধর্মবিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়। এইখানেই আমার আপত্তি। কথাটা তবে বুঝিয়ে বলি। আদম এবং ঈভের স্বর্গচ্যুতি নিয়ে আমরা আলোচনা করে থাকি। আলোচনার সময় মনে রাখি যে ওটা একটা দৈবরহস্য, পার্থিব বুদ্ধি দিয়ে ওর কোনও বেড় পাওয়া যায় না। ওদিকে অস্তিত্বের সংগ্রাম এবং সে-সংগ্রামে যোগ্যতমের জয়লাভ নিয়ে আলোচনার সময় কিন্তু এই ভেবে আমরা উৎফুল্ল বোধ করি যে, এ-আর এমন শক্ত কথা কি, এ-তো নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার। আসলে কিন্তু মোটেই তা নয়। ব্যাপারটা যদি আদৌ না-বুঝতাম তো ক্ষতি ছিল না। মুশকিল হয়েছে কি জানেন, ব্যাপারটাকে আমরা আগাপাস্তলা ভুল বুঝি। আপনাদের ধারণা, ডারউইনবাদের প্রবর্তনের ফলে চিন্তারাজ্যের ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। সামান্যমাত্রও পরিবর্তন ঘটে নি। ঘটলেও, সামান্যমাত্রই ঘটেছে। কতোটুকু ঘটেছে জানেন? অ-দার্শনিক মন নিয়ে যারা দর্শন কপচাতো, অ-বৈজ্ঞানিক মন নিয়ে সেই তারাই আবার এখন বিজ্ঞান কপচাচ্ছে।"

মিঃ বারোজ বললেন, "বেশ তো, কে তা অস্বীকার করছে? তবে তাতেও কিন্তু আপনার যুক্তি ধোপে টেঁকে না। তার কারণ কিছু-কিছু লোক ওরকম অল্প-অল্পই বুঝবে। বিজ্ঞানই বলুন আর অঙ্কশাস্ত্রই বলুন আর বেহালাই বলুন—পুরোপুরি বুঝতে পারাটা বড় চাট্টিখানি কথা নয়। একমাত্র বিশেষজ্ঞরাই তা পারেন; তা বলে সাধারণ মানুষ কি তার কিছুই বোঝে না? কিছু কিছু অন্তত নিশ্চয়ই বোঝে।" এই পর্যন্ত বলে বারোজ একটু দম নিলেন, তারপর ব্রেকফাস্টের সেই খাটো যুবকটিকে দেখিয়ে বললেন, "এই গ্রীণউডের কথাই ধরুন না কেন, জীবনে কখনো ও সঙ্গীতচর্চা করে নি। তাই বলে কি ওর আদপেই সুরজ্ঞান

নেই? আছে, মিঃ গ্র্যান্ট, আছে। তা যদি না থাকত তো অর্কেস্ট্রায় যখন 'গড্ সেভ্ দি কিং' বাজানো হয়, চট করে ও তখন মাথার থেকে টুপি নামিয়ে নেয় কেন? কই, আর কোনও গৎ বাজার সময় তো টুপি নামায় না? একই যুক্তিতে বিজ্ঞানও দেখবেন—"

বাধ্য হয়েই মিঃ বারোজকে এখানে থেমে পড়তে হ'ল। এমন একটা যুক্তি দিয়ে তাঁর কণ্ঠরোধ করা হ'ল—দার্শনিক আলোচনায় যা সম্পূর্ণই অভূতপূর্ব। এবং সে যুক্তিকে খুব ন্যায়সঙ্গতও বলা চলে না। চেয়ে দেখি, পেছন থেকে রুপার্ট গ্র্যান্ট বাঘের মতো তাঁর ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। টুঁটি টিপে ধরে বারোজকে সে চিত করে ফেলবার তালে আছে।

সেই অবস্থাতেই আমি রুপার্টের অমোঘ আদেশ শুনতে পেলাম, "হাঁ করে অমন দেখছেন কি মিঃ স্বইনবার্ণ, ও-ছোকরাকেও শুইয়ে ফেলুন।" কী-করছি, কেন-করছি, তা আর তখন খেয়াল নেই,—বীরবিক্রমে আমি মিঃ গ্রীণউডের ওপর লাফিয়ে পড়লাম। তিনি দেখি মহা শয়তান। প্রথমটায় খুব তিড়িং তিড়িং করে লাফাতে লাগলেন; ছিটকে বেরিয়ে যাবার মতলব আর কি। তবে এমনই শক্ত করে তাঁকে জাপটে ধরেছিলাম যে, তা আর তাঁর সম্ভব হল না। গ্রীণউডের ডান পা'খানাকে আমি ততক্ষণে মাটির থেকে বেশ-খানিকটা ওপরে তুলে ফেলেছি। সেটাকে বেশ শক্ত মুঠোয় ধরে অতঃপর খানকতক মোক্ষম কায়দায় মোচড় মারতেই তিনি দড়াম করে মাটিতে ছড়ানো কাগজপত্তরের ওপর আছড়ে পড়লেন। আমি তাঁর ওপর চেপে বসলাম।

এতক্ষণ আর আমার জ্ঞানগম্যি ছিল না। এবারে একটু নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর মিলতেই শুনতে পেলাম স্থিরকণ্ঠে বেসিল যেন কী বলছে। কথাগুলোর গোড়ার দিকটা আমি শুনতে পাইনি, শেষাংশ অনেকটা এই রকম—

"...আমার বুদ্ধিতেই আসছে না। অপ্রীতিকর তো বটেই। তবে, নতুন বন্ধুদের সঙ্গে যদি আমার পুরনো বন্ধুদের লড়াই বাধে তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে আমার পুরনো-বন্ধুদেরই পক্ষে নিতে হবে। বাধ্য হয়েই আপনার হাত দুখানি তাই বেঁধে ফেলতে হচ্ছে। এ দায়িত্ব যে অত্যন্তই অপ্রীতিকর তাতে সন্দেহ নেই।

কিন্তু ঐ যে বললাম, নিতান্তই আমি উপায়ান্তরবিহীন। সুতরাং আশা করি আপনি আমার অপরাধ নেবেন না। এবারে যদি অনুমতি করেন তো এই কাড়নটা দিয়ে আপনার হাত দুখানাকে বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেলি। না না, আপনার হাতে কিছুমাত্র ব্যথা না লাগে সেদিকে আমার নিশ্চয়ই নজর থাকবে। ইতিমধ্যে—"

বেসিলের কথা আর শেষ হলো না। অকস্মাৎ এমন একটা অঘটন ঘটল যে সেকথা মনে করতেও এখন আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় মিঃ বারোজ তখন রুপার্টের আলিঙ্গনের মধ্যে ছট্‌ফট্ করছেন, সেই অবস্থাতেই বেসিল তাঁর হাত দুখানি বেঁধে ফেলবার কঠোর সাধনায় নিমগ্ন। বেসিল এবং রুপার্ট, দুজনকেই বেশ জোয়ান বলা চলে। বারোজও যে বেশ বলিষ্ঠ তা আমি আগেই টের পেয়েছিলাম। এখন দেখলাম, বলিষ্ঠ বললে তার কিছুই বলা হয় না। আসলে তিনি একটি দৈত্যবিশেষ। পেছন থেকে রুপার্ট তাঁর টুঁটি টিপে দাঁড়িয়ে আছে, সেই অসুবিধাজনক অবস্থাতেও তাঁর সারা শরীরে যেন শক্তির একটা উত্তাল তরঙ্গ বয়ে গেল। হঠাৎ একটা নিদারুণ ঝাঁকুনি দিয়ে নিমেষে তিনি মুক্ত করে নিলেন নিজেকে,—ধাক্কার বেগ সামলাতে না পেরে রুপার্ট গিয়ে তিন হাত তফাতে ছিটকে পড়ল। অতঃপর বেসিলের পালা। মাথা নিচু করে বারোজ তার পেটের উপরে অ্যায়সা এক গুঁতো লাগালেন যে, তৎক্ষণাৎ সে ভূমিশয্যা গ্রহণ করল। বুঝলাম, তার হয়ে গেছে। অতঃপর আমার পালা। ক্যাঁক করে আমার গলা টিপে ধরে অবলীলাক্রমে মিঃ বারোজ আমাকে পাঁচ হাত তফাতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। শূন্যপথে আমি ওয়েস্টপেপার বাস্কেটটার ওপরে গিয়ে আছড়ে পড়লাম। বাস্কেটটা একেবারে চুরমার হয়ে গেল। ওদিকে গ্রীণউডও ততক্ষণে খাড়া হয়ে উঠেছেন। বেসিলও লাফিয়ে উঠতে গেল। কিন্তু বৃথা, সর্বনাশের তখন আর বিশেষ কিছু বাকি নেই।

ঘরের এককোণে একটা কলিং বেল ; গ্রীণউড একেবারে পাগলের মতো ছুটে গিয়ে মুহুর্মুহু সেটাকে বাজাতে লাগলেন। টলতে টলতে আমি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করতে লাগলাম। রুপার্টের দিকে তাকিয়ে দেখি দু-চোখ তার কপালে উঠে গেছে। সবেমাত্র সে একটু মাথা তুলেছিল বুঝি, বেচারার আর উঠে বসবারও

সময় হ'ল না। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি ইয়া-ইয়া চেহারার দুই ভৃত্য এসে ঢুকেছে। ভয়ে আমি চোখ বুঁজলাম। দুজনের সঙ্গেই আমরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলাম এতক্ষণ, এবারে এরা চারজন হ'ল। কিছু বুঝে উঠবার আগেই দেখি গ্রীণউড এবং সেইসঙ্গে নবাগতদের একজন একেবারে ব্যাঘ্রবিক্রমে এসে আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। ভাঙা বাক্সেটার উপরে মড়ার মতন পড়ে ছিলাম আমি, তার উপরেই আমি দলাইমলাই হতে লাগলাম। অপর ভৃত্যটিসহ মিঃ বারোজ গিয়ে বেসিল গ্র্যান্টকে পাকড়ালেন, দেওয়ালের উপরে ঠেসে ধরলেন তাকে। রুপার্ট তার কনুইয়ের উপরে ভর দিয়ে কাৎ হয়ে পড়ে ছিল, সেইভাবেই সে পড়ে রইল। মনে হল, ব্যাপার দেখে তার বুদ্ধিশুদ্ধি সব তালগোল পাকিয়ে গেছে।

অসহায় অবস্থায় শুয়ে শুয়েই আমরা বেসিল গ্র্যান্টের পরিষ্কার চাঁচাছোলা গলা শুনতে পেলাম। বেশ খুশী-খুশী গলাতেই সে বলছে, "বাঃ, খেলাটা বেশ জমে উঠেছে দেখছি।"

কাৎ হয়ে বেসিলকে একবার দেখতে চেষ্টা করলাম আমি। এর-ওর-তার হাতপায়ের ফাঁক দিয়ে চোখ চালিয়ে দেখলাম, বেসিলের মুখখানাকে একটা বুক্-কেসের ওপর ঠেসে ধরা হয়েছে। সেই অবস্থাতেও, কী আশ্চর্য, খুশিতে জলজল করছে তার চোখ। এতটুকু সে বিচলিত হয় নি, বরং খুব ফুর্তি পেয়েছে যেন।

বার কয়েক আমি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম। বিশেষ সুবিধে হল না। ভৃত্যটি বেশ কায়দা করে আমার উপরে চেপে বসেছে আমাকে তার একলার হাতে ছেড়ে দিয়ে গ্রীণউড তখন বারোজকে সাহায্য করতে এগোলেন। তলা ফেঁসে গেলে জাহাজ যেমন একটু একটু করে ডুবে যেতে থাকে, বেসিলও ঠিক তেমনিভাবেই তখন একটু একটু করে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। মাথাটা এমন অস্বাভাবিকভাবে ঝুলে পড়েছে যে দেখে আমার ভয় হল। সেই অবস্থাতেই সে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বুক্-কেসের ওপরে রাখা মস্ত-একখানা বই খাকড়ে ধরল। বইখানা হচ্ছে সেন্ট্ ক্রিসস্টমের থিয়োলজীর বিরাট একটি ভল্যুম। গ্রীণউড আর এক-পা এগোতেই বেসিল সেই বইখানাকে হঠাৎ বিদ্যুদ্বেগে ছুঁড়ে মারল তাঁর দিকে। অব্যর্থ লক্ষ্য। বাপ্ বলে বসে

পড়লেন গ্রীণউড, ছহাতে মুখ চেপে ধরে ভূতলে গড়াগড়ি খেতে লাগলেন। বেসিলের শক্তিরও তখন আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট ছিল না। সে নিজেও এবারে মাটিতে লম্বা হয়ে পড়ল। বারোজ দেখলাম তার পিঠের ওপরে বেশ যোক্ষমভাবে চেপে বসেছেন।

রুপার্ট এতক্ষণ শুয়ে শুয়ে শক্তিসঞ্চয় করছিল বোধহয়, গ্রীণউড ধরাশায়ী হতেই সে তিন লাফে গিয়ে তাকে জাপটে ধরল। অতঃপর তাঁকে নিয়ে গড়াগড়ি খেতে লাগল। আমার তখন বন্দীদশা। নিরুপায়ভাবে আমি এই লড়াই দেখতে লাগলাম। ঘরের তখন যা অবস্থা তা না-বলাই ভাল। আসলে সেটিকে আর তখন ঘর বলেই চেনা যাচ্ছে না, সমগ্র ঘরটিই যেন তখন বিরাট একটি ওয়েস্টপেপার বাস্কেটে পরিণত হয়েছে। সর্বত্র এক-হাঁটু ছেঁড়া কাগজ। বারোজ আর তার সঙ্গী যেন তার মধ্যে স্রেফ সাঁতরে ফিরতে লাগলেন। ওদিকে গ্রীণউডের ডান-পা'খানা আবার এমন হাস্যকর-ভাবে এক শিট পলমল গেজেটের ভেতরে আটকে গেছে যে সে আর কহতব্য নয়।

বেসিল কি দম আটকে মরে গেছে ওদিকে? তা-ই হবে বোধহয়। তাকে আর আমি দেখতে পাচ্ছিনা তখন। যেমনভাবে ছুই নরদানব তার পিঠের উপরে জেঁতে বসেছে তাতে অন্তত তার বেঁচে থাকবার কথা নয়। কিন্তু তা-ই বা কি করে সম্ভব? মরেই যদি যাবে তো বারোজ তাকে ছাড়ছেন না কেন এখনো? বারোজের বিরাট পৃষ্ঠদেশ দেখছি সামনের দিকে নোয়ানো। তাতে মনে হল উপুড় হয়ে বসে তখনো তিনি সমানে উত্তম-মধ্যম লাগাচ্ছেন। হঠাৎ তিনি একেবারে লাফিয়ে উঠ্‌লেন। তারপরে এদিকে-ওদিকে টলতে লাগলেন। এ আবার কি ব্যাপার? চেয়ে দেখি তিনি এক-পায়ে ভর দিয়ে টল্‌ছেন; আরেকখানা পা তখন বেসিলের দখলে। বারোজের ভৃত্যটি একেবারে পাগলের মতন দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে দমাদম ঘুঁষি মারছে বেসিলের মাথায়। মাথাটি যেন একটি নেহাই, ঘুঁষির হাতুড়িতে সেটা ফেটে যাবার উপক্রম। তা সত্বেও বেসিল বারোজের পা'খানাকে ছেড়ে দিল না, আটকেই রাখল। যন্ত্রণায় সারা মুখ তার বিকৃত হয়ে গেছে, সেই অবস্থাতেই হস্তধৃত পা'খানাকে

সে মোচড়াতে শুরু করল। বারোজ আর পারলেন না। টলোমলো অবস্থায় এক-পায়ে ভর দিয়ে লাফাতে শুরু করলেন। সে আর কতক্ষণ! পাহাড়ের মতন সেই নরদানব হঠাৎ আছড়ে পড়লেন মেঝের উপর। সারা ঘর যেন দুলে উঠল আমার চোখের সামনে; মেঝে, দেয়াল, চেয়ার-টেবিল, কড়ি-বরগা সব থর থর করে কাঁপতে লাগল।

আনন্দে লাফিয়ে উঠল বেসিল, এক ঘুঁষিতে সে ভৃত্যটিকে স্রেফ মাটির ওপরে ঘুম পাড়িয়ে ফেলল; তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বারোজের উপরে। ভালো করে কিছু বুঝে উঠবার আগেই দেখি, বারোজের হাত দু-খানাকে সে বেশ শক্ত করে বেঁধে ফেলেছে। অতঃপর গ্রীণউডের পালা। একা রুপার্ট ঠিক এঁটে উঠতে পারছিল না, বেসিল আসতেই তার জোর বেড়ে গেল। একটু বাদেই দেখি, গ্রীণউডও ঠিক বারোজের দশাই প্রাপ্ত হয়েছেন। যে ভৃত্যটি এতক্ষণ আমার উপরে চেপে বসেছিল, গ্রীণউডের দশা দেখে তার চক্ষুস্থির। মনিবকে সাহায্য করবার জন্যে যেই না সে এক পা এগিয়েছে, তড়াক করে আমি লাফিয়ে উঠলাম এবং সন্তুষ্টচিত্তে তাকে একটি বিরাশী-সিক্কা ওজনের চড় কষিয়ে দিলাম। সেইখানেই সে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। অন্য ভৃত্যটির দিকে তাকিয়ে দেখি, সারা মুখে তার রক্ত ঝরছে। তার তখন নিতান্তই হতোদ্যম অবস্থা। যুদ্ধের ছত্রভঙ্গ অবস্থা দেখে সে আর বাক্যব্যয় করল না, খোঁড়াতে খোঁড়াতে রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করল। ওদিকে আমার চড় খেয়ে যার চক্ষুস্থির হয়ে গিয়েছিল, সে-ও দেখি উঠে বসে জুলজুল করে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। হঠাৎ এক সময় দাঁড়িয়ে উঠে একদৌড়ে সে পালিয়ে গেল। ঘরের দিকে তাকালাম। গ্রীণউড এবং বারোজ পাশাপাশি শুয়ে আছেন। গ্রীণউডের বুকের উপরে রুপার্ট, বারোজের বুকের উপরে বেসিল। দৃশ্যটি বড় মধুর লাগল।

বারোজ হঠাৎ শুনি সেই অবস্থাতেই শান্তস্বরে বেসিলকে বলছেন, "আপনাদের মনস্কামনা তো পূর্ণ হয়েছে, দয়া করে যদি এখন এর অর্থটা বুঝিয়ে দেন তো কৃতার্থ হই।"

বেসিল বলল, "বিলক্ষণ—এর অর্থ অতি প্রাঞ্জল। আপনারা ডারউইনবাদী, সুতরাং বুঝতে আপনাদের কষ্ট হবারও কোনও কথা নয়। আপনাদের বৈজ্ঞানিক ভাষাতেই বলছি, এ হচ্ছে 'সারভাইভ্যাল অব দি ফীটেস্ট'।"

লড়াইয়ের শেষ ধিককার যা-কিছু ধকল, সেটা শুধু বেসিলের উপর দিয়েই গেছে; রুপার্টের আর তখন তেমন শক্তিক্ষয় হয়নি। চুপচাপ সে শক্তিসঞ্চয় করে যাচ্ছিল এতক্ষণ। হাতের উপরটা শুধু একটু ছড়ে গিয়েছিল, ক্ষতস্থানটা রুমাল দিয়ে জড়িয়ে নিয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর বেসিলকে বলল, "বেসিল, তুমি ততক্ষণ এঁদের পাহারা দাও, আমি আর মিঃ গ্রইনবার্ন গিয়ে নীচের তলার ব্যাপারটার একটু সন্ধান নিয়ে আসি।"

"উত্তম প্রস্তাব," দু-পা এগিয়ে গিয়ে একটা আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বেসিল বলল, "যাও, বেশ ভাল করে সব দেখে এসো। আমাদের জন্তে চিন্তা করতে হবে না; বিস্তর বইপত্তর রয়েছে, আমরা বেশ আরামেই থাকব।"

আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এল রুপার্ট; মনে হল সে একটু চিন্তাগ্রস্ত।

আমিও আস্তে আস্তে তার ঠিক পাশে-পাশেই এগোতে লাগলাম। বারান্দা পার হয়ে সিঁড়ির ধারে এসে পৌছেচি তখন; সেখান থেকেও বেসিলের গলার স্বর স্পষ্ট শুনতে পাওয়া গেল। খুশি-খুশি গলা। শুনলাম সে বলছে, "আসুন মিঃ বারোজ, আমাদের সেই পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। আপনাকে অবশ্য ওই হাত-পা বাঁধা অবস্থাতেই. কথা চালাতে হবে। কি আর করা যাবে বলুন, আমি নিরুপায়। এবং এও জেনে রাখুন, অযথা কেন যে আপনাদের এইভাবে হেনস্থা করতে আমাকে বাধ্য করা হয়েছে, এখনো আমি তার বিন্দুবিসর্গও জানি না। তবে হ্যাঁ, আপনি যে রকম পাকা গল্প-বলিয়ে, তাতে করে ওই তুচ্ছ শারীরিক কষ্টের জন্তে অন্তত কথাবার্তা চালাবার দিক থেকে আপনার কিছু-মাত্রও অসুবিধে হবার কথা নয়। হ্যাঁ, কী যেন আপনি বলছিলেন? বলছিলেন যে, সাধারণ মানুষের পক্ষেও খুঁটিনাটি সবকিছু না হোক, বিজ্ঞানের কতকগুলো মূল বিষয়কে আয়ত্ত করা সম্ভব। তাই না?"

"বিলক্ষণ," চিতপাত অবস্থাতেও বেশ সহজ সুরেই বারোজ বললেন,

"বিজ্ঞানই বা এই বিশ্ব-জগতের কতটুকু রহস্য জানতে পেরেছে বলুন? যেটুকু পেরেছে—"

ধীরে ধীরে মিলিয়ে এল তাঁর কণ্ঠস্বর, আমরা তখন সিঁড়ি বেয়ে একতলায় নামছি। সেখান থেকে আর কিছুই শোনা গেল না। চতুর্দিক নিস্তব্ধ।

নীচে নামবার আগে একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছিলাম। বেসিল এবং বারোজের পণ্ডিতী তর্কাতর্কির মধ্যে গ্রীণউড কোনও অংশ গ্রহণ করেননি। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় চুপচাপ তিনি শুয়েছিলেন, সমগ্র ব্যাপারটাকে স্মরণ করে মনে মনে ফুঁসছিলেন হয়তো। বারোজ ব্যক্তিটি অন্য ধরণের। যুদ্ধে তিনি চরম-চণ্ড, যুদ্ধান্তে পরম-পণ্ডিত। বন্দী-অবস্থাতেও যেরকম উৎসাহ সহকারে বেসিলের সঙ্গে তিনি তর্কে মেতে উঠলেন তাতে অন্তত তা-ই মনে হল।

সে যাই হোক, আমরা তো নীচে নামতে লাগলাম। নীচে, নীচে, আরও নীচে। এমনিতেই বাড়িটা একটু প্যাঁচালো, তার ওপর আবার যে-রহস্যের আমরা আভাষ পেয়েছি তাতে করে যেন প্রতি পদক্ষেপেই আমাদের কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল।

চত্বরে পৌঁছে দেখি তার চতুর্দিকে দরজা। তার কোনওটা দিয়ে হয়তো রান্না-ঘরে পৌঁছনো যায়, কোনওটা দিয়ে কলতলায়, কোনওটা দিয়ে ভাঁড়ারে আর নয়তো চাকর-বাকরদের আস্তানায়। এই রকম সব অসংখ্য দরজা। দরজাগুলো সব ভেজানো ছিল, রুপার্ট সেগুলোকে চটপট্ খুলে ফেলতে লাগল। একটি দরজা শুধু খোলা গেলনা। ধাক্কাধাক্কি করেও না। দেখি সেটি তালাবন্ধ। অবিলম্বে সেটিকে ভেঙে ফেলা হ'ল। ঘরের ভিতরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার।

চৌকাঠের ওপরে দাঁড়াল রুপার্ট, তারপর সেইখান থেকেই সে উচ্চকণ্ঠে বলতে লাগল—

"ঘরের ভিতরে যে-ই থাকুন না কেন, বেরিয়ে আসুন। আপনাকে আমরা মুক্ত করেছি। যারা আপনাকে আট্‌কে রেখেছিল এতদিন, তারা নিজেরাই এখন বন্দী। আপনার শত্রুদের আমরা হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখেছি। সুতরাং কিছুমাত্র আপনার ভয় পাবার দরকার নেই; আপনি মুক্ত।"

চতুর্দিক নিস্তব্ধ, একটা ছুঁচ ফেললেও তার শব্দ শোনা যায়। সেই ভৌতিক স্তব্ধতাকে ভেদ করে যেন কার কান্নার মৃদু শব্দ ভেসে আসতে লাগল। এতই মৃদু যে অনায়াসে তাকে বাতাসের আওয়াজ বলে ভুল হতে পারত। ভুল হল না; তার কারণ এ-কান্না আমরা আগেও শুনেছি। বুঝলাম বন্দী সেই ভদ্রমহিলাই এই অন্ধকার কুঠরিতে বসে অঝোরে কাঁদছেন।

রুপার্ট বলল, "আপনার কাছে দেশলাই হবে একটা? রহস্য সমাধানের আর বড় বেশী দেরি নেই।"

খস্ করে একটা কাঠি ধরালাম। দেখি, লম্বা একটা ঘরের মধ্যে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আসবাবপত্রের বালাই নেই। দেয়ালগুলো ম্যাটমেটে হলুদে কাগজে মোড়া। ঘরের আর-এক প্রান্তে একটি জানালা। আর সেই জানালার ধারে এক বৃদ্ধা বসে আছেন। পরণে কালো পোষাক।

কাঠিটা হঠাৎ নিভে গেল। অন্ধকার। তবে আলো থাকতে-থাকতেই দেখে নিয়েছিলাম যে আমার ঠিক মাথার ওপরেই একটা গ্যাস-ব্র্যাকেট ঝুলছে। আবার দেশলাই জ্বালালাম। জ্বলন্ত কাঠিটাকে দিয়ে গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে নিতে আর তেমন অসুবিধে হলনা। সারা ঘর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

বুঝলাম ইনিই সেই বন্দী-মহিলা, এঁরই কান্না আমরা শুনেছি। জানালার ধারে একটা কাঠের বাক্স, তারই উপরে তিনি বসে আছেন। গায়ের রং চাঁপাফুলের মত, মাথায় রুপোলি একরাশ চুল। ঘনকৃষ্ণ যুগ্ম-ভ্রূতে একটি তীক্ষ্ণ সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে। পরণে কালো পোষাক। খুবই পরিচ্ছন্ন। ফিটফাট। হঠাৎ-আলোয় তাঁর সারা মুখ যেন অন্ধকারের মধ্য থেকে একটি শ্বেতপদ্মের মতন জেগে উঠল। পেছনেই জানালা, তার বাদামী-রঙা খড়খড়ির সারিতে চমৎকার একটি পটভূমি রচিত হয়েছে। জানালার গায়ে এক-জায়গায় একটা লম্বা ফোকর। বাইরে থেকে ছুরি চালিয়েছিল রুপার্ট, তারই চিহ্ন এটা।

"ম্যাডাম", মাথার থেকে টুপিটি নামিয়ে নিয়ে রুপার্ট গ্র্যান্ট সামনে এগোল, "আপনি মুক্ত। রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে আপনার কান্না শুনেছিলাম আমরা, শুনেই আপনাকে মুক্ত করতে ছুটে এসেছি।"

কিছুক্ষণের জন্যে আর সেই বৃদ্ধার মুখে কোনও কথাই সরল না, স্তম্ভিত বিস্ময়ে আমাদের দিকে তিনি তাকিয়ে রইলেন। তারপরেই চেঁচিয়ে উঠলেন হঠাৎ, "মুক্ত করতে এসেছেন? তার আগে বলুন, মিঃ গ্রীণউড কোথায়? মিঃ বারোজই বা কোথায়? বলুন, বলুন শীগগীর? ও-কি, অমন চুপ করে রয়েছেন কেন? বলুন, বলুন—। আপনারা আমাকে মুক্তি দেবেন বলছিলেন না?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ", সহাস্যে রুপার্ট বলল, "মুক্তি দিতেই এসেছি। গ্রীণউড আর বারোজের কথা জিজ্ঞেস করছেন তো আপনি? কোনও চিন্তা নেই, তাদের আমরা ঠাণ্ডা করে দিয়েছি।"

ভদ্রমহিলা উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, "ঠাণ্ডা করে দিয়েছেন? তার মানে? তাঁরা রাজী হয়েছেন তো? কী যে আপনারা বলছেন, কিছুই আমি বুঝতে পারছি না। বলুন, তাঁরা রাজী হয়েছেন তো? কী করে তাঁদের রাজী করালেন?"

হাসতে হাসতেই রুপার্ট বলল, "অত্যন্তই সহজ উপায়ে। মেরে তাদের ঠাণ্ডা বানিয়ে দিয়েছি। এখন তাদের হাত-পা বাঁধা। কিন্তু ওকি—আপনার আবার কি হ'ল?"

ভদ্রমহিলার ভাবান্তর দেখে আমরা বিস্মিত হয়ে গেলাম; ধীর পদক্ষেপে আবার তিনি সেই জানালার ধারেই ফিরে গিয়েছেন। নির্লিপ্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, "মিঃ বারোজকে আপনারা মারপিট করেছেন তাহলে? তাঁকে তো আপনারা হাত-পা বেঁধে ফেলে রেখে এসেছেন, তাই না?',

"বিলক্ষণ," রুপার্টের গলায় গর্ব ফুটে উঠল, "ঐ যে বললাম, তাদের একেবারে ঠাণ্ডা বানিয়ে দিয়েছে।"

"ধন্যবাদ।" ভদ্রমহিলা সেই কাঠের আসনটিতেই বসে পড়লেন আবার।

অতঃপর কিছুক্ষণ আমরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। কারুর মুখেই কোনও কথা নেই। স্তব্ধতা ভেঙে মধুরকণ্ঠে রুপার্ট বলল, "তবে আর দেরি করছেন কেন? যেখানে খুশি আপনি যেতে পারেন। কেউই আপনাকে বাধা দেবে না।"

ভদ্রমহিলা একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন যেন। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ভ্রুকুঞ্চন করে বললেন, "কিন্তু গ্রীণউড আর বার্গোড, তাদের কি হবে? কী যেন তাদের করেছেন আপনারা?"

ফুর্তিতে উছলে উঠল রুপার্ট; বলল, "কিচ্ছু ভাববেন না, তাদের একেবারে হাড়গোড় ভেঙে দিয়েছি। আপাতত তারা ওপরতলায় শুয়ে আছে, হাত-পা বাঁধা।"

শুনে তিনি ফের বসে পড়লেন। হতাশকণ্ঠে বললেন, "তবে তো আর আমার যাবার কোনও কথাই ওঠে না,—এইখানেই আমাকে থাকতে হবে।"

সে কি! রুপার্ট যেন কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। বলল, "এখানেই আপনাকে থাকতে হবে! কী বলছেন আপনি? কে আপনাকে ধরে রাখবে এখানে? কার এত ক্ষমতা? কে সে?"

"প্রশ্ন তো সেটা নয়," সংযত তবু দৃঢ় কণ্ঠে ভদ্রমহিলা তাঁর পাল্টা-প্রশ্ন ছুঁড়লেন, "প্রশ্ন হচ্ছে, কে আমাকে এখান থেকে বার করে নিয়ে যাবে? কার এত ক্ষমতা? কে সে? যাকগে, বাজে কথা বলে লাভ নেই, এইখানেই আমি থাকব।"

বিমূঢ় বিস্ময়ে তাঁর দিকে আমরা তাকিয়ে রইলাম। তিনিও আমাদেরই দিকে তাকিয়ে আছেন। স্থির, শান্ত দৃষ্টি।

আমতা-আমতা করে শুধোলাম, "তার মানে? শেষ পর্যন্ত কি আপনাকে ফেলে রেখেই আমাদের চলে যেতে হবে নাকি?"

"অগত্যা"; তিনি বললেন, "অবশ্য আমাকেও যদি হাত-পা বেঁধে নিয়ে যান তো সে আলাদা কথা। স্বেচ্ছায় আমি এক পা-ও নড়ছি না।"

রুপার্ট আর থাকতে পারল না। চেঁচিয়ে উঠল, "এ-ই যদি আপনার ইচ্ছে তো ছাড়া পাবার জন্যে অতো কান্নাকাটি করছিলেন কেন? সে কান্না আমরা স্বকর্ণে শুনেছি।"

"ও, আপনারা বুঝি আড়ি পেতে সব শুনছিলেন? সেক্ষেত্রে জেনে রাখুন, এমন অনেককিছুই শোনা যায়—আসলে যা মোটেই সত্যি নয়। ঝোঁকের

মাথায় কখন কি একটা বলেছি, সেটাকেই আপনারা সত্যি বলে ধরে নিলেন ? ধন্য আপনাদের বুদ্ধি !" ভদ্রমহিলার গলায় একটা তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ফুটে উঠল।

রুপার্ট তখন খাবি খাচ্ছে যেন, মুখটাকে তার অদ্ভুতরকম বোকা-বোকা দেখাচ্ছে। সে মুখে বুদ্ধির সামান্যতম আভাস পর্যন্ত নেই।

দরজার দিকে পা বাড়াল রুপার্ট ; নীরবে আমি তাকে অনুসরণ করলাম। চৌকাঠ পর্যন্ত পৌছে, হঠাৎ কি খেয়াল হলো, ফিরে দাঁড়িয়ে বললাম, "আর একবার ভেবে দেখুন, আপনার কিছুমাত্র উপকারও কি আমাদের দ্বারা সম্ভব নয় ?"

"অবশ্যই সম্ভব", ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন "এতই যদি আপনাদের উপকার করবার শখ হয়ে থাকে তো দয়া করে উপরে যান, বারোজ আর গ্রীণউডের বাঁধন খুলে দিন।"

দুম-দুম করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল রুপার্ট ; ড্রইং-রুমের মধ্যে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কী যেন সে বলতে যাচ্ছিল, বলা হ'ল না। ঘরের মধ্যে তখন জোর আলোচনা চলছে।

মিঃ বারোজ চিত হয়ে শুয়ে আছেন, হাত-পা বাঁধা। সেই অবস্থাতেই বেসিলকে তিনি বলছেন, "মিঃ গ্র্যাণ্ট, এক হিসেবে আপনি সত্যি-কথাই বলেছেন। তবে কি জানেন, বস্তুর অস্তিত্বকে যেভাবে আমরা অনুভব করে থাকি, ঠিক সেইভাবেই তার বিচার হওয়া প্রয়োজন। নীতিশাস্ত্রের উৎপত্তি—"

"বেসিল !" রুপার্ট চেঁচিয়ে উঠল, "তিনি আসতে চাইছেন না।"

তর্কে বাধা পড়ায় বেসিল চটে গেল, ভ্রূকুঞ্চন করে শুধোল, "কে আসতে চাইছেন না ?"

"নীচের সেই ভদ্রমহিলা, সেই যাঁকে আটকে রাখা হয়েছে। কিছুতেই তিনি বাইরে আসবেন না। উল্টে আবার বায়না ধরেছেন যে, এঁদের দুজনকে ছেড়ে দিতে হবে।"

"উত্তম প্রস্তাব।" বেসিল একেবারে লাফিয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই দেখি একলাফে গিয়ে সে মিঃ বারোজের বাঁধন খুলতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

"ওহে স্যুইনবার্ণ, তুমিই বা বসে আছো কেন? নাও, চট্‌পট্‌ মিঃ গ্রীণউডকেও ছেড়ে দাও।"

আমার আর তখন চিন্তা করবার শক্তি নেই। স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো উঠে গিয়ে বেসিলের কথামতো মিঃ গ্রীণউডের বাঁধন খুলে দিলাম। ছাড়া পেয়েও তিনি গোঁজ হয়ে বসে রইলেন।

মিঃ বারোজ ওদিকে তখন পাগলের মতো হা-হা করে হাসছেন। বেসিলের মুখেও কৌতুকের হাসি। সহাস্যমুখে সে বলল, "আচ্ছা, এবারে তাহলে উঠি। সন্ধ্যাটা বেশ আনন্দেই কাটল, তার জন্যে আপনাদের ধন্যবাদ। না না, ঠাট্টা নয়, সত্যিই বেশ আনন্দ পেলাম। শুভরাত্রি। এস হে রুপার্ট, ওঠা যাক।"

"বেসিল", রুপার্ট একেবারে মরিয়া হয়ে বলল, "ঈশ্বরের দোহাই, একবার তুমি শুধু নীচের সেই ভদ্রমহিলাকে দেখে আসবে চলো; তা নইলে আমার অস্বস্তি দূর হচ্ছে না। স্বীকার করছি, সত্যিই হয় তো কোথাও একটা ভুল হয়েছে। তা সত্ত্বেও বলছি, একটিবার শুধু নীচে চলো। এঁরা কিছু মনে করবেন না আশা করি—"

হাসতে হাসতেই মিঃ বারোজ বললেন, "কিচ্ছু না, কিচ্ছু না—মনে করবার কী আছে এতে? ভাঁড়ার, রান্নাঘর, কয়লাকুঠরি, বাথরুম—সবকিছু গিয়ে তালাস করে আসুন। নিরাশ হতে হবে না; যেখানেই যান, দেখবেন হাজারে হাজারে লাশ ছড়িয়ে পড়ে আছে!" বলেই তিনি হেসে উঠলেন আবার।

এখানে একটা কথা বলে নেওয়া দরকার; ইতিপূর্বে যে পাঁচটি কাহিনী বিবৃত করেছি, বর্তমান অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে তার একটু পার্থক্য বর্তমান। বেসিল গ্র্যাণ্টের সঙ্গে আমার বহুদিনের আলাপ, রহস্য-উদঘাটনে আমি তার নিত্যসঙ্গী। সঙ্গী শুধু ঐ নামেমাত্রই। প্রতি ব্যাপারেই দেখেছি, দু-পা হেঁটেই আমার সব তালগোল পাকিয়ে যায়। তবে এও ঠিক, রহস্যগুলোকে গোড়ায়-গোড়ায় যতোই না কেন হেঁয়ালিভরা মনে হোক, শেষ পর্যন্ত তার প্রত্যেকটিই একেবারে জলের মতো সোজা হয়ে গেছে। বর্তমান ক্ষেত্রেই সর্বপ্রথম তার ব্যত্যয় ঘটল। ঘটনাস্থল থেকে যখন আমরা বেরিয়ে এলাম, মূল রহস্য তখনো এতটুকুমাত্রও

পরিষ্কার হয়নি। উল্টে আরো ঢের বেশি জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। রহস্য যে শেষ-পর্যন্ত এতদূর গড়াবে, তা আমি ভাবতেও পারিনি। বলতে কি, তল্লাসী চালাতে গিয়ে রুপার্ট যদি হঠাৎ খুন হয়ে যেত, কি মিঃ গ্রীণউড যদি হঠাৎ ডানা মেলে দিয়ে উড়ে যেতেন তো তাতেও আমি এতখানি বিস্মিত হতাম না। অদ্ভুত একটা ক্লাইম্যাক্সের অবতারণা হলো শেষ পর্যন্ত! এতই অদ্ভুত যে, সে-রাত্রে আর বাড়ি ফিরে আমার ঘুমই হল না। এই যে ক্লাইম্যাক্স, নানান দিক থেকে নানানতরো ভাবে তাকে আমি বিচার করে দেখতে চেষ্টা করেছি, রহস্যের তবু কূলকিনারা পাইনি। মাস কয়েক বাদে পেলাম। ঠিক তেমনই রহস্যপূর্ণ আর একটা ব্যাপারের মধ্য দিয়ে। একটু পরেই সেটা আপনাদের বলব। আপাতত সেদিনকার সেই রহস্যময় নাটক যেখানে চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে ঠেকল, সেই পঞ্চম অঙ্কের কথা বিবৃত করা যাক।

পাঁচজনেই এবারে নীচে নামলাম,—রুপার্ট, বেসিল, বারোজ, গ্রীণউড এবং আমি। সর্বাগ্রে রুপার্ট। এবারেও দেখি দরজা বন্ধ, ধাক্কা মারতেই সেটা খুলে গেল। ঘর অন্ধকার। গ্যাস-বাতিটাকে আমরা জ্বেলে রেখে এসেছিলাম, ভদ্রমহিলা সেটাকে নিবিয়ে দিয়েছেন। বুঝলাম যে, আলোর চাইতে অন্ধকারে থাকতেই তাঁর বেশি পছন্দ।

আলো জ্বালাতেই ভদ্রমহিলা আমাদের দিকে ফিরে তাকালেন। তারপরেই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। বিদ্যুদ্বেগে তিনি তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং মাথা নুইয়ে নমস্কার জানালেন। ভাবলাম এ নমস্কার নিশ্চয়ই গ্রীণউড এবং বারোজকে জানানো হয়েছে। তাতে আমি একটু চটে গেলাম। শয়তানরা দেখছি ভদ্রমহিলাকে একেবারে দাবিয়ে রেখেছে; উঠতে-বসতে সেলাম ঠুকতে হয়। কিন্তু, বারোজের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। ছোট্ট একটা ছুরি দিয়ে আপন মনে তিনি তাঁর নখ কাটছেন, তাঁকে যে নমস্কার জানানো হয়েছে, সেদিকে তাঁর লক্ষ্যই নেই। তখন ভাবলাম, এ-নমস্কার নিশ্চয়ই গ্রীণউডের উদ্দেশে নিবেদিত। কিন্তু তা-ই বা কি করে হয়। গ্রীণউড একেবারে সকলের পিছনে দাঁড়িয়ে, বলতে গেলে তখনো তিনি

ঘরেই ঢোকেন নি। তারপরেই যা চোখে পড়ল, তাতে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। সর্বাগ্রে দাঁড়িয়ে আছে বেসিল গ্র্যান্ট, গ্যাসের তীব্র আলোয় সারা মুখ তাঁর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। মুখে বিচিত্র হাসি, মাথাটা প্রতি-নমস্কারের ভঙ্গীতে ঈষৎ নোয়ানো। আর আমার কোনও সন্দেহ রইল না। বেসিলকেই তাহলে নমস্কার জানিয়েছেন ভদ্রমহিলা। বেসিলকেই। কিন্তু কেন?

ভদ্রমহিলার মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াল বেসিল; ভারিক্কী চালে বলল, "আমার এই বন্ধুরা আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন শুনলাম। তা এঁদের আপনি ফিরিয়ে দিয়েছেন বুঝি?"

বন্দিনীর মুখে লজ্জা ছড়িয়ে পড়ল; বললেন, "আমার অপরাধ আপনি জানেন। তা বলে আমি বিশ্বাসঘাতিনী নই।"

"তা আমি জানি," বেসিল বলল, "বলতে কি, আপনার এই আনুগত্যের পরিচয় পেয়ে আমি অত্যন্তই খুশী হয়েছি। আর তার পুরস্কারও আমি দেব। এঁদের-দেওয়া মুক্তি আপনি নেননি। এবারে আমি আপনাকে মুক্তি দিচ্ছি।"

আর একবার অভিবাদন জানালেন ভদ্রমহিলা। তারপর বললেন, "আপনি আমার ওপর অবিচার করেছেন এমন কথা আমার কখনই মনে হয়নি। আমি জানি আপনি মহৎ।"

কথা ক'টি বলে ধীরে ধীরে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রীণউডের দিকে ফিরে দাঁড়াল বেসিল। একগাল হেসে বলল, "যাক্, আপনাদের এবার ঝঞ্ঝাট চুকল, কেমন?"

"কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।" গ্রীণউড বললেন। মুখে কিন্তু কোনও ভাবান্তর দেখা গেল না।

রাস্তায় যখন বেরিয়ে এলাম সবকিছুই তখন আমার তালগোল পাকিয়ে গেছে, নিজেকে একটি আকাট মূর্খ বলে মনে হচ্ছে। কোন কিছু বুঝতে না পারার যে কি দুঃসহ যন্ত্রণা, আজ আমি তা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করলাম। শহরে রাত্রি নেমেছে,

মাথার ওপরে নক্ষত্রখচিত নীল আকাশ। এর সবকিছুকেই তখন আমার একটা অর্থহীন প্রহসন বলে বোধ হতে লাগল।

রুপার্টেরও সেই একই অবস্থা। ভাল করে তার কথা বলবার পর্যন্ত শক্তি নেই। চিঁ চিঁ গলায় বেসিলকে সে বলল, "বেসিল, তোমাকে আমি আমার দাদা বলে জানতাম। তা কি সত্যি? সত্যিই কি তুমি আমার দাদা? কি জানি কেন, তাতেও এখন আমার সন্দেহ হচ্ছে। মনে হচ্ছে, তুমি বোধ হয় সামান্য মানুষমাত্র নও, দেবতা-টেবতা,—মানুষের ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছ। বেসিল, তুমি মানুষ তো ঠিক?"

হা-হা করে হেসে উঠল বেসিল, "দেবতা নই আমি, নিতান্তই নিরীহ একটি মনুষ্যসন্তান। উপস্থিতমুহূর্তে তার সবচাইতে বড় প্রমাণ, খিদেয় আমি মরে যাচ্ছি। আজ আর থিয়েটারে যাওয়া হবে না; চল, সেই যে রেস্তোরাঁটার কথা বলেছিলাম সেইখানেই যাওয়া যাক্। এই তো, বাস্‌ও এসে গেছে দেখছি—"

লাফ দিয়ে সে বাসে উঠে পড়ল। আমরাও তার পদাঙ্ক অনুসরণ করলাম।

* * *

মাস কয়েক পরের কথা। রুপার্ট একদিন হন্তদন্ত হয়ে আমার ঘরে এসে হাজির। হাতে একটা মস্ত ব্যাগ। চোখেমুখে অস্থিরতা। এসেই সে আমাকে জানাল, এক্ষুনি তার সঙ্গে বেরুতে হবে। সে নাকি "আজব জীবিকা সঙ্ঘ"-এর হেডকোয়ার্টারের একটা হদিশ পেয়েছে। ছোকরা বলে কি! শুনে তো আমি লাফিয়ে উঠলাম। এবং তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়লাম তার সঙ্গে।

কী করে যে শেষ পর্যন্ত সেখানে গিয়ে পৌছুলাম তার যদি একটা বিশদ বিবরণ দিতে যাই তো সে-গল্প আর ফুরোবে না। এইটুকু শুধু জেনে রাখুন যে, তার জন্যে আমাদের যে বিরাট পরিশ্রম স্বীকার করতে হ'ল তার অর্ধেক-পরিমাণ পরিশ্রমেও বোধ হয় সশরীরে স্বর্গলাভ সম্ভব। বহু কষ্টে সঙ্ঘের এক গণ্যমান্য সদস্যকে পাকড়ে, অচেনা এক কিউনওয়ালাকে ঘুষ দিয়ে, বহুপ্রকার বাধা-বিঘ্ন উত্তীর্ণ হয়ে, অজানা একটা বাড়ির মেঝের একখানা পাথর সরিয়ে, ভূগর্ভস্থ একটি কক্ষে পৌঁছে, অতঃপর আর-একখানা পাথর সরিয়ে, আরও নীচে নেমে,

সকমহুন একটা সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করে'—তবে গিয়ে সেই সুড়ঙ্গপথে একটা বিরাট ঘরের মধ্যে পৌঁছনো গেল। সেইটেই হচ্ছে "আজব জীবিকা সঙ্ঘ"-এর হেডকোয়ার্টার।

জীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে, আজকের এই অভিজ্ঞতার তুলনায় সেগুলি প্রায় কিছুই নয়। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে আমার চক্ষুস্থির হবার উপক্রম। সে কি ঘর! ঘর তো নয়, বিরাট একটা রাজ-দরবার যেন। এমনই তার জাঁকজমক। মাঝখানে একখানা প্রকাণ্ড ডাইনিং টেব্‌ল্, চারদিকে চেয়ার সাজানো। তাতে যাঁরা বসে রয়েছেন, তাঁদের প্রায় সকলকেই আমি চিনি। ইতিপূর্বে প্রায় সকলের সঙ্গেই আমার এক-আধবার আলাপ-পরিচয় হয়েছে। আপনারাও তাঁদের চেনেন। প্রথমেই আমার চোখ পড়ল হাউস-এজেন্ট মিঃ মন্ট্‌মরেন্সীর ওপর; তাঁর ঠিক দু-পাশেই সেই আটকলার দুই ভদ্রলোক বসে আছেন, সেই যে যাঁরা পাত্রী সেজে আমাদের আটকে রেখেছিলেন। অ্যাডভেঞ্চার অ্যাণ্ড রোমান্স এজেন্সীর প্রতিষ্ঠাতা মিঃ পি জি নর্টহোভারকেও আমি দেখবামাত্রই চিনলাম; প্রফেসর চ্যাডকেও দেখা গেল। গম্ভীরমুখে তিনি বসে আছেন।

প্রেসিডেন্টের চেয়ারটাই শুধু ফাঁকা, তখনো তিনি সভাকক্ষে এসে পৌঁছননি। সারি সারি মানুষের মধ্যে সেই শূন্য চেয়ারটিকে যেন ফোক্‌লা-দাঁতের মতো মনে হতে লাগল।

প্রফেসর চ্যাড্‌-এর দিকে ফিরে তাকালেন মিঃ মন্টমরেন্সী; শুধোলেন, "প্রেসিডেন্ট কোথায় জানেন?"

"না," প্রফেসর বললেন, "কোথায় যে গিয়েছেন কিচ্ছু জানি না।"

"বলেন কি?" মিঃ মন্ট্‌মরেন্সী তাঁর আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন, "তবে তো একবার খোঁজ নিতে হয়—?"

ঘর থেকে তিনি সবেমাত্র বাইরে পা দিয়েছিলেন, সেইখান থেকেই ফের দৌড়তে দৌড়তে ফিরে এলেন।

"প্রেসিডেন্ট এসে গেছেন, প্রেসিডেন্ট এসে গেছেন······"

সারা ঘরে একটা চাপা উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল। এক্ষুণি প্রেসিডেন্টের আবির্ভাব হবে, সকলেই তাই ঠিকঠাক হয়ে বসলেন। গুঞ্জন স্তব্ধ হল, চতুর্দিক নিঃশব্দ। আর সেই ব্যগ্র স্তব্ধতার মধ্যে বসে থাকতে থাকতে একটিইমাত্র প্রশ্ন শুধু বারংবার আমাদের মনে উঁকি দিয়ে যেতে লাগল: কে এই পাগলা-সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট, কে তিনি? কে তিনি, যার আগমনবার্তা ঘোষিত হবার সঙ্গেসঙ্গেই সবার চোখে-মুখে একটি বিনম্র আনুগত্যের চিহ্ন ফুটে উঠেছে? কে তিনি?

একটু বাদেই তার উত্তর পেলাম। চেয়ে দেখি দরজা খুলে গেছে, সারা ঘর আনন্দধ্বনিতে ফেটে পড়ছে। আর সেই বিপুল অভ্যর্থনার মধ্যে সহাস্যমুখে বেসিল গ্র্যান্ট এসে প্রেসিডেন্টের চেয়ারে বসল। পরনে নিখুঁত সান্ধ্য পোষাক।

মুখে আর আমার একটিও কথা সরল না, মন্ত্রমুগ্ধের মতো আমি ডিনার খেয়ে যেতে লাগলাম।

ডিনার তো নয়, সে মানে এক রাজসূয় যজ্ঞ। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে চিরকালই আমি একটু উৎসাহী লোক, কিন্তু সেই আমিও যেন আজ হিমসিম খেয়ে যেতে লাগলাম। কতো রকমের ডিশ যে এখানে একটার-পর-একটা সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে তার কোনও ইয়ত্তা নেই। পরিমাণেও তেমনি। স্যুপের সমুদ্রে হাবুডাবু খেয়ে উঠে সার্ডিন-এর ডিশটাকে কাছে টেনে নিলাম। সেটাকে শুধু একবার জিভে ঠেকিয়েই হাত বাড়ালাম ডাক্‌-রোস্টের দিকে। অহো, কী তার চেহারা! ডাক্‌ তো নয়, এক একটা প্রায় উটপাখীর সমান। গোগ্রাসে সেটাকে সাবাড় করেই ফের পনীরের ডিশটাকে হাতিয়ে নিলাম আমি। আহা, মধু! রূপকথায় শুনেছি, চাঁদ নাকি পনীর দিয়ে তৈরী। আজ মনে হল, া কথা মিথ্যে; আসলে এই পনীর জিনিসটাই বোধ হয় চাঁদ দিয়ে তৈরী। ডের বেগে আমি হাত চালিয়ে যেতে লাগলাম।

বেসিল গ্র্যান্ট ওদিকে এর-ওর সঙ্গে হাসিঠাট্টা করছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, দু-এক চুমুক বার্গাণ্ডী টানছে; আমাদের দিকে সে দৃকপাতও করছে না। কি করে যে

সে এই কিম্ভূত প্রতিষ্ঠানটির প্রেসিডেন্ট হ'ল তা আর তখন আমাদের জানবার উপায় নেই। সময়ও নেই।

অতঃপর সেই শুভ-মুহূর্ত সমাগত হ'ল। ডিনারের পর বক্তৃতার পালা। সর্বাগ্রে প্রেসিডেন্টের ভাষণ। সমবেতকণ্ঠের আনন্দধ্বনির মধ্যে বেসিল গ্রান্ট তার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

"বন্ধুগণ," ভাষণ শুরু হল বেসিলের, "চিরাচরিত প্রথায় আনুষ্ঠানিক কোনও বক্তৃতা দেওয়া আমাদের এই আজব জীবিকা সঙ্ঘ-এর রীতি নয়। এখানকার নিয়ম একটু আলাদা। আজ আমাদের সাংবৎসরিক অধিবেশন বসেছে। সঙ্ঘের নিয়ম অনুযায়ী সদস্যরা এবার যে-যার নিজের নিজের পেশার একটা বিবরণ দেবেন। এ-সঙ্ঘের আমি শুধু প্রেসিডেন্টমাত্রই নই, আমি এর প্রাচীনতম সদস্য। সে হিসেবে সর্বাগ্রে আমি আমার নিজের পেশার একটা বিবরণ দাখিল করছি। প্রথম জীবনে আমি ছিলাম একজন জজ্, সে কথা আপনারা জানেন। সবাই যাতে সুবিচার পায় সেই চেষ্টাই তখন আমি করেছি। কিন্তু সে চেষ্টা যে সম্পূর্ণই অর্থহীন, ধীরে ধীরে তা আমি উপলব্ধি করতে পারলাম। বুঝতে পারলাম যে মানুষের তৈরী এই আইনকানুনগুলো একটা অর্থহীন সাট্টা মাত্র। যে-আদালতে সুবিচার হবার কথা, বিচারের নামে সেখানে প্রহসন চলছে। জমকালো পোষাকে জজ্-এর আসনে আমি বসে থাকতাম, লোকে বলত আমি ন্যায়াধীশ — ন্যায়াধীশ! আসলে যে আমি একটা সাক্ষীগোপালমাত্র, আর কেউ তা না বুঝুক, আমি বুঝতাম। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যেত। কীইবা আমার ক্ষমতা! দুটি মাত্র ওষুধ আমার হাতে,—জরিমানা আর জেল। আর তাকেই সম্বল করে কিনা আমি সমাজের সর্বব্যাধি নিরাময় করতে বসেছি। ভাবতাম, আর আমার লজ্জা হত! জেল দেওয়া কিংবা জরিমানা করাই কিছু আমার উদ্দেশ্য নয়, আমার উদ্দেশ্য কলহবিবাদের একটা মীমাংসা করে দেওয়া। আর তা যদি করতে হয় তো জেল জরিমানাতে কিছুমাত্র কাজ হবে না। তার চাইতে বাদী এবং বিবাদীকে যদি পরস্পরকে চুমু খেতে বাধ্য করা যায়, কিংবা দুজনকে ধরেই যদি চাবকে দেওয়া যায় আচ্ছামতন, তো঳ের সহজেই তাদের একটা মিটমাট হয়ে যেতে পারে।

শরুন্দরের সঙ্গে মিনিট কয়েক আড্ডা দিয়ে, কিংবা ডুয়েল লড়েও মিট্‌মাট্‌ সম্ভব। এ-সব দাওয়াই ঢের বেশী কার্যকরী। মুশকিল এই যে, আইন তা বোঝে না। জেল এবং জরিমানার মধ্যে দিয়েই সব ব্যাপারের সে ফয়সালা করতে চায়। বোঝে না যে সমস্যাটাকে তাতে আরো খানিকটা জটিল করে তোলা হয় মাত্র। প্রচলিত বিচারব্যবস্থার এই যে মারাত্মক ত্রুটি, যে-মুহূর্তে আমি তা উপলব্ধি করতে পারলাম সেই মুহূর্ত থেকেই সব কিছু আমার চোখে অর্থহীন ঠেকতে লাগল! শেষকালে আর আমি স্থির থাকতে পারলাম না, খোলাখুলিভাবেই একদিন আমি আমার মনোভাব ব্যক্ত করে বসলাম। লোকে ভাবল আমি উন্মাদ হয়ে গিয়েছি; বাধ্য হয়েই তাই আমাকে রিটায়ার করতে হ'ল।"

সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ, উৎকর্ণ আগ্রহে সকলে বেসিলের কথা শুনছে। একটুখানি দম নিয়ে আবার সে বলতে শুরু করল, "রিটায়ার না করে আমার উপায় ছিল না। যে-বিচারব্যবস্থার অন্তঃসারশূন্যতা আমি জেনে ফেলেছি, কোনও রকমেই আর তার সঙ্গে নিজেকে আমি খাপ খাইয়ে নিতে পারলাম না। তারপর থেকেই আমি নতুন এক বিচারব্যবস্থার প্রবর্তন করেছি। মানুষের যা-কিছু নৈতিক অপরাধ তার অবসান ঘটানোই আমার এই নতুন বিচার-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য। এ ব্যবস্থাকে চালু করবার জন্যে নতুন ধরণের গুপ্ত-আদালতও বসানো হয়েছে। খুনজখম, কি বিনা লাইসেন্সে কুকুর পোষা, এসব ছোটখাট অপরাধকে সেখানে অপরাধ বলেই গণ্য করা হয় না। এর চাইতে ঢের বড় অপরাধ—সমাজ-জীবনকে যা দুর্বিষহ করে তুলেছে—শুধুমাত্র তাই নিয়েই আমার কারবার। কী সেই অপরাধ? স্বার্থপরতা, দুঃসহ বঞ্চনা, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি দুর্ব্যবহার। এই সবেরই আমি বিচার করে থাকি। এবং শাস্তিহিসেবে যে-দণ্ডই আমি দিই না কেন, অপরাধীরা তা সন্তুষ্টচিত্তেই মেনে নেয়। শুনে আপনারা অবাক হচ্ছেন হয়তো, কিন্তু কথাটা একেবারে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সম্প্রতি তার একটা প্রমাণও আমি পেয়েছি। এই কিছুদিন আগে শাস্তিহিসেবে একটি ভদ্রমহিলাকে আমি সাউথ কেনসিংটন অঞ্চলের নির্জন এক ঘরে আট্‌কে রেখেছিলাম। ভদ্রমহিলা চিরকুমারী; তাঁর অপরাধ, ভাংচি দিয়ে তিনি একটি বিয়ে ভেঙে দেন। দুটি অর্বাচীন লোক তাঁকে

তাঁর সেই বন্দীদশা থেকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এসেছিল ; শুনে আপনারা অবাক হবেন, কারাকক্ষ থেকে তিনি বেরিয়ে আসতে চান নি। আমার দেওয়া শাস্তিকে তিনি সন্তুষ্টচিত্তেই গ্রহণ করেছিলেন।"

কপার্টের আর তখন সম্বিৎ নেই, বড় বড় জ্যাবজেবে দুটি চক্ষু মেলে স্তম্ভিত বিস্ময়ে সে বেসিলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আমারও সেই একই অবস্থা। মুক্তি পেয়েও বন্দী ভদ্রমহিলা কেন যে তা প্রত্যাখ্যান করেছিলেন এতদিন বাদে তার তাৎপর্য আমরা উপলব্ধি করতে পারলাম। বুঝতে পারলাম যে, স্বেচ্ছাতেই তিনি বেসিল গ্র্যান্টের এই বিচিত্র আদালতের শাস্তি গ্রহণ করেছিলেন ; আরও বুঝলাম যে, আজব জীবিকা সঙ্ঘের তিনিও একজন মক্কেল!

গ্লাসে গ্লাসে মদ ঢেলে দেওয়া হল ; বেসিলকে অভিনন্দন জানিয়ে মহানন্দে তার স্বাস্থ্যপান করল সবাই। আমরাও তাতে যোগ দিলাম। আর কোনও হেঁয়ালি নেই, সমস্ত হেঁয়ালিই তখন পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মধ্যেই বেসিল ঘোষণা করল :

"মিঃ পি জি নর্টহোভার এবারে তাঁর অ্যাডভেঞ্চার অ্যাণ্ড রোমান্স এজেন্সীর কার্যবিবরণী পেশ করবেন।"

উঠে দাঁড়ালেন মিঃ নর্টহোভার—এজেন্সীর কার্যবিবরণী জানিয়ে তাঁর বক্তৃতা শুরু করলেন। সে বিবরণী আমাদের অজানা নয়, বহুদিন আগে মেজর ব্রাউনকে তিনি তা একবার শুনিয়েছিলেন। পাঠকদের সে কথা মনে থাকতে পারে।

এ-কাহিনীর এইখানেই শেষ। যেখান থেকে শুরু করেছিলাম সেইখানে এসেই তার পূর্ণচ্ছেদ টানা গেল।